MATRICULATION BENGALI SELECTIONS

MATRICULATION
BENGALI SELECTIONS

SIXTH EDITION

PUBLISHED BY THE
UNIVERSITY OF CALCUTTA
1941

1st Edition, 1924—O	4th Edition, 1934—Y
Reprint, 1925—Y	Reprint, 1934—Y
2nd Edition, 1925—T	,, 1935—Y
Reprint, 1927—J	Enlarged ,, 1936—Isb
3rd Edition, 1928—F	5th Edition, 1937—T
Reprint, 1928—R	Reprint, 1938—Y
,, 1929—T	,, 1938—T
,, 1930—T	,, 1939—ZD
,, 1932—E	Adapted ,, 1941—Gca
,, 1933—O	6th Edition, 1941—ZJ

PRINTED IN INDIA

PRINTED AND PUBLISHED BY BHUPENDRALAL BANERJEE
AT THE CALCUTTA UNIVERSITY PRESS, 48, HAZRA ROAD, CALCUTTA

Reg. No. 1340B.T.—February, 1941—ZJ.

সূচীপত্র

গদ্যাংশ

* তারকা-চিহ্নিত অংশগুলি স্বত্বাধিকারীর অনুমতিক্রমে মুদ্রিত।

পদ্যাংশ

* তারকা-চিহ্নিত অংশগুলি স্বত্বাধিকারীর অনুমতিক্রমে মুদ্রিত।

প্রবেশিকার বাঙ্গালা পাঠ্য

[সংকলন]

হিমালয়-ভ্রমণ

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

[কলিকাতা জোড়াসাঁকোর প্রসিদ্ধ "ঠাকুর-পরিবারে" ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাতে গিয়া রাজসম্মান লাভ করিয়াছিলেন। প্রভূত ধনসম্পদের মধ্যে লালিত-পালিত হইয়াও অল্পবয়সে দেবেন্দ্রনাথের মনে বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছিল। যে প্রবন্ধটি এখানে উদ্ধৃত হইল, ইহা তাঁহার "আত্মজীবনী" নামক গ্রন্থ হইতে গৃহীত এবং ইহাতে সেই বৈরাগ্যের কথা আছে। অল্প বয়স্ হইতেই দেবেন্দ্রনাথ রামমোহন রায়ের প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি-সাধনে বদ্ধ-পরিকর হন। ইঁহার ত্যাগ ও ধর্ম্মবিশ্বাস অসাধারণ ছিল, তজ্জন্য ইঁহার অনুরাগী ব্রাহ্মগণ ইঁহাকে 'মহর্ষি' আখ্যা প্রদান করেন। ইঁহার রচিত 'ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান,' 'ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস,' 'উপদেশাবলী,' 'জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি,' 'পরলোক ও মুক্তি,' 'আত্মজীবনী,' 'বিবিধ ব্রহ্ম-সঙ্গীত' প্রভৃতি পুস্তক সুপরিচিত। ইঁহার পুত্রগণ সকলেই কৃতী, তন্মধ্যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের নাম জগতের সর্ব্বত্র বিদিত। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৯এ জানুয়ারী ইনি স্বর্গারোহণ করেন।]

আমি শিমলাতে ফিরিয়া কিশোরীনাথ চাটুজ্যেকে বলিলাম, "আমি সপ্তাহের মধ্যে আরো উত্তর দিকে উচ্চ উচ্চ পর্ব্বত-ভ্রমণে

যাইব। আমার সঙ্গে তোমাকে যাইতে হইবে। আমার জন্য, একটা ঝাঁপান ও তোমার জন্য একটা ঘোড়া ঠিক করিয়া রাখ।” “যে আজ্ঞা” বলিয়া তাহার উদ্যোগে সে চলিল। ২৫শে জ্যৈষ্ঠ শিমলা হইতে যাত্রা করিবার দিন স্থির ছিল। আমি সে দিবস অতি প্রত্যূষে উঠিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। আমার ঝাঁপান আসিয়া উপস্থিত, বাঙ্গী-বর্দারেরা সব হাজির। আমি কিশোরীকে বলিলাম, “তোমার ঘোড়া কোথায়?” “এই এলো ব'লে, এই এলো ব'লে” বলিয়া সে ব্যস্ত হইয়া পথের দিকে তাকাইতে লাগিল। এক ঘণ্টা চলিয়া গেল, তবু তাহার ঘোড়ার কোন খবর নাই। আমার যাইবার এই বাধা ও বিলম্ব সহ্য হইল না। আমি বুঝিলাম যে, অধিক শীতের ভয়ে আরো উত্তরে কিশোরী আমার সঙ্গে যাইতে অনিচ্ছুক। আমি তাহাকে বলিলাম, “তুমি মনে করিতেছ যে, তুমি আমার সঙ্গে না গেলে আমি একাকী ভ্রমণে যাইতে পারিব না। আমি তোমাকে চাই না, তুমি এখানে থাক। তোমার নিকট পেঁটরার ও বাক্সর যে সকল চাবি আছে, তাহা আমাকে দাও।” আমি তাহার নিকট হইতে সেই সকল চাবি লইয়া ঝাঁপানে বসিলাম; বলিলাম, “ঝাঁপান উঠাও।” ঝাঁপান উঠিল; বাঙ্গী-বর্দারেরা বাঙ্গী লইয়া চলিল; হতবুদ্ধি কিশোরী স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

আমি আনন্দে ও উৎসাহে, বাজার দেখিতে দেখিতে শিমলা ছাড়াইলাম। দুই ঘণ্টা চলিয়া একটা পর্ব্বতে যাইয়া দেখি, তাহার পার্শ্ব-পর্ব্বতে যাইবার সেতু ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, আর চলিবার পথ নাই। ঝাঁপানীরা ঝাঁপান রাখিল। আমায় কি

"তবে এখান হইতে ফিরিয়া যাইতে হইবে?" ঝাঁপানীরা বলিল, "যদি এই ভাঙ্গা পুলের কার্নিস দিয়া একা-একা চলিয়া এই পুল পার হইতে পারেন, তবে আমরা খালি ঝাঁপান লইয়া খদ দিয়া ওপারে যাইয়া আপনাকে ধরিতে পারি।" আমার তখন যেমন মনের বেগ, তেমনি আমি সাহস করিয়া এই উপায়ই অবলম্বন করিলাম। কার্নিসের উপরে একটীমাত্র পা রাখিবার স্থান, হাতে ধরিবার কোন দিকে কোন অবলম্বন নাই, নীচে ভয়ঙ্কর গভীর খদ; ঈশ্বর-প্রসাদে আমি তাহা নির্ব্বিঘ্নে লঙ্ঘন করিলাম। ঈশ্বর-প্রসাদে যথার্থই "পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্"—আমার ভ্রমণের সঙ্কল্প ব্যর্থ হইল না।

তথা হইতে ক্রমে পর্ব্বতের উপরে উঠিতে লাগিলাম। সেই পর্ব্বত একেবারে প্রাচীরের ন্যায় সোজা হইয়া এত উচ্চে উঠিয়াছে যে, সেখান হইতে নীচের খদের কেলু-গাছকেও ক্ষুদ্র চারার মত বোধ হইতে লাগিল। নিকটেই গ্রাম। সেই গ্রাম হইতে বাঘের মত কতকগুলো কুকুর ঘেউ-ঘেউ করিয়া ছুটিয়া আসিল। সোজা খাড়া পর্ব্বত; নীচে বিষম খদ, উপরে কুকুরের তাড়া। ভয়ে-ভয়ে এ সঙ্কটে পথটা ছাড়াইলাম। দুই প্রহরের পর, একটা শূন্য পান্থশালা পাইয়া সে দিনের জন্য সেইখানেই অবস্থিতি করিলাম। আমার সঙ্গে রন্ধন করিবার কোন লোক নাই। ঝাঁপানীরা বলিল, "হম্‌লোগোকী রোটী বড়ী মিঠী হৈ।" আমি তাহাদের নিকট হইতে তাহাদের মকা- ও যব-মিশ্রিত একখানা রুটী লইয়া তাহারই একটু খাইয়া সে দিন কাটাইলাম। তাহাই আমার যথেষ্ট হইল।—"রূখা সূখা গহূকা টুকরা, লোনা অলোনা ক্যা। সির দিয়া, তো রোনা ক্যা।" খানিক পরে কতকগুলা

পাহাড়ী নিকটস্থ গ্রাম হইতে আমার নিকটে আসিল এবং নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী করিয়া আমোদে নৃত্য করিতে লাগিল। ইহাদের একজনের দিকে চাহিয়া দেখি যে, তাহার নাক নাই, মুখখানা একেবারে চ্যাপটা। জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুম্‌হারে মুঁহ্‌মেঁ য়হ্ ক্যা হুআ?" সে বলিল, "আমার মুখে একটা ভালুকে থাবা মারিয়াছিল।" আমার সম্মুখের একটা পথ দেখাইয়া বলিল, "ঐ পথে ভালুক আসিয়াছিল, তাহাকে তাড়াইতে যাওয়ায় সে থাবা মারিয়া আমার নাকটা উঠাইয়া লইয়াছে।" সে ভাঙ্গা মুখ লইয়া তাহার কতই নৃত্য, কতই তাহার আমোদ। আমি সেই পাহাড়ীদের সরল প্রকৃতি দেখিয়া বড়ই প্রীত হইলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া, অপরাহ্ণে একটা পর্ব্বতের চূড়ায় যাইয়া অবস্থান করিলাম। সেখানে গ্রামের অনেকগুলি লোক আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া বসিল। তাহারা বলিল, "আমাদের এখানে বড় ক্লেশে থাকিতে হয়। বরফের সময়ে এক-হাঁটু বরফ ভাঙ্গিয়া সর্ব্বদাই চলিতে হয়। ক্ষেতের সময় শূকর ও ভল্লুক আসিয়া সব ক্ষেত নষ্ট করে। রাত্রিতে মাচার উপর থাকিয়া আমরা ক্ষেত রক্ষা করি।" সেই পর্ব্বতের খদেই তাহাদের গ্রাম। তাহারা আমাকে বলিল, "আপনি আমাদের গ্রামে চলুন, সেখানে আমাদের বাড়ীতে সুখে থাকিতে পারিবেন, এখানে থাকিলে আপনার কষ্ট হইবে।" আমি কিন্তু সেই সন্ধ্যার সময়ে তাহাদের গ্রামে গেলাম না। সে পাকদণ্ডীর পথ, বড় কষ্টে উঠিতে নামিতে হয়। আমার যাইবার উৎসাহ সত্ত্বেও দুর্গম পথ বলিয়া গেলাম না।

আমি সে রাত্রি সেই চূড়াতেই থাকিয়া প্রভাতে সেখান হইতে চলিয়া গেলাম। এই দিন, দুই প্রহর পর্য্যন্ত চলিয়া ঝাঁপানীরা ঝাঁপান রাখিল; বলিল, "পথ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, আর ঝাঁপান চলে না।"—এখন কি করি? পথটা চড়াইয়ের, অথচ কোন পাকদণ্ডীও নাই। ভাঙ্গা পথ, উর্দ্ধের দিকে কেবল পাথরের উপরে পাথরের ঢিবি পড়িয়া রহিয়াছে। এই পথ-সঙ্কট দেখিয়াও কিন্তু আমি ফিরিতে পারিলাম না। আমি সেই ভাঙ্গা পথে পাথরের উপর দিয়া হাঁটিয়া উঠিতে লাগিলাম। একজন পিছনের দিকে আমার কোমরটার অবলম্বন হইয়া ধরিয়া রহিল। তিন ঘণ্টা এইরূপ করিয়া চলিয়া-চলিয়া, সেই ভাঙ্গা পথ অতিক্রম করিলাম। শিখরে উঠিয়া একটা ঘর পাইলাম; সে ঘরে একখানা কৌচ ছিল, আমি আসিয়াই তাহাতে শুইয়া পড়িলাম। ঝাঁপানীরা গ্রামে যাইয়া আমার জন্য এক বাটি দুধ আনিল, কিন্তু অতি-পরিশ্রমে আমার ক্ষুধা চলিয়া গিয়াছে, আমি সে দুধ খাইতে পারিলাম না। সেই যে কৌচে পড়িয়া রহিলাম, সমস্ত রাত্রি চলিয়া গেল, একবারও উঠিলাম না। প্রাতে শরীরে একটু বল আসিল। ঝাঁপানীরা আবার এক বাটি দুধ আনিয়া দিল, আমি তাহা পান করিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম। আরো উপরে উঠিয়া, সে দিন নারকাণ্ডাতে উপস্থিত হইলাম। এ অতি উচ্চ শিখর। এখানে শীতের অতিশয় আধিক্য বোধ হইল।

পরদিন প্রাতঃকালে দুগ্ধ পান করিয়া পদব্রজেই চলিলাম। অদূরেই নিবিড় বনে প্রবিষ্ট হইলাম, যে হেতু সে পথ বনের মধ্য দিয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে সেই বন ভেদ করিয়া রৌদ্রের কিরণ ভগ্ন হইয়া পথে পড়িয়াছে, তাহাতে বনের শোভা আরো দীপ্তি

পাইতেছে। যাইতে যাইতে দেখি যে, বনের স্থানে স্থানে বহুকালের বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ-সকল মূল হইতে উৎপাটিত হইয়া ভূমিষ্ঠ প্রণত রহিয়াছে, ও অনেক তরুণ-বয়স্ক বৃক্ষও দাবানলে দগ্ধ হইয়া অসময়ে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। অনেক পথ চলিয়া পরে যানারোহণ করিলাম। ঝাঁপানে চড়িয়া ক্রমে আরও নিবিড় বনে প্রবিষ্ট হইলাম। পর্ব্বতের উপরে আরোহণ করিতে করিতে তাহার মধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া কেবল হরিদ্বর্ণ ঘন-পল্লবাবৃত বৃহৎ বৃক্ষ-সকল দেখিতে পাই। তাহাতে একটী পুষ্প কি একটী ফলও নাই। কেবল কেলু নামক বৃহৎ বৃক্ষেতে হরিদ্বর্ণ একপ্রকার কদাকার ফল দৃষ্ট হয়, তাহা পক্ষীতেও আহার করে না। কিন্তু পর্ব্বতের গাত্রে যে বিবিধ প্রকারের তৃণ-লতাদি জন্মে, তাহারই শোভা চমৎকার। তাহা হইতে যে কত জাতির পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে, তাহা সহজে গণনা করা যায় না। শ্বেতবর্ণ, পীতবর্ণ, নীলবর্ণ, স্বর্ণবর্ণ, সকল বর্ণেরই পুষ্প যথা-তথা হইতে নয়নকে আকর্ষণ করিতেছে। এই পুষ্প-সকলের সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য ও তাহাদিগের নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতা দেখিয়া, সেই পরম পবিত্র পুরুষের হস্তের চিহ্ন তাহাতে বর্ত্তমান বোধ হইল। যদিও ইহাদিগের যেমন রূপ তেমন গন্ধ নাই, কিন্তু আর এক প্রকার শ্বেতবর্ণ গোলাপ-পুষ্পের গুচ্ছ-সকল বন হইতে বনান্তরে প্রস্ফুটিত হইয়া, সমুদয় দেশ গন্ধে আমোদিত করিয়া রাখিয়াছে। এই শ্বেত গোলাপ চারি পত্রের এক স্তবক মাত্র। স্থানে স্থানে চামেলি-পুষ্পও গন্ধ দান করিতেছে। মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ষ্ট্রবেরি ফল-সকল খণ্ড খণ্ড রক্তবর্ণ উৎপলের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। আমার সঙ্গের এক ভৃত্য এক বনলতা হইতে তাহার

পুষ্পিত শাখা আমার হস্তে দিল। এমন সুন্দর পুষ্পের লতা আমি আর কখনো দেখি নাই; আমার চক্ষু খুলিয়া গেল, আমার হৃদয় বিকশিত হইল। আমি সেই ছোট ছোট শ্বেত পুষ্পগুলির উপরে অখিল মাতার হস্ত পড়িয়া রহিয়াছে দেখিলাম। এই বনের মধ্যে কে-বা সেই-সকল পুষ্পের গন্ধ পাইবে, কে-বা তাহাদের সৌন্দর্য্য দেখিবে? তথাপি তিনি কত যত্নে, কত স্নেহে তাহাদিগকে সুগন্ধ দিয়া, লাবণ্য দিয়া, শিশিরে সিক্ত করিয়া, লতাতে সাজাইয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার করুণা ও স্নেহ আমার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল।

শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

[১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি দারিদ্র্যে অতিশয় কষ্ট ভোগ করেন, তথাপি অনেক পরিশ্রম করিয়া নানা শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। বহু লোক এই উপাধি পাইয়াছেন, কিন্তু 'বিদ্যাসাগর' বলিতে বঙ্গদেশে শুধু ঈশ্বরচন্দ্রকেই বুঝায়। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন, কিন্তু উপরিতন কর্ম্মচারীর সঙ্গে মতদ্বৈধ হওয়ায় চাকরি ত্যাগ করিয়া বঙ্গসাহিত্য-সেবায় রত হন। সাহিত্যসেবা-দ্বারা তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন এবং সেই অর্থ তিনি দুঃস্থ ও অনাথদের উপকারার্থ মুক্তহস্তে ব্যয় করিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়ের অপরিসীম করুণা তাঁহার রচিত পুস্তকগুলিকে সরস, মধুর ও উদ্দীপনাময় করিয়া রাখিয়াছে। বাঙ্গালার গদ্য-সাহিত্য তাঁহার নিকট অশেষরূপে ঋণী; তাঁহাকে কেহ কেহ 'বঙ্গসাহিত্যের জনক' বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। তিনি 'সীতার বনবাস,' 'শকুন্তলা,' 'ভ্রান্তিবিলাস,' 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি,' 'আখ্যান-মঞ্জরী' প্রভৃতি বহু পুস্তক রচনা করেন। ইহা ছাড়া সংস্কৃত-শিক্ষার উপযোগী কয়েকখানি প্রাথমিক শিক্ষা-পুস্তক এবং ব্যাকরণও তিনি রচনা করেন। তিনি প্রাচীন শ্রেণীর পণ্ডিত হইয়াও ইংরেজী ভাষায় বিশেষ অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। তিনি একজন সমাজ-সংস্কারক ছিলেন এবং বিধবা-বিবাহ প্রচার ও বহুবিবাহ নিবারণ করিতে প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর পরলোক-গমন করেন। গভর্নমেণ্ট তাঁহাকে 'সি. আই. ই.' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন।]

প্রস্থানসময় উপস্থিত হইল। গৌতমী এবং শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত নামে দুই শিষ্য, শকুন্তলার সমভিব্যাহারে গমনের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা যথাসম্ভব বেশভূষার সমাধান করিয়া দিলেন। মহর্ষি শোকাকুল হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, অদ্য শকুন্তলা যাইবেক বলিয়া আমার মন উৎকণ্ঠিত হইতেছে; নয়ন অনবরত বাষ্পবারিতে পরিপূরিত হইতেছে; কণ্ঠরোধ হইয়া বাক্‌শক্তিরহিত হইতেছি; জড়তায় নিতান্ত অভিভূত হইতেছি। কি আশ্চর্য্য! আমি বনবাসী, স্নেহবশতঃ আমারও ঈদৃশ বৈক্লব্য উপস্থিত হইতেছে; না জানি সংসারীরা এমন অবস্থায় কি দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। বুঝিলাম, স্নেহ অতি বিষম বস্তু। অনন্তর তিনি শোকাবেগ সংবরণ করিয়া, শকুন্তলাকে কহিলেন, বৎসে! বেলা হইতেছে, প্রস্থান কর; আর অনর্থক কালহরণ করিতেছ কেন? এই বলিয়া তপোবন-তরুদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সন্নিহিত তরুগণ! যিনি তোমাদের জলসেচন না করিয়া, কদাচ জলপান করিতেন না; যিনি ভূষণপ্রিয়া হইয়াও, স্নেহবশতঃ কদাচ তোমাদের পল্লবভঙ্গ করিতেন না; তোমাদের কুসুমপ্রসবের সময় উপস্থিত হইলে, যাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না,—অদ্য সেই শকুন্তলা পতিগৃহে যাইতেছেন, তোমরা সকলে অনুমোদন কর।

অনন্তর সকলে গাত্রোত্থান করিলেন। শকুন্তলা গুরুজনদিগকে প্রণাম করিয়া, প্রিয়ংবদার নিকটে গিয়া, অশ্রুপূর্ণনয়নে কহিতে লাগিলেন, সখি! আর্য্যপুত্রকে দেখিবার নিমিত্ত আমার চিত্ত নিতান্ত ব্যগ্র হইয়াছে বটে কিন্তু তপোবন পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আমার পা উঠিতেছে না। প্রিয়ংবদা কহিলেন, সখি!

তুমিই যে কেবল তপোবন-বিরহে কাতর হইতেছ, এরূপ নহে, তোমার বিরহে তপোবনের কি অবস্থা ঘটিতেছে, দেখ!—জীবমাত্রই নিরানন্দ ও শোকাকুল; হরিণগণ আহার-বিহারে পরাঙ্মুখ হইয়া স্থির হইয়া রহিয়াছে,—মুখের গ্রাস মুখ হইতে পড়িয়া যাইতেছে; ময়ূর-ময়ূরী নৃত্য পরিত্যাগ করিয়া, ঊর্দ্ধমুখ হইয়া রহিয়াছে; কোকিলগণ আম্রমুকুলের রসাস্বাদে বিমুখ হইয়া নীরব হইয়া আছে; মধুকর-মধুকরী মধুপানে বিরত হইয়াছে ও গুন্ গুন্ ধ্বনি পরিত্যাগ করিয়াছে।

কণ্ব কহিলেন, বৎসে! আর কেন বিলম্ব কর, বেলা হয়। তখন শকুন্তলা কহিলেন, তাত! বনতোষিণীকে সম্ভাষণ না করিয়া যাইব না। এই বলিয়া তিনি বনতোষিণীর নিকটে গিয়া কহিলেন, বনতোষিণি! শাখাবাহু-দ্বারা আমায় স্নেহভরে আলিঙ্গন কর; আজ অবধি আমি দূরবর্ত্তিনী হইলাম। অনন্তর অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাকে কহিলেন, সখি! আমি বনতোষিণীকে তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিলাম। তাঁহারা কহিলেন, সখি! আমাদিগকে কাহার হস্তে সমর্পণ করিলে, বল। এই বলিয়া, উভয়ে শোকাকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন কণ্ব কহিলেন, অনসূয়ে! প্রিয়ংবদে! তোমরা কি পাগল হইলে? তোমরা কোথায় শকুন্তলাকে সান্ত্বনা করিবে, না হইয়া, তোমরাই রোদন করিতে আরম্ভ করিলে!

এক পূর্ণগর্ভা হরিণী কুটীরের প্রান্তে শয়ন করিয়া ছিল। তাহার দিকে দৃষ্টিপাত হওয়াতে শকুন্তলা কণ্বকে কহিলেন, তাত! এই হরিণী নির্ব্বিঘ্নে প্রসব করিলে, আমায় সংবাদ দিবে, ভুলিবে না, বল। কণ্ব কহিলেন, না বৎসে! আমি কখনই ভুলিব না।

কতিপয় পদ গমন করিয়া, শকুন্তলার গতিভঙ্গ হইল। শকুন্তলা, আমার অঞ্চল ধরিয়া কে টানিতেছে, এই বলিয়া মুখ ফিরাইলেন। কণ্ব কহিলেন, বৎসে! যাহার মাতৃবিয়োগ হইলে তুমি জননীর ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছিলে; যাহার আহারের নিমিত্ত তুমি সর্ব্বদা শ্যামাক আহরণ করিতে; যাহার মুখ কুশের অগ্রভাগ-দ্বারা ক্ষত হইলে, তুমি ইঙ্গুদিতৈল দিয়া ব্রণশোষণ করিয়া দিতে,—সেই মাতৃহীন হরিণশিশু তোমার গতিরোধ করিতেছে! শকুন্তলা তাহার গাত্রে হস্তপ্রদান করিয়া কহিলেন, বাছা! আর আমার সঙ্গে আইস কেন, ফিরিয়া যাও, আমি তোমায় পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি। তুমি মাতৃহীন হইলে আমি তোমায় প্রতিপালন করিয়াছিলাম; এখন আমি চলিলাম; অতঃপর পিতা তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। এই বলিয়া শকুন্তলা রোদন করিতে লাগিলেন। তখন কণ্ব কহিলেন, বৎসে! শান্ত হও, অশ্রুবেগ সংবরণ কর, পথ দেখিয়া চল; উচ্চ-নীচ না দেখিয়া পদক্ষেপ করাতে বারবার আঘাত লাগিতেছে।

এইরূপ নানা কারণে গমনে বিলম্ব দেখিয়া, শার্ঙ্গরব কণ্বকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনকার আর অধিক দূর সঙ্গে আসিবার প্রয়োজন নাই; এই স্থলেই, যাহা বলিতে হয়, বলিয়া দিয়া প্রতিগমন করুন। কণ্ব কহিলেন, তবে আইস, এই ক্ষীরবৃক্ষের ছায়ায় দণ্ডায়মান হই। তদনুসারে সকলে সন্নিহিত ক্ষীরপাদপের ছায়ায় অবস্থিত হইলে, কণ্ব কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া শার্ঙ্গরবকে কহিলেন, বৎস! তুমি শকুন্তলাকে রাজার সম্মুখে রাখিয়া তাঁহারে আমার এই আবেদন জানাইবে,—আমরা বনবাসী, তপস্যায় কালযাপন করি; তুমি অতি প্রধান

বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ; আর শকুন্তলা বন্ধুবর্গের অগোচরে স্বেচ্ছাক্রমে তোমাতে অনুরাগিণী হইয়াছে; এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া, অন্যান্য সহধর্ম্মিণীর ন্যায়, শকুন্তলাতেও স্নেহদৃষ্টি রাখিবে; আমাদের এই পর্য্যন্ত প্রার্থনা; ইহার অধিক ভাগ্যে থাকে, ঘটিবেক, তাহা আমাদের বলিয়া দিবার নয়।

মহর্ষি শার্ঙ্গরবের প্রতি এই সন্দেশ নির্দ্দেশ করিয়া, শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎসে! এক্ষণে তোমারেও কিছু উপদেশ দিব—আমরা বনবাসী বটে, কিন্তু লৌকিক ব্যাপারে নিতান্ত অনভিজ্ঞ নহি। তুমি পতিগৃহে গিয়া গুরুজনদিগের শুশ্রূষা করিবে; সপত্নীদিগের সহিত প্রিয়সখী-ব্যবহার করিবে; পরিচারিণীদিগের প্রতি সম্পূর্ণ দয়া-দাক্ষিণ্য-প্রদর্শন করিবে; সৌভাগ্যগর্ব্বে গর্ব্বিত হইবে না; স্বামী কার্কশ্য-প্রদর্শন করিলেও রোষবশা ও প্রতিকূলচারিণী হইবে না; মহিলারা এরূপ ব্যবহারিণী হইলেই গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিতা হয়; বিপরীতকারিণীরা কুলের কণ্টকস্বরূপ। ইহা কহিয়া বলিলেন, দেখ, গৌতমীই বা কি বলেন। গৌতমী কহিলেন, বধূদিগকে এই বই আর কি বলিয়া দিতে হইবেক? পরে শকুন্তলাকে কহিলেন, বাছা! উনি যেগুলি বলিলেন সকল মনে রাখিও।

সীতার নির্ব্বাসন

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

পরদিন প্রভাত হইবামাত্র লক্ষ্মণ সুমন্ত্রকে বলিলেন, সারথে ! অবিলম্বে রথ প্রস্তুত করিয়া আন ; আর্য্যা জানকী তপোবনদর্শনে গমন করিবেন। সুমন্ত্র, আদেশপ্রাপ্তি মাত্র, রথ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত প্রস্থান করিলেন। অনন্তর লক্ষ্মণ জানকীর বাসভবনে গমন করিয়া দেখিলেন, তিনি, তপোবনগমনের উপযোগী সমস্ত আয়োজন করিয়া, প্রস্তুত হইয়া রথের প্রতীক্ষা করিতেছেন। লক্ষ্মণ সন্নিহিত হইয়া, আর্য্যে ! অভিবাদন করি, এই বলিয়া প্রণাম করিলেন। সীতা, বৎস ! চিরজীবী ও চিরসুখী হও, এই বলিয়া, অকৃত্রিম স্নেহ-সহকারে আশীর্ব্বাদ করিলেন। লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্য্যে ! রথ প্রস্তুতপ্রায়, প্রস্থানের অধিক বিলম্ব নাই। সীতা, পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া প্রফুল্ল বদনে বলিলেন, বৎস ! অদ্য প্রভাতে তপোবন-দর্শনে যাইব, এই আনন্দে আমি রাত্রিতে নিদ্রা যাই নাই ; সমস্ত আয়োজন করিয়া প্রস্তুত হইয়া আছি ; রথ উপস্থিত হইলেই আরোহণ করি। আমি মনে করিয়াছিলাম, আর্য্যপুত্র এমন সময়ে আমার তপোবনগমনে আপত্তি করিবেন ; তাহা না করিয়া, প্রসন্নমনে অনুমোদন করাতে, আমি কত প্রীতিলাভ করিয়াছি, বলিতে পারি না। বোধ হয়, আমি জন্মান্তরে অনেক তপস্যা করিয়াছিলাম ; সেই তপস্যার বলে এমন অনুকূল পতি পাইয়াছি ; আর্য্যপুত্রের মত

অনুকূল পতি কখনও কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। আর্য্যপুত্রের স্নেহ, দয়া ও মমতার কথা মনে হইলে, আমার সৌভাগ্যগর্ব্ব হইয়া থাকে। আমি দেবতাদের নিকট কায়মনোবাক্যে নিয়ত এই প্রার্থনা করিয়া থাকি, যদি পুনরায় নারীজন্ম হয়, যেন আর্য্যপুত্রকে পতি পাই। এই বলিয়া সীতা প্রীতিপ্রফুল্লনয়নে বলিলেন, বৎস! বনবাসকালে মুনিপত্নীদের সহিত আমার নিরতিশয় প্রণয় হইয়াছিল; তাঁহাদিগকে দিবার নিমিত্ত সমস্ত বিচিত্র বসন ও মহামূল্য আভরণ লইয়াছি।

এই বলিয়া সীতা সেই সমস্ত লক্ষ্মণকে দেখাইতেছেন, এমন সময়ে প্রতিহারী আসিয়া সংবাদ দিল, সুমন্ত্র রথ প্রস্তুত করিয়া দ্বারদেশে আনিয়াছেন। সীতা তপোবনদর্শনে যাইবার নিমিত্ত এত উৎসুক হইয়াছিলেন যে, শ্রবণ মাত্র অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া, সমুদয় দ্রব্যসামগ্রী লইয়া, লক্ষ্মণ-সমভিব্যাহারে রথে আরোহণ করিলেন। অনধিক সময়েই, রথ অযোধ্যা হইতে বিনির্গত হইয়া জনপদে প্রবিষ্ট হইল। সীতা নয়নের ও মনের প্রীতিপ্রদ প্রদেশ-সকল প্রত্যক্ষ করিয়া, প্রীতমনে বলিতে লাগিলেন, বৎস লক্ষ্মণ! আমি যে এই সকল মনোহর প্রদেশ দেখিতেছি, ইহা কেবল আর্য্যপুত্রের প্রসাদের ফল; তিনি প্রসন্নমনে অনুমোদন না করিলে, আমার ভাগ্যে এ প্রীতিলাভ ঘটিয়া উঠিত না। আমি যেমন আহ্লাদ করিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তিনিও তেমনিই অনুকূলতাপ্রদর্শন করিয়াছেন। লক্ষ্মণ, মুগ্ধস্বভাবা সীতার এইরূপ হর্ষাতিশয় দেখিয়া, এবং অবশেষে রামচন্দ্র কিরূপ অনুকূলতা-প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা ভাবিয়া, মনে মনে ম্রিয়মাণ হইলেন; অতি কষ্টে উচ্ছলিত শোকাবেগের সংবরণ করিয়া, এবং অনেক

যত্নে ভাব গোপন করিয়া সীতার ন্যায় হর্ষপ্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

এই ভাবে কিয়ৎদূর গমন করিলে পর, সীতা সহসা ম্লানবদনা হইয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন, বৎস! এতক্ষণ আমি মনের আনন্দে আসিতেছিলাম; কিন্তু সহসা আমার ভাবান্তর উপস্থিত হইল। দক্ষিণ নয়ন অনবরত স্পন্দিত হইতেছে; সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতেছে; অন্তঃকরণ যারপরনাই ব্যাকুল হইতেছে; পৃথিবী শূন্যময় দেখিতেছি। অকস্মাৎ এরূপ চিত্তচাঞ্চল্য ও অসুখের আবির্ভাব হইল কেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। না জানি আর্য্যপুত্র কেমন আছেন; হয় তাঁহার কোন অশুভ ঘটনা হইয়াছে, নয় প্রাণাধিক ভরত ও শত্রুঘ্নের কোন অনিষ্ট ঘটিয়াছে; কিংবা ভগবান্ ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম হইতেই কোনও অশুভ সংবাদ আসিয়াছে; তথায় গুরুজন কে কেমন আছেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, কোনও প্রকার সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই; নতুবা, এমন আনন্দের সময় এরূপ চিত্ত-চাঞ্চল্য ও অসুখসঞ্চার উপস্থিত হইবেক কেন? বৎস! কি নিমিত্ত এরূপ হইতেছে বল; আমার প্রাণ কেমন করিতেছে, আর আমার তপোবনদর্শনে অভিলাষ হইতেছে না; আমার ইচ্ছা হইতেছে, এখনই অযোধ্যায় ফিরিয়া যাই। ভাল, তোমায় জিজ্ঞাসা করি, আর্য্যপুত্র সঙ্গে আসিবেন বলিয়াছিলেন; তাঁহার আসা হইল না কেন? রথে উঠিবার সময় আহ্লাদে তোমায় সে কথা জিজ্ঞাসিতে ভুলিয়াছিলাম। তাঁহার না আসাতে আমার মনে নানা সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। বৎস! কি করি বল; আমার চিত্তচাঞ্চল্য ক্রমেই প্রবল হইতেছে।

রাবণ হরণ করিয়া লইয়া যাইবার পূর্ব্বক্ষণে ঠিক এইরূপ চিত্ত-চাঞ্চল্য ঘটিয়াছিল; আবার কি সেইরূপ কোনও উৎপাত উপস্থিত হইবেক? না জানি কি সর্ব্বনাশই ঘটিবেক। একবার মনে হইতেছে, তপোবনদর্শনে না আসিলেই ভাল হইত; আর্য্যপুত্রের নিকটে থাকিলে কখনও এরূপ অসুখ উপস্থিত হইত না। এক একবার মনে হইতেছে, আর আমি এ জন্মে আর্য্যপুত্রকে দেখিতে পাইব না।

সীতার এইরূপ চিত্তচাঞ্চল্য দেখিয়া ও কাতরোক্তি শুনিয়া, লক্ষ্মণ যৎপরোনাস্তি বিষণ্ণ ও শোকাকুল হইলেন; কিন্তু অতি কষ্টে ভাব গোপন করিয়া শুষ্কমুখে বিকৃতস্বরে বলিলেন, আর্য্যে! আপনি কাতর হইবেন না। রঘুকুলদেবতারা আমাদের মঙ্গল করিবেন। বোধ হয়, সকলকে ছাড়িয়া আসিয়াছেন, কেহ নিকটে নাই, এ জন্যই আপনকার এই চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিয়াছে। আপনি অস্থির হইবেন না; কিয়ৎক্ষণ পরেই উহার নিবৃত্তি হইবেক। মধ্যে মধ্যে সকলেরই চিত্তবৈকল্য ঘটিয়া থাকে। মন স্বভাবতঃ চঞ্চল, সকল সময়ে এক ভাবে থাকে না। আপনি অত উৎকণ্ঠিত হইবেন না।

সীতা লক্ষ্মণের মুখশোষ ও স্বরবৈলক্ষণ্য দর্শনে অধিকতর কাতর হইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! তোমার ভাব দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। আমি কখনও তোমার মুখ এরূপ ম্লান দেখি নাই। যদি কোনও অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে, স্পষ্ট করিয়া বল। বলি, আর্য্যপুত্র ভাল আছেন ত? কল্য অপরাহ্নের পর আর তাঁহার সঙ্গে দেখা হয় নাই। বোধ হয়, তাঁহাকে দেখিতে পাইলে এতক্ষণ এত অসুখ

থাকিত না। তখন লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্য্যে! আপনি ব্যাকুল হইবেন না; আপনার উৎকণ্ঠা ও অসুখ দেখিয়া আমিও উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলাম ও অসুখ বোধ করিয়াছিলাম; তাহাতেই আপনি আমার মুখশোষ ও স্বরবৈলক্ষণ্য লক্ষিত করিয়াছেন; নতুবা বাস্তবিক তাহা নহে; উহা মনে করিয়া, আপনি বিরুদ্ধ ভাবনা উপস্থিত করিবেন না। যত ভাবিবেন, যত আন্দোলন করিবেন, ততই উৎকণ্ঠা ও অসুখ বাড়িবেক।

কিয়ৎক্ষণ পরেই তাঁহাদের রথ গোমতীতীরে উপস্থিত হইল। সেই সময়ে, সকলভুবনপ্রকাশক ভগবান্ কমলিনীনায়ক অস্তগিরি-শিখরে অধিরোহণ করিলেন। সায়ংসময়ে গোমতীতীর পরম রমণীয় হইয়া উঠে। তৎকালে তথায় অতি অসুস্থচিত্ত ব্যক্তিও সুস্থচিত্ত ও অনির্ব্বচনীয় প্রীতি প্রাপ্ত হয়। সৌভাগ্যক্রমে সীতারও উপস্থিত আন্তরিক অসুখের সম্পূর্ণ অপসারণ হইল। লক্ষ্মণ দেখিয়া সাতিশয় প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন। তাঁহারা সে রাত্রি সেই স্থানে অবস্থিতি করিলেন। জানকী পথশ্রমে, বিশেষতঃ মনের উৎকণ্ঠায়, সাতিশয় ক্লান্ত হইয়াছিলেন; সুতরাং ত্বরায় তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইল। তিনি যতক্ষণ জাগরিত ছিলেন, লক্ষ্মণ সতর্ক হইয়া তাঁহাকে নানা মনোহর কথায় এরূপ ব্যাপৃত রাখিয়াছিলেন যে, তিনি অন্য কোনও দিকে মনঃসংযোগ করিবার অবকাশ পান নাই। ফলতঃ, দিবাভাগে জানকীর যেরূপ অসুখ সঞ্চার হইয়াছিল, রজনীতে তাহার আর কোনও লক্ষণ ছিল না।

প্রভাত হইবা মাত্র, তাঁহারা গোমতীতীর হইতে প্রস্থান করিলেন। সীতা, বামে ও দক্ষিণে, পরম রমণীয় প্রদেশ-সকল নয়নগোচর করিয়া, যারপরনাই প্রীতিলাভ করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্ব দিন তাঁহার যেরূপ উৎকণ্ঠা ও অসুখ সঞ্চার হইয়াছিল, তাহার কোনও লক্ষণ লক্ষিত হইল না।

অবশেষে রথ ভাগীরথীতীরে উপস্থিত হইল। ভাগীরথীর অপর পারে লইয়া গিয়া সীতাকে এ জন্মের মত বিসর্জ্জন দিয়া আসিতে হইবেক, এই ভাবিয়া লক্ষ্মণের শোকসাগর অনিবার্য্য বেগে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। আর তিনি ভাবগোপন বা অশ্রুবেগ-সংবরণ করিতে পারিলেন না। সীতা দেখিয়া সাতিশয় বিষণ্ণ হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, বৎস। কি কারণে তোমার এরূপ ভাব উপস্থিত হইল, বল। তখন লক্ষ্মণ নয়নের অশ্রুমার্জ্জন করিয়া বলিলেন, আর্য্যে! আপনি ব্যাকুল হইবেন না; বহুকালের পর ভাগীরথীর দর্শনলাভ করিয়া, আমার অন্তঃকরণে কেমন এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইয়াছে, তাহাতেই অকস্মাৎ আমার নয়নযুগল হইতে বাষ্পবারি বিগলিত হইল। আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা কপিলশাপে ভস্মাবশেষ হইয়াছিলেন; ভগীরথ কত কষ্টে গঙ্গাদেবীকে ভূমণ্ডলে আনিয়া তাঁহাদের উদ্ধারসাধন করেন। বোধ হয়, তাহাই ভাগীরথীদর্শনে স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়াতে এরূপ চিত্তবৈকল্য উপস্থিত হইয়াছিল। সীতা একান্ত মুগ্ধস্বভাবা ও নিতান্ত সরলহৃদয়া; লক্ষ্মণের এই তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যাতেই সন্তুষ্ট হইলেন; এবং, গঙ্গা পার হইবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়া, লক্ষ্মণকে বারংবার তাহার উদ্যোগ করিতে বলিতে লাগিলেন; কিন্তু, গঙ্গা পার হইলেই যে, দুস্তর শোকসাগরে পরিক্ষিপ্ত হইবেন, তখন পর্য্যন্ত কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলেন না।

কিয়ৎক্ষণ পরেই তরণীর সংযোগ হইল। লক্ষ্মণ, সুমন্ত্রকে সেই স্থানে রথ রাখিতে বলিয়া সীতাকে তরণীতে আরোহণ

করাইলেন, এবং কিয়ৎক্ষণ-মধ্যেই তাঁহাকে ভাগীরথীর অপর পারে উত্তীর্ণ করিলেন। সীতা, তপোবন দেখিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়া, তদভিমুখে প্রস্থান করিবার উপক্রম করিলেন। তখন লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্য্যে! কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন; আমার কিছু বক্তব্য আছে, এই স্থানে নিবেদন করিব। এই বলিয়া তিনি অধোবদনে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সীতা চকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! কিছু বলিবে বলিয়া এত ব্যাকুল হইলে কেন? কি বলিবে ত্বরায় বল; তোমার ভাবান্তর দেখিয়া আমার প্রাণ নিতান্ত ব্যাকুল হইতেছে। তুমি কি আসিবার সময় আর্য্য-পুত্রের কোনও অশুভ ঘটনা শুনিয়াছ, না অন্য কোনও সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে; কি হইয়াছে শীঘ্র বল। তখন লক্ষ্মণ বলিলেন, দেবি! বলিব কি, আমার বাক্যনিঃসরণ হইতেছে না; আর্য্যের আজ্ঞাবহ হইয়া আমার অদৃষ্টে যে এরূপ ঘটিবেক, তাহা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না। যে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা মনে করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। ইতঃপূর্ব্বে আমার মৃত্যু হইলে আমি সৌভাগ্যজ্ঞান করিতাম। যদি মৃত্যু অপেক্ষা কোনও অধিকতর দুর্ঘটনা থাকে, তাহাও আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর ছিল; তাহা হইলে, আজ আমায় এরূপ নিষ্ঠুর কাণ্ডের ভারগ্রহণ করিতে হইত না। হা বিধাতঃ! তোমার মনে কি এই ছিল। এই বলিয়া উন্মূলিত তরুর ন্যায়, ভূতলে পতিত হইয়া, লক্ষ্মণ হাহাকার করিতে লাগিলেন।

সীতা, লক্ষ্মণের ঈদৃশ অভাবিত ভাবান্তর উপস্থিত দেখিয়া, কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ ও হতবুদ্ধি হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন; অনন্তর হস্তধারণ-পূর্ব্বক তাঁহাকে ভূতল হইতে উঠাইয়া, অঞ্চল-দ্বারা

তদীয় নয়নের অশ্রু মার্জ্জন করিয়া দিলেন; এবং তিনি কিঞ্চিৎ শান্ত হইলে, কাতর বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! কি কারণে তুমি এত ব্যাকুল হইলে? কি জন্যই-বা তুমি মৃত্যুকামনা করিলে? তোমায় একান্ত বিকলচিত্ত দেখিতেছি; অল্প কারণে তুমি কখনই এত আকুল ও এত অস্থির হও নাই। বলি, আর্য্যপুত্রের ত কোনও অমঙ্গল ঘটে নাই? তুমি তদ্গতপ্রাণ; তোমার ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে, তাঁহারই অমঙ্গল ঘটিয়াছে। আমি এখন বুঝিতে পারিতেছি, এই জন্যই কল্য অপরাহ্নে আমার তাদৃশ চিত্তবৈকল্য ঘটিয়াছিল; যাহা হয়, ত্বরায় বলিয়া আমার জীবনদান কর; আমার যাতনার একশেষ হইতেছে। ত্বরায় বল, আর বিলম্ব করিও না। আমি স্পষ্ট বুঝিতেছি, আমারই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে; না হইলে, এমন সময়ে তুমি এত ব্যাকুল হইতে না।

সীতার এইরূপ ব্যাকুলতা ও কাতরতা দর্শনে, লক্ষ্মণের শোকানল শতগুণ প্রবল হইয়া উঠিল। নয়নযুগল হইতে অনর্গল অশ্রুজল নির্গত হইতে লাগিল; কণ্ঠরোধ হইয়া বাক্যনিঃসরণ রহিত হইয়া গেল। যত নিষ্ঠুর হউক না কেন, অবশেষে অবশ্যই বলিতে হইবেক, এই ভাবিয়া, লক্ষ্মণ বলিবার নিমিত্ত বারংবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোনও ক্রমে, তাঁহার মুখ হইতে তাদৃশ নিষ্ঠুর বাক্য নির্গত হইল না। তাঁহাকে এতাদৃশ অবস্থাপন্ন দেখিয়া, সীতা তাঁহার হস্ত ধরিয়া, ব্যাকুল চিত্তে কাতর বচনে বারংবার এই অনুরোধ করিতে লাগিলেন, বৎস! আর বিলম্ব করিও না; আর্য্যপুত্র যে আদেশ করিয়াছেন, তাহা, যত নিষ্ঠুর হউক না কেন, ত্বরায় বল; তুমি কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইও না; আমি অনুমতি দিতেছি, তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে বল।

তোমার কথা শুনিয়া ও ভাব দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হইতেছে, আমারই কপাল ভাঙ্গিয়াছে। কি হইয়াছে, ত্বরায় বল, আর বিলম্ব করিও না; আমি আর এক মুহূর্ত্ত এরূপ সংশয়িত অবস্থায় থাকিতে পারিব না; যাহা হয় বলিয়া আমার প্রাণরক্ষা কর।

সীতার এইরূপ অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া লক্ষ্মণ ভাবিলেন, আর বিলম্ব করা বিধেয় নহে। তখন অনেক যত্নে চিত্তের অপেক্ষাকৃত স্থৈর্য্যসম্পাদন করিয়া, অতি কষ্টে বাক্যনিঃসরণ করিলেন; বলিলেন, আর্য্যে! বলিব কি, বলিতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। আপনি একাকিনী রাবণ-গৃহে ছিলেন, সেই কারণে, পৌরগণ ও জানপদবর্গ, আপনকার চরিত্র-বিষয়ে সন্দিহান হইয়া, অপবাদ কীর্ত্তন করিয়া থাকে। আর্য্য ইহা অবগত হইয়া, একবারে স্নেহ, দয়া ও মমতায় বিসর্জ্জন দিয়া, অপবাদ-বিমোচনের নিমিত্ত আপনকার মায়া পরিত্যাগ করিয়াছেন; আমায় এই আদেশ দিয়াছেন, তুমি তপোবনদর্শনের ছলে লইয়া গিয়া, বাল্মীকির আশ্রমে রাখিয়া আসিবে। এই সেই বাল্মীকির আশ্রম।

এই বলিয়া লক্ষ্মণ ভূতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন। সীতাও শ্রবণ মাত্র গতচেতনা হইয়া, বাতাভিহতা কদলীতরুর ন্যায় ভূতল-শায়িনী হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে লক্ষ্মণের সংজ্ঞালাভ হইলে, তিনি অনেক যত্নে জানকীর চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। জানকী চেতনালাভ করিয়া, উন্মত্তার ন্যায় স্থিরনয়নে লক্ষ্মণের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ, হতবুদ্ধির ন্যায়, চিত্রার্পিতের প্রায়, অধোবদনে, গলদশ্রুনয়নে, দণ্ডায়মান রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, সীতার নয়নযুগল হইতে প্রবল বেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল; ঘন ঘন নিঃশ্বাস বহিতে লাগিল; সর্ব্বশরীর

কম্পিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে লক্ষ্মণ যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইয়া, সীতাকে প্রবোধ দিবার নিমিত্ত চেষ্টা পাইলেন; কিন্তু, কি বলিয়া প্রবোধ দিবেন, তাহার কিছু দেখিতে না পাইয়া, হতবুদ্ধি হইয়া, কেবল অবিশ্রান্ত অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

এই ভাবে কিয়ৎক্ষণ অতীত হইলে পর, সীতা চিত্তের অপেক্ষাকৃত স্থৈর্য্যসম্পাদন করিয়া বলিলেন, লক্ষ্মণ! কাহার দোষ দিব, সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ; নতুবা, রাজার কন্যা, রাজার বধূ, রাজার মহিষী হইয়া, কে কখন আমার মত চিরদুঃখিনী হইয়াছে, বল? বুঝিলাম, যাবজ্জীবন দুঃখভোগের নিমিত্তই আমার নারীজন্ম হইয়াছিল। বৎস! অবশেষে আমার যে এ অবস্থা ঘটিবেক, তাহা কাহার মনে ছিল? বহুকালের পর আর্য্যপুত্রের সহিত সমাগম হইলে, ভাবিয়াছিলাম, বুঝি এই অবধি দুঃখের অবসান হইল। কিন্তু, বিধাতা যে আমার কপালে সহস্রগুণ অধিক দুঃখ লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা স্বপ্নেও জানিতাম না। হায় রে বিধাতা! তোর মনে কি এতই ছিল।

এই বলিতে বলিতে জানকীর কণ্ঠ রোধ হইয়া গেল। তিনি কিয়ৎক্ষণ বাক্যনিঃসরণ করিতে পারিলেন না; অনন্তর দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বলিলেন, লক্ষ্মণ! নিষ্ঠুর বিধাতা আমার কপালে এত দুঃখভোগ লিখিলেন কেন, বুঝিতে পারিতেছি না। অথবা, বিধাতার অপরাধ কি; সকলেই আপন আপন কর্ম্মের ফলভোগ করে। আমি জন্মান্তরে যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছিলাম, এ জন্মে সেইরূপ ফলভোগ করিতেছি।

স্বপ্নদর্শন—বিদ্যাবিষয়ক

অক্ষয়কুমার দত্ত

[বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত চুপী গ্রামে ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে অক্ষয়কুমার দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। ইনি আদি ব্রাহ্ম-সমাজের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে জড়িত ছিলেন এবং 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। অক্ষয়কুমার ইংরেজী দর্শন ও বিজ্ঞান শাস্ত্রকে বাঙ্গালা ভাষায় সাধারণের উপভোগ্য করিয়া লিখিয়া খ্যাতি লাভ করেন। ইঁহার রচিত পুস্তকগুলির মধ্যে, 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার,' 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়,' 'চারুপাঠ' প্রভৃতি পুস্তক বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রসিদ্ধ। ইনি পরম পণ্ডিত ও সুলেখক ছিলেন।]

পরমেশ্বরের বিচিত্র রচনা-দর্শনার্থে পরম কৌতূহলী হইয়া, আমি কিয়ৎকালাবধি দেশভ্রমণে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এবং নানা স্থান পর্য্যটনপূর্ব্বক এখন মথুরা-সন্নিধানে আসিয়া অবস্থিতি করিতেছি। এখানে এক দিবস দুঃসহ গ্রীষ্মাতিশয়-প্রযুক্ত অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া, সায়ংকালে যমুনাতীরে উপবেশনপূর্ব্বক সুললিত লহরী-লীলা অবলোকন করিতেছিলাম। তথাকার সুস্নিগ্ধ মারুত হিল্লোলে শরীর শীতল হইতেছিল। কত শত দীপ্যমান হীরকখণ্ড গগন-মণ্ডলে ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইতে লাগিল, এবং তন্মধ্যে দিব্য-লাবণ্য-পরিশোভিত পূর্ণচন্দ্র বিরাজমান হইয়া, কখনও আপনার পরম রমণীয় অনির্ব্বচনীয় সুধাময় কিরণ বিকিরণপূর্ব্বক জগৎ সুধাপূর্ণ করিতেছিলেন, কখনও বা অল্প অল্প মেঘাবৃত হইয়া

স্বকীয় মন্দীভূত কিরণ-বিস্তার-দ্বারা পৌর্ণমাসী রজনীকে উষাস্বরূপ ম্লান করিতেছিলেন। কখনও তাঁহার সুপ্রকাশিত রশ্মিজাল সলিল-তরঙ্গে প্রবিষ্ট হইয়া কম্পমান হইতেছিল; কখনও গগনাবলম্বিত মেঘবিম্ব-দ্বারা যমুনার নির্ম্মল জল ঘনতর শ্যামবর্ণ হইয়া, অন্তঃকরণ হরণ করিতেছিল। পূর্ব্বে দূর হইতে লোকালয়ের কলরব শ্রুত হইতেছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হইয়া স্ব স্ব স্থানে লীন হইল, এবং সর্ব্বসন্তাপনাশিনী নিদ্রা জীবগণের নেত্রোপরি আবির্ভূতা হইয়া, সকল ক্লেশ শান্তি করিতে লাগিল।

এইরূপ সুস্নিগ্ধ সময়ে আমি তথায় এক পাষাণখণ্ডে উপবিষ্ট হইয়া, আকাশ-মণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে করিতে, জগতের আদি-অন্ত, কার্য্য-কারণ, সুখ-দুঃখ, ধর্ম্মাধর্ম্ম সমুদয় মনে মনে পর্য্যালোচনা করিতেছিলাম। ইতিমধ্যে জল-কল্লোলের কলকল-ধ্বনি, বৃক্ষ-পত্রের শরশর-শব্দ ও সুশীতল সমীরণের সুন্দর হিল্লোল-দ্বারা আমার পরম সুখানুভব হওয়ায়, মনোবৃত্তি-সমুদয় ক্রমে ক্রমে অবসন্ন হইয়া আসিল, এবং এই অবসরে নিদ্রা আমার অজ্ঞাতসারে নয়নদ্বয় নিমীলিত করিয়া, আমাকে অভিভূত করিল। আমার বোধ হইল, যেন এক বিস্তীর্ণ নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়া, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছি। তন্মধ্যে কোন কোন স্থানে কেবল নবীন-দূর্ব্বাদল-পরিপূর্ণ শ্যামবর্ণ ক্ষেত্র, কুত্রাপি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পুরাতন বৃক্ষসমূহ, কোথাও নদী বা নির্ঝরতীরস্থ মনোহর কুসুমোদ্যান দর্শন করিয়া অপর্য্যাপ্ত আনন্দ লাভ করিলাম। কৌতূহল-রূপ দীপ্ত হুতাশন ক্রমশঃ প্রজ্বলিত হইতে লাগিল; এবং তদনুসারে দিগ্‌বিদিক্ বিবেচনা না করিয়া, যতদূর দৃষ্ট হইল ততদূরই মহোৎসাহে ও পরম সুখে পর্য্যটন করিতে লাগিলাম।

অবশেষে এক সরোবর-তীরস্থ অতি নিবিড় নির্জ্জন নিস্তব্ধ বনখণ্ডে, এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শন করিয়া, পরম আনন্দ প্রাপ্ত হইলাম। তাঁহার অত্যুজ্জ্বল প্রসন্ন বদন ও অলৌকিক শান্ত স্বভাব দর্শনে, তাঁহাকে বনদেবতা জ্ঞান করিয়া, বিহিত-বিধানে নমস্কার করিলাম ও তাঁহার পুনঃপুনঃ দর্শনলাভ দ্বারা নয়ন-যুগল চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান থাকিলাম। দেখিলাম, তিনি আপনার কপোলপ্রদেশে হস্তার্পণ করিয়া, গগন-মণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেছেন। আমি তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসার মানস করিয়াছিলাম; কিন্তু আমার বাক্য-স্ফুরণ না হইতে, তিনি গাত্রোত্থান করিয়া, সাতিশয় আগ্রহপূর্ব্বক কহিলেন,—"আমি তোমার মানস জানিয়াছি; আমার নাম বিদ্যা; তুমি যে স্থানে যাইবার প্রার্থনা করিয়াছিলে, তাহার এই পথই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। যাঁহারা এই রম্য কানন ভ্রমণ করিতে আইসেন, আমিই তাঁহাদিগকে পথ প্রদর্শন করি; চল, তোমাকেও সঙ্গে লইয়া যাই।"

আমি তাঁহার এই আশ্বাস-বাক্যে বিশ্বাস করিয়া, হৃষ্টমনে তৎক্ষণাৎ পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলাম। উভয়-পার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষ-শ্রেণীর মধ্যদেশ দিয়া কিয়দ্দূর গমন করিতে করিতে, অরণ্যের শৈত্য, শোভা ও পবিত্রতা প্রত্যক্ষ করিয়া, অতুলানন্দ প্রাপ্ত হইলাম, এবং অত্যন্ত কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"দেবি, এ স্থানের নাম কি, এবং এখানে কি কি অপূর্ব্ব ব্যাপারই বা সম্পন্ন হইয়া থাকে?" তাহাতে তিনি সত্বর হইয়া উত্তর করিলেন,—"এ বিদ্যারণ্য, এ অরণ্যে সুন্দর সুন্দর বৃক্ষ আছে, অতি ভাগ্যবান্ ব্যক্তিরাই এখানে আগমন করেন;

কিন্তু ইহার ফল ভোগ করা অতিশয় আয়াস-সাধ্য, সকলের ভাগ্যে ঘটে না। কেহ কেহ দূর হইতে কোন বৃক্ষের উচ্চতা দর্শনমাত্র পরাঙ্মুখ হইয়া প্রতিগমন করেন, কেহ কেহ বা ফল-আহরণের প্রত্যাশায় কতক দূর বৃক্ষারূঢ় হইয়াও পুনর্ব্বার অধঃপতিত হন। কিন্তু যে ব্যক্তি একবার এই রমণীয় কাননের ফল ভোগ করিয়াছেন, তিনি আর কদাপি তাহার আস্বাদন বিস্মৃত হইতে পারেন না। আমি তোমাকে ক্রমে ক্রমে সমুদয় দর্শাইতেছি, চল। ঐ যে সুদৃশ্য মনোহর বৃক্ষ সম্মুখে দৃষ্টি করিতেছ, যাহার সতেজ শাখা-সমুদয় সুমধুর-রসস্ফীত-ফল-ভরে অবনত হইয়াছে, যাহার স্কন্ধ হইতে সুধাময় মধু-ধারা-সকল অনবরতই ক্ষরিতেছে ও সুকুমারমতি তরুণ যুবকেরা যাহাতে সুখে আরোহণ করিতেছে, উহার নাম কাব্য-তরু। দেখিয়াছ, অলঙ্কৃতি-রূপা কি অপূর্ব্ব আশ্চর্য্য রমণীয় লতা তাহাকে পরিবেষ্টন-পূর্ব্বক সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছে! বৃক্ষ হইতে কিছু দূরে, যে প্রকাণ্ড তেজস্বী বৃক্ষ দেখিতেছ, সুধীর প্রবীণ ব্যক্তিরা যাহার সেবা করিতেছেন, তাহার নাম জ্যোতিষ।" ইহা কহিয়া বিদ্যাদেবী ঐ বৃক্ষের অশেষ গুণ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

তাঁহার বাক্যাবসান হইলে, আমি জ্যোতিষ-তরুর নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলাম, পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিত-সমুদয় এক একবার প্রগাঢ়রূপ মনোনিবেশ-পূর্ব্বক ধ্যান-পরায়ণ হইতেছেন, আর বার প্রসন্নবদনে হাস্য করিয়া অতুল আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। পরন্তু আর এক অসাধারণ ব্যাপার দেখিয়া, সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলাম। ঐ বৃক্ষের মূল মৃত্তিকা-সংযুক্ত নহে; আর এক প্রকাণ্ড প্রাচীন বৃক্ষের স্কন্ধ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আমি এই শেষোক্ত তরুর

ন্যায় সারবান্ বৃক্ষ আর একটিও দৃষ্টি করি নাই। তাহার কোন স্থানের কণামাত্রও ক্ষয় হয় নাই ও কুত্রাপি একটিমাত্র ছিদ্র কিংবা চিহ্ন নাই। আমি এই অদ্ভুত তরুর বিষয় সবিশেষ জানিবার জন্য পরম কৌতূহলী হইয়া, বিদ্যাদেবীকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি কহিলেন,—"এই সারবান্ অক্ষয় বৃক্ষের নাম গণিত। তুমি কেবল সম্মুখবর্ত্তী জ্যোতিষ-তরুর মূল ইহাতে সংবদ্ধ দেখিতেছ; প্রদক্ষিণ করিয়া দেখ, অন্যান্য কত আশ্চর্য্য বৃক্ষ ও লতা ইহার স্কন্ধ হইতে উৎপন্ন হইয়া, তদুপরি প্রতিষ্ঠিত আছে।" বস্তুতঃ আমি বেষ্টন করিয়া দেখিলাম, তাঁহার কথা প্রামাণিক বটে; শাখা, প্রশাখা ও বৃক্ষরুহ সংবলিত এক গণিত-বৃক্ষ অর্দ্ধ-কানন ব্যাপিয়া রহিয়াছে।

তথা হইতে প্রস্থানান্তর আমার সমভিব্যাহারিণী পথপ্রদর্শিকা বনদেবী সানুগ্রহ-বচনে বলিলেন,—"সর্ব্বদেশীয় বৃক্ষলতাদি আনয়ন করিয়া এ কাননে রোপণ করা গিয়াছে। জ্যোতিষ ও গণিতের কয়েকটা কলম তোমাদিগের দেশ হইতেও আহরণ করা গিয়াছে। দেখ, ভিন্ন-জাতীয় লোকে এই কাননে অবস্থিতি করিয়া, উৎসাহ- ও যত্ন-সহকারে তাহার কেমন পারিপাট্য- ও উন্নতি-সাধন করিয়াছে! আর তোমার স্বদেশীয় লোকদিগকে ধিক্কার করিতে হয়; কারণ, যতগুলি বৃক্ষ রক্ষণাবেক্ষণের ভার কেবল তাঁহাদিগের উপর সমর্পিত আছে, প্রায় তাহার সমুদয়ই ভগ্ন ও শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। দক্ষিণ দিকে যত বৃক্ষ দেখিতেছ, সমস্তই এক-জাতীয়, তাহার নাম স্মৃতি; আর বাম দিকে যত দৃষ্ট হইতেছে, তাহার নাম দর্শন।" আমি ঐ উভয় জাতীয় বৃক্ষ অবলোকন করিয়া, যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইলাম। ঐ সমস্ত সহজেই অসার, রন্ধ্রপরিপূর্ণ,

কোনটা বা নিতান্ত শূন্তগর্ভ, তাহাতে আবার সমুচিত যত্ন-সহকারে পরিপালিত না হওয়াতে, অতিশয় দুরবস্থ হইয়া রহিয়াছে। দেখিলাম, দক্ষিণ দিকে সমুদয় বৃক্ষ যদিও সম্যগ্‌রূপে নষ্ট হয় নাই, কতকগুলি শুষ্ক ও ভগ্ন-শাখ হইয়াছে, কিন্তু পারিপাট্য নাই; বোধ হইল, যেন প্রবল ঝঞ্ঝাবাত-দ্বারা সমুদয় বিপ্লুত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে। বাম দিকের কোন বৃক্ষের কেবল স্কন্ধমাত্র আছে, কোনটির বা সমুদয় গিয়া এক দিকের একমাত্র শাখা আছে, তদ্ভিন্ন কোন কোন বৃক্ষের স্কন্ধমাত্রও দৃষ্টিগোচর হইল না। এই দুঃসহ দুঃখের সময়ে এক পরম কৌতুক দেখিলাম,—কতকগুলি অভিমানী মনুষ্য উভয়পার্শ্বস্থ বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া, অত্যন্ত দম্ভ-ও ব্যাপকতা-সহকারে মহাকোলাহল ও বিষম কলহ আরম্ভ করিয়াছে।

এইরূপ শারীরস্থান, রসায়ন, চিকিৎসা প্রভৃতি অনির্ব্বচনীয় পরম রমণীয় তরু-সমূহ দর্শন করিয়া, সাতিশয় সন্তোষ প্রাপ্ত হইলাম, এবং অতি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইয়া, পথিমধ্যে পরমারাধ্যা বিদ্যাদেবীকে কহিলাম,—"দেবি! আমি তোমার প্রসাদে অদ্য অনুপম সুখ অনুভব করিলাম। ভূমণ্ডলে এত নির্ম্মল সুখ-ধাম আর কোথাও নাই। আমার বোধ হয়, এ স্থানে বিশুদ্ধ-চিত্ত সচ্চরিত্র ব্যক্তিরাই আগমন করে, অপর লোকের এখানে আসিবার অধিকার নাই।" এই কথা শ্রবণমাত্র তিনি বিষণ্ণ-বদনে কহিলেন,—"তুমি যথার্থ বিবেচনা করিয়াছ; এ স্থান ধর্ম্মশীল সাধু ব্যক্তিদিগেরই যোগ্য বটে, এবং পূর্ব্বে ইহা তাদৃশই ছিল। তখন কেবল পরোপকারী, তত্ত্ব-পরায়ণ, পুণ্যাত্মা আচার্য্য সকলেই এই পরম পবিত্র কাননে উপবেশন করিয়া,

অতুল আনন্দ অনুভব করিতেন। কিন্তু এক্ষণে এ বনে নানা বিভীষিকা উপস্থিত হইয়াছে; পাপ-রূপ পিশাচের উপদ্রবে ইহা অতি সঙ্কট-স্থান হইয়া উঠিয়াছে। ঐ দেখ, বিজাতীয়-বেশধারী অভিমান স্বমস্তক উন্নত ও গ্রীবাদেশ বক্র করিয়া, অত্যন্ত উগ্রভাবে সকলের উপর খরতর দৃষ্টিপাত করিতেছে, ও স্বকীয় পুত্র দম্ভকে সমভিব্যাহারে লইয়া, মহাশ্লাঘা প্রকাশ-পূর্ব্বক সগর্ব্ব-পদবিক্ষেপ করিতেছে। উহাদের অঙ্গ-ভঙ্গী দেখিয়া কি তোমার বোধ হইতেছে না যে, উহারা মনে মনে বিশ্ব-সংসার তুচ্ছ ভাবিতেছে? তৎপার্শ্বে দৃষ্টি কর, ক্রোধ নিজ কান্তা হিংসাকে সঙ্গে লইয়া, ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে। উহা অভিমানের অত্যন্ত অনুগত। যদি কেহ অভিমানকে স্পর্শমাত্র করে, ক্রোধ তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইয়া, তাহার বৈর-নির্য্যাতন করিতে উদ্যত হয়। এ দিকে অবলোকন কর, একটা প্রকাণ্ড রাক্ষস দেখিতে দেখিতে আপনার শরীর বৃদ্ধি করিয়া ফেলিল। এক্ষণে ও যেরূপ স্থূলকায় হইয়া উঠিল, আমার বোধ হইতেছে, বিশ্ব-সংসার ভোজন করিলেও উহার উদর পূর্ণ হয় না। উহার নাম কি জান? লোভ। বিশেষতঃ কাব্য-তরুতলে যে দুই প্রচণ্ড পিশাচ দণ্ডায়মান দেখিতেছ, উহাদের অত্যাচারে এ স্থানের অতিশয় অপযশ ঘোষণা হইয়াছে; উহাদের নাম কাম ও পান-দোষ। এককালে এই অপূর্ব্ব আনন্দ-কাননে নিষ্কলঙ্ক দম্পতী-প্রেমেরই প্রাদুর্ভাব ছিল; তৎকালে অনেকানেক প্রধান ধর্ম্ম তাহার সহচর ছিল, এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। ঐ ঘন-পল্লবাবৃত নিবিড় বৃক্ষের অন্তরালে যে এক পরমা সুন্দরী রমণীকে দৃষ্টি করিতেছ, উহার পর কুৎসিত স্ত্রী আর দ্বিতীয় নাই। উহার

গাত্রে যে কত ব্রণ, কত ক্ষত ও কত কলঙ্ক আছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। কেবল কতকগুলি বেশভূষা-কল্পনা-দ্বারা তৎসমুদয় প্রচ্ছন্ন রাখিয়া আপনাকে সজ্জীভূত করিয়া দেখাইতেছে; উহার নাম কপটতা।”

সমুদয় শ্রবণ ও দর্শন করিয়া আমি বিষাদ-সমুদ্রে নিমগ্ন হইলাম, এবং মনে মনে চিন্তা করিলাম,—এ অসার সংসার স্বভাবতঃ শোক-দুঃখেই পরিপূর্ণ; যদিও দুই-একটি সুখময় পুণ্যধাম ছিল, তাহাতে এত বিঘ্ন ঘটিয়াছে! যাহা হউক, আপনার কর্ত্তব্য-সাধনে পরাঙ্মুখ হওয়া উচিত নহে, এই বিবেচনা করিয়া, সর্ব্বদুঃখ-নিবারিণী সন্তাপ-নাশিনী বিদ্যাদেবীর পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইয়া গমন করিতে লাগিলাম। কিয়দ্দূর গমনানন্তর একবার পশ্চাৎ অবলোকন করিয়া দেখি, যে সকল রাক্ষস-পিশাচের অহিত আচার দৃষ্টি করিয়া আসিলাম, তাহারাই আমার নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। পূর্ব্বে যাহাদিগের অতি কুৎসিত বীভৎস আকার দর্শন করিয়াছিলাম, এখন দেখি, তাহারা পরম মনোহর রূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছে। কি জানি, তাহারা কি কুমন্ত্রণা দেয়, এই আশঙ্কায় পরম-হিতৈষিণী বিদ্যাদেবীর সমীপবর্ত্তী হইয়া, সবিশেষ সমস্ত নিবেদন করিলাম। তৎক্ষণাৎ তিনি আমাকে অভয় দিয়া, ধৈর্য্য ও তিতিক্ষা নামে দুই মহাবল পরাক্রান্ত প্রহরীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—“তোমরা দুই জনে ইহার দুই পার্শ্বে থাক, কোন শত্রু যেন ইহার নিকটস্থ না হইতে পারে।”

এইরূপে আমরা বনপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া, সম্মুখে এক ক্ষুদ্র প্রান্তর দেখিতে পাইলাম। তখন বিদ্যা অতি প্রসন্নবদনে সুমধুর

হাস্য করিয়া কহিলেন,—"এই ক্ষুদ্র প্রান্তরের শেষে যে মনোহর গিরি দর্শন করিতেছ,—ঐ তোমার লক্ষিত স্থান; ঐ স্থান প্রাপ্ত হইলেই তুমি চরিতার্থ হইবে।" এই কথা শুনিয়া আমি পরম-পুলকিতচিত্তে অরণ্য হইতে নিক্রান্ত হইয়া, চিরাকাঙ্ক্ষিত ফল-প্রত্যাশায় মহোৎসাহ-সহকারে দ্রুতবেগে পদবিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলাম, এবং অবিলম্বে পর্ব্বত-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া, তথায় আরোহণ করিবার এক পথ প্রাপ্ত হইলাম। ঐ পথের এক পার্শ্বে এক দৃঢ়ব্রতা সুশীলা স্ত্রী এবং অন্য পার্শ্বে এক বহুপরিশ্রমী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পুরুষ দণ্ডায়মান আছেন; তাঁহারা যাত্রী-দিগকে সমভিব্যাহারে করিয়া, পর্ব্বতোপরি লইয়া যাইতেছেন। তাঁহাদিগকে পরিচয় জিজ্ঞাসিয়া জানিলাম, স্ত্রীর নাম শ্রদ্ধা, আর পুরুষের নাম যত্ন।

ঐ পর্ব্বত আরোহণ করা অতিশয় ক্লেশকর বোধ হইল। অতি কষ্টে কিছু দূরে গমন করিয়া, মনে মনে বিবেচনা করিলাম,—সম্প্রতি এই স্থানে অবস্থিতি করি। বিদ্যাদেবী স্বকীয়া মহীয়সী শক্তির দ্বারা তাহা জানিতে পারিয়া কহিলেন,—"হে প্রিয়তম! এ পর্ব্বতের পার্শ্ব-দেশে কোন স্থানে স্থির থাকিবার সম্ভাবনা নাই; যদি আর উপরে না উঠ, তবে অবশ্যই অধোগমন করিতে হইবে, অতএব সাবধান,—সাবধান।" আমি তাঁহার এই সদুপদেশ শুনিয়া, চৈতন্য প্রাপ্ত হইলাম। পরন্তু সুখের বিষয় এই যে, যতই আরোহণ করিতে লাগিলাম, ততই ক্লেশের লাঘব হইয়া সুখের বৃদ্ধি হইয়া আসিল।

অবশেষে যখন পর্ব্বতোপরি উত্তীর্ণ হইলাম, তখন কি অনির্ব্বচনীয় অনুপম সুখানুভবই হইল। তথাকার সুশীতল মারুত

হিল্লোলে শরীর পুলকিত হইতে লাগিল। তথায় দ্বেষ, হিংসা, বিবাদ, বিসংবাদ, চৌর্য্য, অত্যাচার—এ সকলের কিছুই নাই, কেবল আরোগ্য ও আনন্দ অবিরত বিরাজ করিতেছে। ইহা দেখিয়া, আমার অন্তঃকরণ অপার আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইল। বোধ হইল, বিশ্ব-সংসারে এমন রম্য স্থান আর দ্বিতীয় নাই। কিছুকাল ইতস্ততঃ ভ্রমণানন্তর দূর হইতে এক অপূর্ব্ব সরোবর দেখিতে পাইলাম, এবং তদ্দর্শনার্থে আমার অত্যন্ত কৌতুহল উপস্থিত হইল। ক্রমে ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখি, কতকগুলি পরমপবিত্র সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যা সরোবর-তটে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহাদিগের অসামান্য রূপ-লাবণ্য, প্রফুল্ল, পবিত্র মুখশ্রী এবং সারল্য ও বাৎসল্যস্বভাব অবলোকন করিয়া, অপরিমেয় প্রীতি লাভ করিলাম। আশ্চর্য্য এই যে, তাঁহাদিগের শরীরে কোন অলঙ্কার নাই, অথচ অনলঙ্কারই তাঁহাদের অলঙ্কার হইয়াছে। বোধ হইল যেন, আনন্দ-প্রতিমাগুলি ইতস্ততঃ ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে। আমি বিস্ময়াপন্ন হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলাম,—ইঁহারা দেবকন্যা হইবেন, তাহার সংশয় নাই। তখন বিদ্যাদেবী সাতিশয় অনুকম্পা-পুরঃসর ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন,—"তুমি যথার্থ অনুমান করিয়াছ; ইঁহারা দেবকন্যাই বটেন, এবং এই ধর্ম্মাচল ইঁহাদের বাসভূমি। ইঁহাদের কাহারও নাম দয়া, কাহারও নাম ভক্তি, কাহারও নাম ক্ষমা, কাহারও নাম অহিংসা, কাহারও নাম মৈত্রী, ইত্যাদি। সকলের নিজ নিজ গুণানুসারে নামকরণ হইয়াছে। ইঁহাদের রূপ ভুবনবিখ্যাত। ইঁহারা যে পর্য্যন্ত সুশীল, তাহা কি বলিব! বিদ্যারণ্য-যাত্রীদিগের মধ্যে যাঁহারা এই ধর্ম্মাচল আরোহণ করেন, তাঁহাদিগেরই প্রেম

সার্থক ও জন্ম সফল। তুমি এই সরোবরে স্নান করিয়া শরীর স্নিগ্ধ ও জীবন পবিত্র কর।"

বিদ্যাদেবীর উপদেশানুসারে আমি উল্লিখিত শান্তি-সরোবরে অবগাহন করিয়া, অভূতপূর্ব্ব অতি নির্ম্মল আনন্দনীরে নিমগ্ন হইতেছিলাম, ইতিমধ্যে নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখি—সেই সুন্দর মারুত-সেবিত যমুনা-কুলেই শায়িত রহিয়াছি।

কাজ করা

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

[১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ভূদেব মুখোপাধ্যায় কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ভূদেব প্রথমতঃ সংস্কৃত কলেজে ও পরে হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করেন। পাঠ-সমাপনান্তে ইনি গভর্নমেণ্ট স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত হন। কার্য্য-কুশলতা ও বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়া ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি অতিরিক্ত-বিদ্যালয়-পরিদর্শকের পদ প্রাপ্ত হন। ক্রমে ইনি অস্থায়ী ডিরেক্টারের পদেও উন্নীত হইয়াছিলেন। স্কুল-পরিদর্শকের কার্য্যে ইনি বঙ্গদেশে শিক্ষার যথেষ্ট উন্নতি-সাধন করিয়াছিলেন। ইনি ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে 'সি.আই.ই.' উপাধি পান এবং ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভার অন্যতম সভ্য নির্ব্বাচিত হন। সাহিত্য-ক্ষেত্রেও ইনি ইঁহার কৃতিত্বের প্রভূত নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। ইঁহার 'আচার-প্রবন্ধ,' 'পারিবারিক প্রবন্ধ,' 'সামাজিক প্রবন্ধ,' 'বিবিধ প্রবন্ধ' প্রভৃতি অতি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ইনি দীর্ঘকাল অতিশয় যোগ্যতার সহিত 'এডুকেশন গেজেটে'র সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। ইঁহার ন্যায় চিন্তাশীল সুলেখক বঙ্গসাহিত্যে বিরল। ভূদেব একজন নিষ্ঠাবান্ দানশীল হিন্দু ছিলেন। ইনি সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতিকল্পে আপনার উপার্জ্জিত অর্থ হইতে প্রায় দুই লক্ষ টাকা দিয়া গিয়াছেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই মে ইনি পরলোক গমন করেন।]

অনেক কালের কথা মনে হইল—আমার সমাধ্যায়ী কোন ব্যক্তি আমাকে বলিয়াছিলেন,—"ও হে! যদি সত্য সত্যই ভাল করিয়া ইংরাজি শিখিতে চাও, তবে, আমি যেমন করিয়াছি তেমনি কর—ইংরাজি পড়, ইংরাজি লেখ, ইংরাজিতে কথা কহ, ইংরাজিতে চিন্তা কর এবং ইংরাজিতে স্বপ্ন দেখিতেও শিখ।"

যিনি এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন তিনি, আমরা যে শ্রেণীতে পড়িতাম, তাহার মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন। আমি ইংরাজি বহি পড়িতাম এবং ইংরাজিতেই পত্রাদি লিখিতাম বটে, কিন্তু ইংরাজ ভিন্ন অপর কাহার' সহিত ইংরাজিতে কথা কহিতাম না। আর ইংরাজিতে চিন্তা করিবার নিমিত্ত ত কখনই চেষ্টা করি নাই—প্রত্যুত যদি চিন্তাকালীন ইংরাজির প্রভাবে কোন ভাব রূপান্তরিত হইতেছে জানিতে পারিতাম, তৎক্ষণাৎ নিজ মাতৃভাষায় সেই ভাবগুলির পুনরালোচনা করিয়া বুঝিতাম, ভাবগুলি যথাযথ কি না এইরূপ করায় ইংরাজিতে চিন্তা করা এবং ইংরাজিতে স্বপ্ন দেখা আমার ভাগ্যে কখনই ঘটে নাই।

কিন্তু আমাকে অনেক কাজকর্ম্ম ইংরাজিতেই করিতে হইয়াছে। পক্ষান্তরে, ইংরাজিতে চিন্তন অভ্যাস না করায়, ইংরাজি লেখায় আমার বড়ই কষ্টানুভব হইত, এবং যাহা ইংরাজিতে লিখিলাম, তাহা বিশুদ্ধ হইল কি না, তাহাতে অনর্থক শব্দবিন্যাস রহিল কি না, কোন কথা যেরূপে লিখিলাম সেই কথা তদপেক্ষা সংক্ষেপে এবং বিশদরূপে লেখা যায় কি না, এই সকল বিষয় পুনঃপুনঃ বিচার করিয়া দেখিতে হইত—সুতরাং ইংরাজি লেখা আমার তেমন শীঘ্র হইয়া উঠিত না। অন্যে এমন কি আমা হইতে যাহারা অল্প ইংরাজি জানেন তাঁহারাও যত শীঘ্র ইংরাজি লিখিয়া যাইতে পারেন, আমি কখনই তাহা পারি নাই। ইংরাজি লিখিতে আমার বিলম্ব হয়, এবং কাগজে অনেক কাট্‌কুট হয়।

কিন্তু আমাকে অনেক কাজকর্ম্মই ইংরাজিতে করিতে হইয়াছে, অনেক বড় বড় চিঠি এবং রিপোর্ট ইংরাজিতে লিখিতে হইয়াছে, প্রতি দিন গড়ে ৫০।৬০ খানি পত্রের জবাব ইংরাজিতে দিতে

হইয়াছে, এবং অনেক স্থলেই অন্তের লিখিত ইংরাজির দোষ সংশোধন করিয়া লইতে হইয়াছে। কিন্তু আমি শীঘ্র শীঘ্র ইংরাজি লিখিতে পারি না। ইংরাজিতে চিন্তা করিবার অনভ্যাসরূপ মহৎ অন্তরায় সত্ত্বেও যেরূপে ঐ সকল কাজ সম্পন্ন করিতে পারিয়াছিলাম এবং ঐ সকল কাজ ভাল করিয়াছি বলিয়া প্রশংসা লাভও করিয়াছিলাম, তাহাই বলিতেছি।

কিন্তু সে কথা বলিবার পূর্ব্বে অপর একটী কথা বলিয়া রাখি। আমার আত্মীয় বন্ধু বান্ধব—যিনি যখন আমার সহিত দেখা করিতে আসিতেন, যতই কেন কাজ হাতে থাকুক না, আমি নিরুদ্বিগ্নচিত্তে তাঁহাদের সহিত বসিয়া বাক্যালাপ করিতাম। অনেক কাজ পড়িয়া আছে বলিয়া তাঁহাদের কথাবার্ত্তায় অন্যমনস্কতা বা চাঞ্চল্য প্রদর্শন করিতাম না। তাঁহাদের কাহাকেও পাইলে কাজকর্ম্ম একেবারে ভুলিয়া গিয়া আলাপ করিতাম। তাঁহারা জানিতেন, এত কাজ থাকিতেও যে ওরূপে সময়াতিপাত করিতে পারি তাহার কারণ কার্য্যে লঘুহস্ততা।

ফলকথা, তাহা নহে। আদৌ কোন বিষয়েই আমার ক্ষিপ্রকারিতা গুণ নাই। ক্রমে বহুকালের অভ্যাসবশতঃ কোন কোন বিষয়ে একটু লঘুহস্ততা জন্মিয়াছে বটে—কিন্তু সে সামান্য বিষয়ে এবং অতি সামান্য মাত্রায়, ইংরাজি লেখায় কিছুমাত্র নহে।

তবে ইংরাজিতে এত কাজ কেমন করিয়া করিতাম? কাজে অনেক সময় দিতাম। এত সময় কোথা হইতে পাইতাম? এক্ষণে তাহাই বলিতেছি।

কিন্তু সে কথাও বলিবার পূর্ব্বে আর কয়েকটী কথা বলিয়া রাখি। আমি কাজকর্ম্মে বিশেষ আনন্দলাভ করিতাম। আমি

কখনই মনে করিতাম না যে, পরের কাজ করিতেছি। যাহা করিতেছি, তাহা আপনারই কাজ। কৈফিয়ৎ দিতে হইলে পাছে পরের কাজ বোধ হইয়া যায় এবং আনন্দের ত্রুটি হয়, এই জন্য যাহাতে কৈফিয়ৎ দিতে না হয়, এমন করিয়াই কাজ করিতাম। ইংরাজ মনিবের কাছে কাজ করিয়া মনের এই ভাব রক্ষা করা বড়ই কঠিন। উহারা প্রায়ই দেশীয় লোকের মনের তাদৃশ ভাব রক্ষা করিতে দেন না। এতই মনিবানা ফলান যে, কাজটা তাঁহাদিগের, আমরা তাঁহাদিগেরই অনুজ্ঞাপালক চাকর মাত্র, এই ভাবটী ক্রমে ক্রমে দাঁড়াইয়া যায়। কিন্তু পূর্ব্ব হইতে ঐ বিষয়ে সাবধান হইতে পারিয়াছিলাম বলিয়াই হউক, অথবা শুভাদৃষ্ট-বশতঃই হউক, আমি কখন ঐরূপ দুর্ভাগ্যে পড়ি নাই। আমার কাজ চিরকালই আমার নিজের কাজ এবং স্বদেশের কাজ ছিল।

আর একটী কথা এই। বাল্যাবধি আমার সংস্কার যে, ভোগে প্রকৃত সুখ নাই, কর্ম্ম সম্পাদন করাতেই সুখ। কেমন করিয়া এই সংস্কার হইয়াছিল, তাহা ঠিক বলিতে পারি না। তবে এই মাত্র মনে পড়ে, পিতৃঠাকুর আমার পঠদ্দশায় সর্ব্বদা বলিতেন, "ছাত্রাণামধ্যয়নং তপঃ," আর আমার বয়ঃপ্রাপ্তির পর, দীক্ষা গ্রহণ হইলে প্রতি প্রত্যুষে অন্ততঃ একবার করিয়া বলিতাম "যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্"—আমার দৃঢ় বিশ্বাসও তাই, একাগ্রচিত্তে কার্য্যসম্পাদনের নিমিত্ত পরিশ্রম করাই প্রকৃত পূজা। এখন কাজ করিবার নিমিত্ত আমার সময়-সংগ্রহ কিরূপে হইত তাহা বলি।

(১) আমি দ্রব্যাদি সমস্ত এবং কাগজপত্রাদি বেশ গুছাইয়া রাখিতে জানি—কাগজটী, কলমটী, কালির দোয়াতটী এবং যে

সকল পত্রের উত্তর লিখিতে হইবে সেগুলি যথাস্থানেই থাকে—ওগুলি খুঁজিয়া বেড়াইতে আমার সময়.যায় না।

(২) আমি ইংরাজি পুস্তকাদিতে যাহা যাহা পড়িতাম, মনে মনে তাহা মাতৃভাষায় অনুবাদ না করিয়া ছাড়িতাম না। সুতরাং কোন্ বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত করা বিধেয়, তাহা অনেকটা স্থির থাকিত। অভিমতি স্থির করিবার নিমিত্ত আমার অল্প সময়ই যাইত। কয়েকখানি পুস্তক ভিন্ন, ইংরাজি বইগুলিতে এত শব্দের আধিক্য এবং পৌনরুক্তির বাহুল্য যে, মাতৃভাষায় তাহাদিগের মানসিক অনুবাদ করা নিতান্ত আবশ্যক। এইরূপে একবার ঝাড়িয়া না লইলে তুঁষের ভাগ অধিক এবং তণ্ডুলের ভাগ নিতান্ত অল্প হইয়া থাকে। ফলতঃ মাতৃভাষায় অনুবাদরূপ সূর্প-দ্বারা ইংরাজি গ্রন্থগুলিকে ঝাড়িয়া লইবার পরামর্শ আমি সকল ইংরাজি পাঠককেই দিতেছি।

(৩) আমি কখনই ইংরাজির শব্দবিন্যাস-পারিপাট্য, লিখিবার জন্ত ভাল ভাল ইংরাজি শব্দ বা ইংরাজি গৎ অভ্যাস করি নাই। ইহাতে উপকার কি অনুপকার হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। তবে ইংরাজি শব্দ-বিন্যাসের উপর কিছুমাত্র নেশা না থাকায়, কাজের সময়, অর্থাৎ পত্রাদি লিখিবার সময়, শব্দ খুঁজিতে আমার অল্প সময় যাইত, এ কথা বলিতে পারি।

উপরের (২) এবং (৩) চিহ্নিত কথাগুলির দ্বারা আমার বক্তব্য এই যে, কোন্ বিষয়ে কি বলিতে বা করিতে হইবে, তাহা নিশ্চয় করিয়া লওয়ার পক্ষে অভ্যস্ত ইংরাজি শব্দ এবং ইংরাজি গৎ রূপ যে বিষম অন্তরায় আছে আমার সে অন্তরায় ছিল না, এবং সেই জন্ত আমার বক্তব্য বিষয় স্থির করিতে অল্প সময়ই যাইত। কেমন করিয়া তাহা প্রকাশ করিব—ইহা লইয়াই যত কষ্ট এবং যত

মারামারি। সেই মারামারি করিবার সময়, অনেকটা নিদ্রা হইতে, কতকটা ভোজন হইতে এবং এক-আধটুকু পরিজনদিগের সহিত আলাপের কাল হইতে, অবকাশ সংগ্রহ করিতাম। তদ্ভিন্ন, আমাকে ত ঘরের কোন খুটিনাটি লইয়া বিব্রত হইতে হইত না, সে জন্যও অনেকটা সময় পাইতাম। এইরূপে সময়ের সংগ্রহ করিয়া ধীরে সুস্থে বসিয়া আস্তে আস্তে ইংরাজি লিখিতাম—কি লিখিতাম তাহা মনে মনে আর এক জন হইয়া, প্রায়ই নিজের প্রতিপক্ষ হইয়া, পড়িতাম। সেই কল্পিত প্রতিপক্ষের চক্ষু দিয়া ভুল ধরিতাম—আপনার চক্ষু দিয়া ভুল শোধরাইতাম—যথেষ্ট কাটকুট হইত—কোন কোন পত্রাদি ফিরাইয়া ফিরাইয়া দুই তিন বার করিয়া লিখিতে হইত।

একবার কোন সুদূর স্থানে গিয়াছিলাম। বাটীতে আসিয়া দেখিলাম, অনেকগুলি কাগজপত্র জমা হইয়া আছে। অমনি কাগজগুলি লইয়া বসিলাম। পড়িতে পড়িতে যেগুলির জবাব তদ্দণ্ডে দেওয়া যাইতে পারে বোধ হইল, সেগুলির একটা স্বতন্ত্র তাড়া করিলাম, যেগুলির উত্তর বিশেষ ভাবিয়া অথবা অন্য কাগজ-পত্র দেখিয়া দিতে হইবে বোধ হইল, তাহা দ্বিতীয় তাড়াবন্দি করিলাম। প্রথমগুলির উত্তর লিখিলাম। যতক্ষণ সে কাজটী শেষ না হইল, ততক্ষণ উঠিলাম না।

"অনেক বেলা হইয়াছে—খাওয়া-দাওয়ার পর কাগজপত্র লইয়া বসিলেই ভাল হয়।"

"তা ত হয়, কিন্তু ঐ কাগজের মোট বিদায় না হইলে ত খাইতে বসিয়া কোন সুখ হইবে না।"—বাটীর ভিতরে এরূপ কথোপকথন প্রায়ই শুনিতে পাইতাম।

"আজি বিকালে অমুকের আসিবার সম্ভাবনা আছে; কতকটা কাজ বাকি রহিয়াছে, না সারিয়া রাখিলে কথোপকথনের সুখোপভোগ হইবে না; তোমারও যদি কোন কাজ বাকি থাকে, তাহা এই সময়ে সারিয়া লও।" * * "রাত দুপুরে ব'সে ও কি হচ্চে?—খাওয়া নাই, ঘুম নাই—অসুখ করিবে।"

"না, অসুখ হইবে না, আমি ত একবার ঘুমাইয়াছিলাম। আর এইটা না লিখিলেই নয়—কালি না পাঠাইতে পারিলে—"

"কি হইবে?"

"একটু বাহাদুরির ত্রুটি।"

"হউক গে।"

সে রাত্রিতে কিছুই লেখা হইল না সত্য, কিন্তু অন্যান্য রাত্রিতে হইত।

পালামৌ

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ এবং যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে চব্বিশ-পরগনার কাঁটালপাড়া গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি 'বেঙ্গল রায়তস্' নামক পুস্তক লিখিয়া বঙ্গদেশের তৎকালীন লেফটেনাণ্ট গভর্ণরের প্রীতি লাভ করেন এবং তাহার ফলে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হন, কিন্তু কোন বিশেষ কারণে ইঁহাকে ঐ চাকরি ত্যাগ করিতে হয়। তৎপরে ইনি অনেক দিন স্পেশাল সব্-রেজিষ্ট্রার ছিলেন ; উপরিতন কর্ম্মচারীর সঙ্গে মতদ্বৈধ হওয়াতে ইনি চাকরি ছাড়িয়া দেন। সঞ্জীবচন্দ্র অতি সুলেখক ছিলেন। ইঁহার রচিত 'পালামৌ,' 'জাল প্রতাপচাঁদ' প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ আদরলাভ করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের পরে কয়েক বৎসর ইনি 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদন করিয়াছিলেন। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।]

১

অনেক দিনের কথা লিখিতে বসিয়াছি, সকল স্মরণ হয় না। পূর্ব্বে লিখিলে যাহা লিখিতাম, এক্ষণে যে তাহাই লিখিতেছি, এমন নহে। পূর্ব্বে সেই সকল নির্জ্জন পর্ব্বত, কুসুমিত কানন প্রভৃতি যে চক্ষুতে দেখিয়াছিলাম, সে চক্ষু আর নাই। এখন পর্ব্বত কেবল প্রস্তরময়, বন কেবল কণ্টকাকীর্ণ, অধিবাসীরা কেবল কদাচারী বলিয়া স্মরণ হয়। অতএব যাঁহারা বয়োগুণে

কেবল শোভা-সৌন্দর্য্য প্রভৃতি ভালবাসেন, বৃদ্ধের লেখায় তাঁহাদের কোন প্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত হইবে না।

যখন আমার পালামৌ যাওয়া একান্ত স্থির হইল, তখন জানি না যে, সে স্থান কোন্ দিকে, কত দূর; অতএব ম্যাপ দেখিয়া পথ স্থির করিলাম। হাজারিবাগ হইয়া যাইতে হইবে, এই বিবেচনায় ডাক-গাড়ী ভাড়া করিয়া রাত্রি দেড় প্রহরের সময় রাণীগঞ্জ হইতে যাত্রা করিলাম। প্রাতে বরাকর নদীর পূর্ব্বপারে গাড়ী থামিল। নদী অতি ক্ষুদ্র, তৎকালে অল্পমাত্র জল ছিল, সকলেই হাঁটিয়া পার হইতেছে, আমার গাড়ী ঠেলিয়া পার করিতে হইবে, অতএব গাড়ওয়ান কুলি ডাকিতে গেল।

পূর্ব্বপার হইতে দেখিলাম যে, অপর পারে ঘাটের উপরেই একজন সাহেব বাঙ্গালায় বসিয়া পাইপ টানিতেছেন, সম্মুখে একজন চাপরাসী একরূপ গৈরিক মৃত্তিকাহস্তে দাঁড়াইয়া আছে। যে ব্যক্তি পারার্থ সেই ঘাটে আসিতেছে, চাপরাসী তাহার বাহুতে সেই মৃত্তিকা-দ্বারা কি অঙ্কপাত করিতেছে। পারার্থীর মধ্যে বন্য লোকই অধিক, তাহারা মৃত্তিকারঞ্জিত আপন আপন বাহুর প্রতি আড়নয়নে চাহিতেছে আর হাসিতেছে, আবার অন্যের অঙ্গে সেই অঙ্কপাত কিরূপ দেখাইতেছে তাহাও এক এক বার দেখিতেছে, শেষে হাসিতে হাসিতে দৌড়াইয়া নদীতে নামিতেছে। তাহাদের ছুটাছুটিতে নদীর জল উচ্ছ্বসিত হইয়া কূলের উপরে উঠিতেছে।

আমি অন্যমনস্কে এই রঙ্গ দেখিতেছি, এমন সময় কুলিদের কতকগুলি বালক-বালিকা আসিয়া আমার গাড়ী ঘেরিল, এবং "সাহেব একটি পয়সা," "সাহেব একটি পয়সা," এই বলিয়া

চীৎকার করিতে লাগিল। ধুতি-চাদর পরিয়া আমি নিরীহ বাঙ্গালী বসিয়া আছি, আমায় কেন সাহেব বলিতেছে, তাহা জানিবার নিমিত্ত বলিলাম, "আমি সাহেব নহি।" একটি বালিকা আপন ক্ষুদ্র নাসিকাস্থ অঙ্গুরিবৎ অলঙ্কারের মধ্যে নখ নিমজ্জন করিয়া বলিল, "হাঁ, তুমি সাহেব।" আর একজন জিজ্ঞাসা করিল, "তবে তুমি কি?" আমি বলিলাম, "আমি বাঙ্গালী।" সে বিশ্বাস করিল না, বলিল, "না, তুমি সাহেব।" তাহারা মনে করিয়া থাকিবে যে, যে গাড়ী চড়ে সে অবশ্য সাহেব।

বরাকর হইতে দুই-একটি ক্ষুদ্র পাহাড় দেখা যায়। বঙ্গবাসীদের কেবল মাঠ দেখা অভ্যাস, মৃত্তিকার সামান্য স্তূপ দেখিলেই তাহাদের আনন্দ হয়, অতএব সেই ক্ষুদ্র পাহাড়গুলি দেখিয়া যে তৎকালে আমার যথেষ্ট আনন্দ হইবে, ইহা আর আশ্চর্য্য কি? বাল্যকালে পাহাড়-পর্ব্বতের পরিচয় অনেক শুনা ছিল, বিশেষতঃ একবার এক বৈরাগীর আখড়ায় চূণকাম-করা এক গিরিগোবর্দ্ধন দেখিয়া পাহাড়ের আকার অনুভব করিয়া লইয়াছিলাম। বরাকরের নিকটস্থ পাহাড়গুলি দেখিয়া আমার সে বাল্যসংস্কারের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হইল।

অপরাহ্ণে দেখিলাম, একটি সুন্দর পর্ব্বতের নিকট দিয়া গাড়ী যাইতেছে। এত নিকট দিয়া যাইতেছে যে, পর্ব্বতস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরের ছায়া পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে। গাড়ওয়ানকে গাড়ী থামাইতে বলিয়া আমি নামিলাম। গাড়ওয়ান জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা যাইবেন?" আমি বলিলাম, "একবার এই পর্ব্বতে যাইব।" সে হাসিয়া বলিল, "পাহাড় এখান হইতে অনেক দূর, আপনি সন্ধ্যার মধ্যে তথায় পৌঁছিতে পারিবেন না।" আমি এ

কথা কোনরূপে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না; আমি স্পষ্ট দেখিতেছিলাম, পাহাড় অতি নিকট, তথায় যাইতে আমার পাঁচ মিনিটও লাগিবে না, অতএব গাড়ওয়ানের নিষেধ না শুনিয়া আমি পর্ব্বতাভিমুখে চলিলাম। পাঁচ মিনিটের স্থানে পনর মিনিট কাল দ্রুতপাদবিক্ষেপে গেলাম, তথাপি পর্ব্বত পূর্ব্বমত সেই পাঁচ মিনিটের পথ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তখন আমার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া গাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম পর্ব্বত-সম্বন্ধে দূরতা স্থির করা বাঙ্গালীর পক্ষে বড় কঠিন। ইহার প্রমাণ পালামৌ গিয়া আমি পুনঃপুনঃ পাইয়াছিলাম।

পর দিবস প্রায় দুই প্রহরের সময় হাজারিবাগে পৌঁছিলাম। তথায় গিয়া শুনিলাম, কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাটীতে আমার আহারের আয়োজন হইতেছে। প্রায় দুই দিবস আহার হয় নাই, অতএব আহার-সম্বন্ধীয় কথা শুনিবামাত্র ক্ষুধা অধিকতর প্রদীপ্ত হইল। যিনি আমার নিমিত্ত উদ্যোগ করিতেছেন, তিনি আমার আগমনবার্ত্তা কিরূপে জানিলেন, তাহা অনুসন্ধান করিবার আর অবকাশ হইল না, আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাটীতে গাড়ী লইয়া যাইতে অনুমতি করিলাম। যাঁহার বাটীতে যাইতেছি, তাঁহার সহিত আমার কখনও চাক্ষুষ পরিচয় হয় নাই; তাঁহার নাম শুনিয়াছি, সুখ্যাতিও যথেষ্ট শুনিয়াছি, সজ্জন বলিয়া তাঁহার প্রশংসা সকলেই করে। কিন্তু সে প্রশংসায় কর্ণপাত বড় করি নাই, কেন-না, বঙ্গবাসিমাত্রই সজ্জন; বঙ্গে কেবল প্রতিবাসীরাই দুরাত্মা; যাহা নিন্দা শুনা যায়, তাহা কেবল প্রতিবাসীর। প্রতিবাসীরা পরশ্রীকাতর, দাম্ভিক, কলহপ্রিয়, লোভী, কৃপণ ও বঞ্চক। তাহারা আপনাদের সন্তানকে ভাল কাপড়, ভাল জুতা পরায়,—

কেবল আমাদের সন্তানকে কাঁদাইবার জন্য। তাহারা আপনাদের পুত্রবধূকে উত্তম বস্ত্রালঙ্কার দেয়,—কেবল আমাদের পুত্রবধূর মুখ ভার করাইবার নিমিত্ত। পাপিষ্ঠ প্রতিবাসীরা! যাঁহাদের প্রতিবাসী নাই, তাঁহাদের ক্রোধ নাই। তাঁহাদেরই নাম ঋষি। ঋষি কেবল প্রতিবাসিত্যাগী গৃহী। ঋষির আশ্রমপার্শে প্রতিবাসী বসাও, তিন দিনের মধ্যে ঋষির ঋষিত্ব যাইবে। প্রথম দিনে প্রতিবাসীর ছাগলে পুষ্পবৃক্ষ নিষ্পত্র করিবে, দ্বিতীয় দিনে প্রতিবাসীর গরু আসিয়া কমণ্ডলু ভাঙ্গিবে, তৃতীয় দিনে প্রতিবাসীর গৃহিণী আসিয়া ঋষিপত্নীকে আপনার অলঙ্কার দেখাইবে। তাহার পরই ঋষিকে ওকালতীর পরীক্ষা দিতে হইবে, নতুবা ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটীর দরখাস্ত করিতে হইবে।

এক্ষণে সে সকল কথা যাক। যে বঙ্গবাসীর গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিতে যাইতেছিলাম, তাঁহার উদ্যানে গাড়ী প্রবেশ করিলে, তাহা কোন ধনবান্ ইংরাজের হইবে বলিয়া আমার প্রথমে ভ্রম হইল। পরক্ষণেই সে ভ্রম গেল। বারান্দায় গুটিকত বাঙ্গালী বসিয়া আমার গাড়ী নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, তাঁহাদের নিকটে গিয়া গাড়ী থামিলে, আমি গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম। আমাকে দেখিয়া তাঁহারা সকলেই সাদরে অগ্রসর হইলেন; না চিনিয়া যাঁহার অভিবাদন সর্ব্বাগ্রে গ্রহণ করিয়াছিলাম, তিনিই বাটীর কর্ত্তা। তিনি ভদ্রলোক-সমভিব্যাহারে থাকিলেও আমার দৃষ্টি বোধ হয় প্রথমেই তাঁহার মুখের প্রতি পড়িত। সেরূপ প্রসন্নতাব্যঞ্জক ওষ্ঠ আমি অতি অল্প দেখিয়াছি। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম বোধ হয় পঞ্চাশ অতীত হইয়াছিল, বৃদ্ধের তালিকায় তাঁহার নাম উঠিয়াছিল, তথাপি তাঁহাকে বড়

সুন্দর দেখিয়াছিলাম। বোধ হয়, সেই প্রথম আমি বৃদ্ধকে সুন্দর দেখি।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, আমি তখন নিজে যুবা; অতএব সে বয়সে বৃদ্ধকে সুন্দর দেখা ধর্ম্মসঙ্গত নহে। কিন্তু সে দিবস এরূপ ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য ঘটিয়াছিল। এক্ষণে আমি নিজে বৃদ্ধ, কাজেই অধিকাংশ বৃদ্ধকেই সুন্দর দেখি। কোন মহানুভব ব্যক্তি বলিয়াছিলেন যে, মনুষ্য বৃদ্ধ না হইলে সুন্দর হয় না, এক্ষণে আমি তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করি।

২

রাঁচি হইতে পালামৌ যাইতে যাইতে যখন বাহকগণের নির্দ্দেশমত দূর হইতে পালামৌ দেখিতে পাইলাম, তখন আমার বোধ হইল যেন, মর্ত্ত্যে মেঘ করিয়াছে। আমি অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া সেই মনোহর দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। ঐ অন্ধকার মেঘমধ্যে এখনই যাইব, এই মনে করিয়া আমার কতই আহ্লাদ হইতে লাগিল। কতক্ষণে পৌঁছিব মনে করিয়া আবার কতই ব্যস্ত হইলাম। পরে চারি-পাঁচ ক্রোশ অগ্রসর হইয়া আবার পালামৌ দেখিবার নিমিত্ত পাল্কী হইতে অবতরণ করিলাম। তখন আর মেঘভ্রম হইল না, পাহাড়গুলি স্পষ্ট চেনা যাইতে লাগিল; কিন্তু জঙ্গল ভাল চেনা গেল না। তারপর আরও দুই-এক ক্রোশ অগ্রসর হইলে তাম্রাভ অরণ্য চারিদিকে দেখা যাইতে লাগিল; কি পাহাড়, কি তলস্থ স্থান, সমুদয় যেন মেঘদেহের ন্যায় কুঞ্চিত লোমরাজি-দ্বারা সর্ব্বত্র সমাচ্ছাদিত বোধ হইতে লাগিল। শেষে আরও কতদূর গেলে বন স্পষ্ট দেখা গেল।

পাহাড়ের গায়ে, নিম্নে, সর্ব্বত্র জঙ্গল, কোথাও আর ছেদ নাই। কোথাও কর্ষিত ক্ষেত্র নাই, গ্রাম নাই, নদী নাই, পথ নাই, কেবল বন—ঘন নিবিড় বন।

পরে পালামৌ প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, নদী, গ্রাম সকলই আছে, দূর হইতে তাহা কিছুই দেখা যায় নাই। পালামৌ পরগনায় পাহাড় অসংখ্য, পাহাড়ের পর পাহাড়, তাহার পর পাহাড়, আবার পাহাড়, যেন বিচলিত নদীর সংখ্যাতীত তরঙ্গ। আবার বোধ হয় যেন, অবনীর অন্তরাগ্নি একদিনেই সেই তরঙ্গ তুলিয়াছিল। এখন আমার ঠিক স্মরণ হয় না, কিন্তু বোধ হয় যেন দেখিয়াছিলাম সকল তরঙ্গই পূর্ব্বদিক্ হইতে উঠিয়াছিল। এইরূপ পাহাড় লাতেহার-গ্রামপার্শ্বে একটি আছে, আমি প্রায় নিত্য তথায় গিয়া বসিয়া থাকিতাম। এই পাহাড়ের পশ্চিমভাগে মৃত্তিকা নাই, সুতরাং তাহার অন্তরস্থ সকল স্তর দেখা যায়; এক স্তরে নুড়ি আর এক স্তরে কাল পাথর ইত্যাদি। কিন্তু কোন স্তরই সমসূত্র নহে, প্রত্যেকটি কোথাও উঠিয়াছে, কোথাও নামিয়াছে। আমি তাহা পূর্ব্বে লক্ষ্য করি নাই, লক্ষ্য করিবার কারণ পরে ঘটিয়াছিল। একদিন অপরাহ্ণে এই পাহাড়ের মূলে দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময়ে আমার একটা "নেমোকহারাম" ফরাসিস্ কুক্কুর আপন ইচ্ছামত তাঁবুতে চলিয়া গেল, আমি ক্রোধে চীৎকার করিয়া তাহাকে ডাকিলাম। আমার পশ্চাতে সেই চীৎকার অত্যাশ্চর্য্যরূপে প্রতিধ্বনিত হইল। পশ্চাৎ ফিরিয়া পাহাড়ের প্রতি চাহিয়া আবার চীৎকার করিলাম, প্রতিধ্বনি আবার পূর্ব্বমত হ্রস্ব-দীর্ঘ হইতে হইতে পাহাড়ের অপর প্রান্তে চলিয়া গেল; আবার চীৎকার করিলাম, শব্দ পূর্ব্ববৎ পাহাড়ের গায়ে

লাগিয়া উচ্চ-নীচ হইতে লাগিল। এইবার বুঝিলাম, শব্দ কোন একটি বিশেষ স্তর অবলম্বন করিয়া যায়, সেই স্তর যেখানে উঠিয়াছে বা নামিয়াছে, শব্দও সেইখানে উঠিতে-নামিতে থাকে। কিন্তু শব্দ দীর্ঘকাল কেন স্থায়ী হয়, যতদূর পর্য্যন্ত সেই স্তরটি আছে, ততদূর পর্য্যন্ত কেন যায়, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

আর একটি পাহাড় দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলাম, সেটি একশিলা, সমুদয়ে একখানি প্রস্তর। তাহাতে একেবারে কোথাও কণামাত্র মৃত্তিকা নাই, সমুদয় পরিষ্কার ঝর্ ঝর্ করিতেছে। তাহার এক স্থান অনেক দূর পর্য্যন্ত ফাটিয়া গিয়াছে, সেই ফাটার উপর এক অশ্বথ গাছ জন্মিয়াছে। তখন মনে হইতেছিল, অশ্বথ বৃক্ষ বড় রসিক, এই নীরস পাষাণ হইতেও রস গ্রহণ করিতেছে। কিছুকাল পরে আর একদিন এই অশ্বথ গাছ আমার মনে পড়িয়াছিল; তখন ভাবিয়াছিলাম, বৃক্ষটি বড় শোষক, ইহার নিকট নীরস পাষাণেরও নিস্তার নাই।

এক্ষণে সে সকল কথা যাউক, প্রথম দিনের কথা দুই-একটি বলি। অপরাহ্নে পালামৌয়ে প্রবেশ করিয়া উভয় পার্শ্বস্থ পর্ব্বত-শ্রেণী দেখিতে দেখিতে বনমধ্য দিয়া যাইতে লাগিলাম। বাঁধা পথ নাই, কেবল এক সঙ্কীর্ণ গো-পথ দিয়া আমার পাল্কী চলিতে লাগিল; অনেক স্থলে উভয় পার্শ্বস্থ লতা-পল্লব পাল্কী স্পর্শ করিতে লাগিল। বন-বর্ণনায় যেরূপ "শাল-তাল-তমাল-হিন্তাল" শুনিয়াছিলাম, সেরূপ কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তাল, হিন্তাল একেবারেই নাই, কেবল শালবন, অন্য বন্য গাছও আছে। শালের মধ্যে প্রকাণ্ড গাছ একটিও নাই, সকলগুলিই আমাদের দেশী কদম্ব বৃক্ষের মত, না হয় কিছু বড়, কিন্তু তাহা হইলেও

জঙ্গল অতি দুর্গম, কোথাও তাহার ছেদ নাই, এই জন্ত ভয়ানক। মধ্যে মধ্যে যে ছেদ আছে, তাহা অতি সামান্ত।

এই অঞ্চলে প্রধানতঃ কোলের বাস। কোলেরা বন্ত জাতি; খর্ব্বাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ,—দেখিতে কুৎসিত কি রূপবান্, তাহা আমি মীমাংসা করিতে পারি না। যে সকল কোল কলিকাতায় আইসে বা চা-বাগানে যায়, তাহাদের মধ্যে আমি কাহাকেও রূপবান্ দেখি নাই, বরং অতি কুৎসিত বলিয়া বোধ করিয়াছি। কিন্তু স্বদেশে কোলমাত্রই রূপবান্, অন্ততঃ আমার চোখে। বন্তেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।

৩

নিত্য অপরাহ্ণে আমি লাতেহার পাহাড়ের ক্রোড়ে গিয়া বসিতাম; তাঁবুতে শত কার্য্য থাকিলেও আমি তাহা ফেলিয়া যাইতাম। চারিটা বাজিলেই আমি অস্থির হইতাম; কেন, তাহা কখনও ভাবিতাম না; পাহাড়ের কিছুই নূতন নাই; কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইবে না, কোন গল্প হইবে না, তথাপি কেন আমার সেখানে যাইতে হইত, জানি না। এখন দেখি এ বেগ আমার একার নহে; যে সময় উঠানে ছায়া পড়ে, নিত্য সে সময় কুলবধুর মন মাতিয়া উঠে, জল আনিতে যাইবে; জল আছে বলিলেও তাহারা জল ফেলিয়া জল আনিতে যাইবে। জলে যে যাইতে পারিল না, সে অভাগিনী; সে গৃহে বসিয়া দেখে, উঠানে ছায়া পড়িতেছে, আকাশে ছায়া পড়িতেছে, পৃথিবীর রং ফিরিতেছে; বাহির হইয়া সে দেখিতে পাইল না,—তাহার কত দুঃখ। বোধ হয়, আমিও পৃথিবীর রং-ফেরা দেখিতে যাইতাম! কিন্তু আর

একটু আছে, সেই নির্জ্জন স্থানে মনকে একা পাইতাম, বালকের ন্যায় মনের সহিত ক্রীড়া করিতাম।

যেরূপ নিত্য লাতেহার পাহাড়ে যাইতাম, সেইরূপ আর একদিন যাইতেছিলাম, পথে দেখি, একটি যুবা বীরদর্পে পাহাড়ের দিকে যাইতেছে, পশ্চাতে কতকগুলি স্ত্রীলোক তাহাকে সাধিতে সাধিতে সঙ্গে যাইতেছে। আমি ভাবিলাম, যখন স্ত্রীলোক সাধিতেছে, তখন যুবার রাগ নিশ্চিত ভাতের উপর হইয়াছে; আমি বাঙ্গালী, সুতরাং এ ভিন্ন আর কি অনুভব করিব? এক কালে এইরূপ রাগ নিজেও কতবার করিয়াছি, তাই অন্যের বীরদর্প বুঝিতে পারি।

আমি যখন নিকটবর্ত্তী হইলাম, তখন স্ত্রীলোকেরা নিরস্ত হইয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইল। বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করায় যুবা সদর্পে বলিল, "আমি বাঘ মারিতে যাইতেছি, এইমাত্র আমার গরুকে বাঘে মারিয়াছে; আমি ব্রাহ্মণ-সন্তান, সে বাঘ না মারিয়া কোন্ মুখে আর জলগ্রহণ করিব?" আমি কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম, "চল, তোমার সঙ্গে যাইতেছি।" আমার অদৃষ্টদোষে বগলে বন্দুক, পায়ে বুট, পরিধানে কোট-পেণ্টালুন, বাস তাঁবুতে; সুতরাং এ কথা না বলিলে ভাল দেখায় না। বিশেষতঃ অনেকে আমায় সাহেব বলিয়া জানে, অতএব সাহেবী ধরণে নিঃসঙ্কোচ-চিত্তে চলিলাম।

যুবার সঙ্গে কতক দূরে গেলে সে আমায় বলিল, "আমি বাঘটি স্বহস্তে মারিব।" আমি হাসিয়া সম্মত হইলাম। যুবা আর কোন কথা না বলিয়া চলিল, তখন হইতে নিজের প্রতি আমার কিঞ্চিৎ ভালবাসার সঞ্চার হইল। "স্বহস্তে মারিব" এই কথায়

বুঝাইয়াছিল, পরহস্তে বাঘ মারা সম্ভব; আমি সাহেব-বেশধারী, অবশ্য বাঘ মারিলে মারিতে পারি, যুবা এ কথা নিশ্চিত ভাবিয়াছিল, তাহাতেই আমি কৃতার্থ হইয়াছিলাম। তাহার পর কতক দূরে গিয়া উভয়ে পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। যুবা অগ্রে, আমি পশ্চাতে। যুবার স্কন্ধে টাঙ্গি, সে একবার তাহা স্কন্ধ হইতে নামাইয়া তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা করিয়া দেখিল। তাহার পর কতক দূরে গিয়া দেখি, পাহাড়ের এক স্থানে প্রকাণ্ড দীর্ঘিকার ন্যায় একটি গর্ত্ত বা গুহা আছে, তাহার মধ্য-স্থানে প্রস্তরনির্ম্মিত একটি কুটীর, চতুঃপার্শ্বস্থ স্থান তাহার প্রাঙ্গণস্বরূপ। যুবা সেই গর্ত্তের নিকট, একস্থানে দাঁড়াইয়া-অতি সাবধানে ব্যাঘ্র দেখাইল। প্রাঙ্গণের একপার্শ্বে ব্যাঘ্র নিরীহ ভালমানুষের ন্যায় চোখ বুজিয়া আছে, মুখের নিকট সুন্দর-নখরসংযুক্ত একটি থাবা দর্পণের ন্যায় ধরিয়া নিদ্রা যাইতেছে। বোধ হয়, নিদ্রার পূর্ব্বে থাবাটি একবার চাটিয়াছিল। যে দিকে ব্যাঘ্র নিদ্রিত ছিল, যুবা সেই দিকে চলিল। আমায় বলিল, "মাথা নত করিয়া আসুন, নতুবা প্রাঙ্গণে ছায়া পড়িবে।" তদনুসারে আমি নতশিরে চলিলাম। শেষে সে একখানি বৃহৎ প্রস্তরে হাত দিয়া বলিল, "আসুন, এইখানি ঠেলিয়া তুলি।" উভয়ে প্রস্তরখানিকে স্থানচ্যুত করিলাম। তাহার পর উহা ঘোররবে প্রাঙ্গণে পড়িল; শব্দে কি আঘাতে তাহা ঠিক জানি না, ব্যাঘ্র উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার পর পড়িয়া গেল। এ নিদ্রা আর ভাঙ্গিল না।

পরিশ্রম

গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

[ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ভবানীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। অসাধারণ চিকিৎসা-নৈপুণ্যে তিনি তাঁহার সময়ে কলিকাতার চিকিৎসক-মণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালা ভাষায় এলোপ্যাথি চিকিৎসা-সম্বন্ধে মৌলিক গ্রন্থ রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন; তদ্ভিন্ন তাঁহার রচিত নানা-বিষয়ক প্রবন্ধ তৎসময়ে বিশেষ আদৃত হইয়াছিল। তিনি সংস্কৃত রামায়ণের অনেকাংশের বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র দেশবিশ্রুত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে তিনি নিজের মনের মত করিয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং তাঁহার চরিত্রগঠনে বিশেষ সহায়ক হইয়াছিলেন।]

যৌবনাবস্থায় এবং প্রৌঢ়াবস্থায় শরীর সবল ও সুস্থ রাখিবার জন্য বাল্যাবস্থা হইতেই প্রত্যহ নিয়মিতরূপে কিয়ৎপরিমাণে শারীরিক পরিশ্রম করা নিতান্ত আবশ্যক। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য শারীরিক পরিশ্রমকে আহার-নিদ্রার ন্যায় অত্যাবশ্যক বিবেচনা করিতে হইবে। দেহস্থ পেশী-সকল প্রতিনিয়ত চালনা না করিলে কোনক্রমেই শরীর সুস্থ রাখা সম্ভব নহে।

যেরূপ শারীরিক পরিশ্রমই করা হউক না কেন, ইহা-দ্বারা যে ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস বহিতে থাকে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। শ্বাসগ্রহণ-কালে দেহের মধ্যে বায়ু প্রবেশ করে, এবং শ্বাসত্যাগ-কালে বাষ্পরূপে দেহ হইতে এক প্রকার

দূষিত পদার্থ বহির্গত হইয়া যায়। যথাযোগ্যরূপে দেহ হইতে এই দূষিত পদার্থ বহির্গত হইলে যে স্বাস্থ্যরক্ষা-সম্বন্ধে উপকার দর্শিবে, তাহা উল্লেখ করা অনাবশ্যক। কিন্তু এ স্থলে ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, দেহের মেদ-পদার্থ ধ্বংস হইয়াই ঐ বাষ্প জন্মিয়া থাকে; তজ্জন্য শীর্ণ শরীরে পরিশ্রম করিলে, দুগ্ধ, ঘৃত, মাখন, তৈল, সমেদ মাংস ইত্যাদি দ্রব্য অধিক আহার করা আবশ্যক। এই জন্যই পরিশ্রম-দ্বারা মেদপূর্ণ স্থূলকায় ব্যক্তিদিগের মেদের হ্রাস হয় এবং পেশী-সকল স্থূল হইতে থাকে। বালক-বালিকারা অধিক ঘৃত, দুগ্ধ, মাখন খাইয়া অত্যন্ত স্থূল হইতে আরম্ভ করিলে, শারীরিক পরিশ্রমই তাহার মহৌষধ। অধিকন্তু, শারীরিক পরিশ্রম-দ্বারা দেহে অধিক পরিমাণে বায়ু প্রবেশ করে বলিয়া বিশুদ্ধ বায়ুসঞ্চার-সম্পন্ন ও অনাবৃত স্থানেই পরিশ্রম করা উচিত। এজন্য গৃহমধ্যে দ্বারাদি রুদ্ধ করিয়া মুদ্গর ঘুরান, ডন ফেলা ইত্যাদি ব্যায়াম নিতান্ত অযৌক্তিক। অতিরিক্ত পরিশ্রম অথবা দুর্ব্বল ও পীড়িত শরীরে পরিশ্রম করাও উচিত নহে।

কি শীতকাল, কি গ্রীষ্মকাল, সকল কালেই শারীরিক পরিশ্রম-দ্বারা প্রায় কিয়ৎপরিমাণে ঘর্ম্ম নির্গত হইয়া থাকে। এই ঘর্ম্ম দ্বারা দেহস্থ ধ্বস্ত এবং দূষিত পদার্থ বহির্গত হওয়াতে উপকার দর্শে। এ স্থলে ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, উত্তম-রূপে গাত্র পরিষ্কৃত না থাকিলে, সুচারুরূপে ঘর্ম্ম নির্গত হইতে পারে না; এজন্য, শারীরিক পরিশ্রম করিতে হইলে, প্রত্যহ স্নানাদি দ্বারা গাত্র পরিষ্কার রাখা আবশ্যক। ঘর্ম্মাক্ত দেহে বায়ু লাগাইলে বাষ্প নির্গমন-দ্বারা হঠাৎ দেহ শীতল হওয়াতে

অপকার হইতে পারে; তজ্জন্য পরিশ্রমের পর গাত্র অনাবৃত করা উচিত নহে।

শারীরিক পরিশ্রম-দ্বারা পেশী-সকল বর্দ্ধিত, স্থূল, সবল ও কঠিন হয় এবং তাহারা সহজেই স্ব স্ব কার্য্য করিতে পারে। পেশী কাহাকে বলে, বোধ হয় সকলে তাহা অবগত নহে। সচরাচর আমরা যে মাংসাহার করি, তাহা পেশীখণ্ড মাত্র। হস্তপদাদিতে ইহারা দীর্ঘাকার; ইহারা ঐ সকল স্থানের অস্থি বেষ্টন করিয়া অবস্থিতি করে এবং উপরে কেবল মেদ- ও ত্বক্-দ্বারা আবৃত থাকে। এই মেদের ভাগ অধিক হইলেই শরীর সুগোল ও কোমল হয়, কিন্তু ইহা স্বাস্থ্যের ও বলের চিহ্ন নহে। এই সকল পেশীর ক্রিয়া ব্যতীত এক স্থানে বসিয়া অঙ্গচালন, স্থানান্তরে গমনাগমন, এমন-কি শ্বাস-প্রশ্বাস ইত্যাদি ক্রিয়াও নির্ব্বাহ হইতে পারে না। এজন্য ইহাদিগকে দেহের অত্যাবশ্যক অংশ বলিতে হইবে; পরিশ্রম ব্যতীত ইহারা কোন-ক্রমেই সবল থাকিতে পারে না।

কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, যেমন বিনা পরিশ্রমে ইহারা হ্রাস প্রাপ্ত হয়, তেমনি অনবরত পরিশ্রম-দ্বারাও ইহাদের ঐ অবস্থা ঘটে। অধিকন্তু, এক স্থানের পেশী সর্ব্বদা চালনা করিলে, উহারা ক্রমে অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়; এজন্য মধ্যে মধ্যে পরিশ্রমের বিরাম আবশ্যক, এবং এরূপে পরিশ্রম করা উচিত, যাহাতে দেহস্থ সমস্ত শরীর চালনা হইতে পারে। সন্তরণ, ভ্রমণ, অশ্বারোহণ ইত্যাদি ব্যায়াম-দ্বারা ইহা সম্পন্ন হইতে পারে।

মানসিক বৃত্তি-সকলের উপর শারীরিক পরিশ্রমের প্রভাব আছে কি না, তাহা নিশ্চয় বলিতে পারা যায় না। কেহ

কেহ অনুমান করেন যে, যাঁহারা সর্ব্বদাই শারীরিক পরিশ্রম করেন, তাঁহাদের মানসিক বৃত্তি প্রখর হয় না। অনেক স্থলে এরূপ বোধ হয় বটে, কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে সপ্রমাণ হইবে যে, যাঁহারা অধিক শারীরিক পরিশ্রম করেন, তাঁহারা মানসিক বৃত্তি-সকলের চালনা করিবার অবকাশ পান না বলিয়াই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। শারীরিক পরিশ্রম ব্যতীত শরীর সুস্থ রাখা সম্ভব নহে, সুতরাং উহা ব্যতীত মানসিক বৃত্তি-সকলের যথাযোগ্যরূপে চালনাও সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ, বাল্যাবস্থায় অতিরিক্ত মানসিক চিন্তা না করিয়া, যাহাতে শরীর উত্তমরূপে বর্দ্ধিত ও সবল হয়, তাহারই চেষ্টা করা উচিত।

শারীরিক পরিশ্রম-দ্বারা ক্ষুধাবৃদ্ধি হয় এবং মাংস ও মেদ-পদার্থাদি সহজে জীর্ণ করিতে পারা যায়। সম-পরিমাণে আহার করিয়া অলস-স্বভাব ব্যক্তির অপেক্ষা পরিশ্রমী ব্যক্তির শরীর যে সবল থাকে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বিশুদ্ধ বায়ু-সঞ্চার-সম্পন্ন স্থানে শারীরিক পরিশ্রম করিলে, ক্ষুধার অধিকতর বৃদ্ধি হইয়া থাকে, এবং এই উপায়-দ্বারা অনেকের পুরাতন অজীর্ণ রোগ দূর হইতে দেখা গিয়াছে।

দীনদরিদ্র লোকদিগের সন্তান প্রচুর আহার ও বস্ত্রাদির অভাবেও বহু ধনাঢ্য লোকের সন্তান অপেক্ষা হৃষ্টপুষ্ট ও বলবান্ হয়। শারীরিক পরিশ্রমই যে ইহার মূলীভূত কারণ, তাহার কোন সন্দেহ নাই। আবৃত উষ্ণ গৃহে বাস, অধিক পরিমাণে ঘৃত-দুগ্ধ ভোজন, সুকোমল শয্যায় শয়ন ও একেবারে শারীরিক পরিশ্রমের অভাব হইলে, কোনক্রমেই শরীর সবল হইবার সম্ভাবনা নাই।

শারীরিক পরিশ্রমের আবশ্যকতার বিষয় উল্লেখ করা হইল'। এক্ষণে বাল্য ও যৌবনাবস্থায় কিরূপ পরিশ্রম করা উচিত, তাহা উল্লেখ করা যাইতেছে।

ভ্রমণ।—বাল্যাবস্থায় বিশুদ্ধ বায়ুসঞ্চার-সম্পন্ন স্থানে বেড়ান' বা দৌড়ান'-ই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচনা করিতে হইবে। দ্রুতবেগে ও বাহুদ্বয় আন্দোলন করিতে করিতে বেড়াইলে দেহের অধিকাংশ পেশীই সক্রিয় হয়,—ইহা সকল অবস্থার লোকের পক্ষেই অনায়াস-সাধ্য। বিশেষ অনুসন্ধান ও পরীক্ষার দ্বারা এক-প্রকার স্থির হইয়াছে যে, প্রৌঢ়াবস্থায় নীরোগ ও সবল শরীরে প্রত্যহ চার-পাঁচ ক্রোশ পথ ভ্রমণ, বা ঐ পথ ভ্রমণ করিতে যেরূপ শারীরিক পরিশ্রম আবশ্যক হয়, অন্য প্রকারে ঐ পরিমাণে পরিশ্রম, না করিলে, শরীর বলিষ্ঠ ও মনুষ্য দীর্ঘজীবী হইতে পারে না। বালকবালিকাদিগের পক্ষে প্রত্যহ অন্ততঃ দুই ক্রোশ পথ ভ্রমণ অথবা ঐ ভ্রমণের অনুরূপ অন্য প্রকার পরিশ্রম করা নিতান্ত আবশ্যক। যদ্দ্বারা শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, এরূপ অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রমে যে অপকার হইবার সম্ভাবনা, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

দিবসের অন্যান্য সময় অপেক্ষা অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়াই ভ্রমণ করা উচিত। এই সময়ে বায়ু যেরূপ বিশুদ্ধ এবং শীতল থাকে, তেমন আর কোন সময়েই থাকে না। অধিকন্তু, এই সময়ে ধূলি- ও লোকের নিঃশ্বাস-দ্বারা বায়ু দূষিত হয় না। প্রাতে উঠিয়া শরীর দুর্ব্বল মনে হইলে বা ক্ষুধা-বোধ হইলে, কিঞ্চিৎ লঘু আহার করিয়া ভ্রমণ করিতে বাহির হওয়া উচিত। প্রাতে কিঞ্চিৎ আহার করিলেও ভ্রমণান্তে বিলক্ষণ ক্ষুধা-বোধ হইবে।

পূর্ণাহারের পর এক ঘণ্টা, অন্ততঃ অর্দ্ধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত কোনরূপ শারীরিক পরিশ্রম করা উচিত নহে। এ সময়ে পরিশ্রম করিলে ভুক্ত দ্রব্যাদি উত্তমরূপে পরিপাক হইতে পারে না। বালকদিগের আহারের পর বিদ্যালয়ে গমন করিবার সময়ে এই বিষয়টি স্মরণ রাখা আবশ্যক।

সন্তরণ।—সন্তরণ-দ্বারা যে কেবল জলমগ্ন হইবার সময়ে প্রাণরক্ষা করিতে পারা যায়, এমত নহে; স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে ইহা বিশেষ উপকারী। প্রত্যহ পুষ্করিণী বা নদীতে স্নানের সময়ে, বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে, কিয়ৎক্ষণের জন্য সাঁতার দিলে ক্রমে বক্ষঃস্থল প্রসারিত হয়, ক্ষুধা- ও সাহস-বৃদ্ধি হয়, এবং মন প্রফুল্ল থাকে। সাঁতার ভিন্ন অন্য কোনরূপ পরিশ্রম-দ্বারা দেহের কোন কোন পেশী সম্যক্-রূপে সক্রিয় হয় না। বাটীর মধ্যে পুষ্করিণী থাকিলে বালিকাদিগের পক্ষেও ইহা সুসাধ্য। রোমরাজ্যের লোকেরা সাঁতার-শিক্ষাকে এত আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিত যে, কোন ব্যক্তিকে মূর্খ বলিয়া তিরস্কার করিবার সময়ে সচরাচর লোকে কহিত, "সে ব্যক্তি পড়িতেও জানে না, সাঁতার দিতেও জানে না।"

অশ্বারোহণ।—বালকদিগের পক্ষে অশ্বারোহণ অতি মনোহর ব্যায়াম বটে, কিন্তু অশ্বারোহণের পরে কিঞ্চিৎ ভ্রমণ করা আবশ্যক। নগরবাসী লোকদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ আবশ্যক, কারণ ইহা দ্বারা অনায়াসেই নিকট পল্লীগ্রামে গিয়া বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করা যাইতে পারে। ইহা-দ্বারা শরীরের গঠন দেখিতে সুন্দর হয়, হস্তপদাদি চালনে জড়তা জন্মে না, বক্ষঃস্থল প্রসারিত এবং পেশী-সকল দৃঢ় ও সবল হইতে থাকে। বঙ্গদেশীয় লোকদিগের

পক্ষে ইহা আপাততঃ বিশেষ প্রয়োজনীয়, কারণ ইহাতে তাহাদের সাহস-বৃদ্ধি হইতে পারে। হীন অবস্থার লোকদিগের পক্ষে অশ্বারোহণ ঘটিয়া উঠা দুষ্কর বটে, কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ ইত্যাদি উপলক্ষে অনেকে যেরূপ ব্যয় করিয়া থাকেন, তাহার কিয়দংশ-দ্বারাই বালকদিগের অশ্বারোহণ হইতে পারে। অনেক স্থলে ইহা দুঃসাহসের কার্য্য বলিয়াই পিতামাতা সহসা ইহাতে সম্মত হইবেন না। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে, ইহা-দ্বারা সাহস- ও বল-বৃদ্ধি হইলে ভবিষ্যতে বরং অনেক বিষয়ে উপকার হইবারই সম্ভাবনা। বালিকাদিগকেও যে অশ্বারোহণ করিতে শিক্ষা দেওয়া উচিত, তাহা আপাততঃ এতদ্দেশে সম্ভব নহে বলিয়া কেবল ইহার নাম মাত্র উল্লিখিত হইল।

শকটারোহণ।—শকটারোহণে ভ্রমণ করিলে শারীরিক পরিশ্রম প্রায় কিছুই হয় না; তজ্জন্য ভ্রমণ, সন্তরণ বা অশ্বারোহণের সহিত ইহার তুলনা করা যাইতে পারে না। কিন্তু ইহা-দ্বারা বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করা যাইতে পারে, তজ্জন্য ইহাও উপকারী।

একণে ক্রীড়া ও ক্রীড়ার উপকারিতা-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা যাইতেছে।

বাল্যাবস্থায় পুস্তকাদি লইয়া সর্ব্বদা পাঠাভ্যাস বা অনবরত মানসিক চিন্তা না করিয়া, মধ্যে মধ্যে ক্রীড়া করা নিতান্ত আবশ্যক। ক্রীড়া অনেক প্রকার আছে, তন্মধ্যে যাহাতে শারীরিক পরিশ্রম হয়, বাল্যাবস্থায় সেইরূপ ক্রীড়াতেই প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। প্রশস্ত ময়দানে ব্যাটবল খেলা, ঘুড়ী উড়ান',

নৌকায় দাঁড় বাওয়া, দৌড়ান', নানাপ্রকার কুস্তি বা ব্যায়াম ইত্যাদি ক্রীড়া-দ্বারাই বক্ষঃস্থল প্রসারিত ও শরীর সবল হয়। কিন্তু এই ব্যায়ামের সহিত প্রচুর আহার না পাইলে শরীর সবল হওয়া দূরে থাকুক, ক্রমে উহা নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এইরূপ ব্যায়াম-দ্বারা ফুস্‌ফুস্‌ সম্পূর্ণরূপে প্রসারিত হয় এবং তজ্জন্য উহাতে অধিক পরিমাণে বায়ু প্রবেশ করে ও উহা নানাপ্রকার পীড়া হইতে রক্ষিত হয়। প্রচুর শারীরিক পরিশ্রম ব্যতীত ফুস্‌ফুসের মধ্যে অধিক পরিমাণে বায়ু প্রবিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। অলসভাবে থাকিলে সচরাচর উহার অর্দ্ধাংশও বায়ু-দ্বারা প্রসারিত হয় না। স্বল্পবায়ু-দ্বারা শরীর সুস্থ থাকিতে পারে না।

বাল্যাবস্থায় অনেক বালক তাস খেলিতে শিখে এবং পিতামাতা তাহা জানিতে পারিয়াও অনিষ্টকর বলিয়া বিবেচনা করেন না। কিন্তু গৃহমধ্যে বসিয়া ইহাতে বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া, বায়ুসঞ্চার-সম্পন্ন স্থানে ভ্রমণ বা অন্যরূপ শারীরিক পরিশ্রম করিলে যে কত উপকার হয়, তাহা স্মরণ রাখা উচিত। অধিকন্তু, এই কু-অভ্যাস-দ্বারা বালকেরা ক্রমে এরূপ অলস-স্বভাব হইয়া যায় এবং উহা তাহাদের এত অধিক ভাল লাগে যে, তাহারা অনেক আবশ্যক কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াও সময় এবং সহচর পাইলেই এই ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয়। এতদ্দেশীয় বহু সুশিক্ষিত ও বিজ্ঞ ব্যক্তিরাও বাল্যাবস্থার অভ্যাসবশতঃ সময় পাইলেই এই নারী-জনোচিত ক্রীড়া পরিত্যাগ করিতে পারেন না।

ঘুড়ি উড়ানকে এক প্রকার উৎকৃষ্ট ক্রীড়া বলিয়া উল্লেখ করা হয়; কিন্তু যাহাতে চঞ্চল বালক ছাদের উপর ঐ ক্রীড়া না

করে, তদ্বিষয়ে পিতামাতার সতর্ক হওয়া আবশ্যক। প্রাতে বা অপরাহ্ণে প্রশস্ত ময়দানে দৌড়াদৌড়ি করিয়া এই ক্রীড়া করিলেই স্বাস্থ্যরক্ষা-সম্বন্ধে উপকার হইবার সম্ভাবনা।

গীতবাদ্যকে বাল্যাবস্থার একটি মনোরম ক্রীড়া বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। সচরাচর অনেক বালক গীতবাদ্য শিক্ষা করিয়া কেবল উহাতেই মত্ত থাকে এবং বিদ্যাভ্যাস পরিত্যাগ করে বলিয়া, জনসাধারণের নিকটে ইহা জঘন্য এবং ইতরের কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হয়,—কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। সম্ভব- ও বিবেচনা-মত শিক্ষা করিতে পারিলে ইহা হইতে অনেক সময়ে সন্তোষলাভ করিতে পারা যায়।

সজোরে ফুৎকার করিয়া বংশী শিক্ষা করিতে হয়, বলিয়া কাশির পীড়া হইবার সম্ভাবনা। বক্ষঃস্থল দুর্ব্বল ও সঙ্কীর্ণ থাকিলে, উহা নিতান্ত নিষিদ্ধ বিবেচনা করা উচিত। পীড়ার আশঙ্কা না থাকিলে, গান করিতে শিখিলে যে কেবল বক্ষঃস্থল প্রসারিত হওয়াতে উপকার দর্শে, এমত নহে, ইহা-দ্বারা উচ্চারণ পরিষ্কার হয়, স্বর মিষ্ট হয়, বাক্যের জড়তা থাকে না এবং বক্তৃতা করিবার পক্ষে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়।

———

বাঙ্গালা ভাষা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[চব্বিশ-পরগনার অন্তর্গত কাঁটালপাড়া গ্রামে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম হয়। পিতা যাদবচন্দ্র অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। যাদবচন্দ্রের চার পুত্র—শ্যামাচরণ, সঞ্জীবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলে এবং হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজে পরিণত হইলে, ইনি পর বৎসরই উক্ত কলেজ হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রথম বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সঙ্গে সঙ্গেই ইনি গভর্নমেণ্ট কর্ত্তৃক ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন।

ইনি পাঠদশাতেই পদ্যরচনা করিয়া মধ্যে মধ্যে 'প্রভাকর' ও অন্যান্য সংবাদ-পত্রে প্রকাশ করিতেন। প্রভাকর-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কাছে ইঁহার বাঙ্গালা লেখার হাতে-খড়ি। এই সময় ইনি 'ললিতা ও মানস' নামক একখানি ক্ষুদ্র কবিতাপুস্তক রচনা করেন। ইহার অনেক দিন পরে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার প্রসিদ্ধ উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হয়। ইঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রধান কয়েকখানির নাম এই: দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, কৃষ্ণকান্তের উইল, দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম, আনন্দমঠ, রজনী, যুগলাঙ্গুরীয়, রাধারাণী, রাজসিংহ, ইন্দিরা, মৃণালিনী, কমলাকান্তের দপ্তর, লোকরহস্য, বিবিধ প্রবন্ধ, কৃষ্ণচরিত্র ও ধর্ম্মতত্ত্ব। ইনি ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে 'বঙ্গদর্শন' নামক নূতন ধরণের একখানি উচ্চশ্রেণীর মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ৫৬ বৎসর বয়সে ইনি স্বর্গারোহণ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ লেখক ও ঔপন্যাসিক।]

প্রায় সকল দেশেই লিখিত ভাষা এবং কথিত ভাষায় অনেক প্রভেদ। যে সকল বাঙ্গালী ইংরেজি সাহিত্যেই পারদর্শী, তাঁহারা

একজন লণ্ডনী 'ককনী' বা একজন কৃষকের কথা সহজে বুঝিতে পারেন না, এবং এতদ্দেশে অনেক দিন বাস করিয়া বাঙ্গালীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে যে ইংরেজেরা বাঙ্গালা শিখিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় একখানিও বাঙ্গালা গ্রন্থ বুঝিতে পারেন না। প্রাচীন ভারতেও, সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে, আদৌ বোধ হয়, এইরূপ প্রভেদ ছিল, এবং সেই প্রভেদ হইতে আধুনিক ভারতবর্ষীয় ভাষা-সকলের উৎপত্তি।

বাঙ্গালায় লিখিত এবং কথিত ভাষায় যতটা প্রভেদ দেখা যায়, অন্যত্র তত নহে। বলিতে গেলে, কিছুকাল পূর্ব্বে দুইটি পৃথক্ ভাষা বাঙ্গালায় প্রচলিত ছিল—একটির নাম সাধু ভাষা, অপরটির নাম অপর ভাষা। একটি লিখিবার ভাষা, দ্বিতীয়টি কহিবার ভাষা। পুস্তকে প্রথম ভাষাটি ভিন্ন দ্বিতীয়টির কোন চিহ্ন পাওয়া যাইত না। সাধু ভাষায় অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ-সকল বাঙ্গালা ক্রিয়াপদের আদিম রূপের সঙ্গে সংযুক্ত হইত। যে শব্দ আভাঙ্গা সংস্কৃত নহে, সাধু ভাষায় প্রবেশ করিবার তাহার কোন অধিকার ছিল না। লোকে বুঝুক বা না বুঝুক, আভাঙ্গা সংস্কৃত চাহি। অপর ভাষা সে দিকে না গিয়া, যাহা সকলের বোধগম্য তাহাই ব্যবহার করে।

গদ্য-গ্রন্থাদিতে সাধু ভাষা ভিন্ন আর কিছু ব্যবহার হইত না। তখন পুস্তক-প্রণয়ন সংস্কৃত-ব্যবসায়ীদিগের হাতে ছিল। অন্যের বোধ ছিল যে, যে সংস্কৃত না জানে, বাঙ্গালা গ্রন্থ-প্রণয়নে তাহার কোন অধিকার নাই; সে বাঙ্গালা লিখিতেই পারে না। যাঁহারা ইংরেজিতে পণ্ডিত, তাঁহারা বাঙ্গালাতে লিখিতে-পড়িতে না-জানা গৌরবের মধ্যে গণ্য করিতেন। সুতরাং বাঙ্গালায় রচনা

ফোঁটা-কাটা অনুস্বারবাদীদিগের একচেটিয়া মহল ছিল। সংস্কৃতেই তাঁহাদিগের গৌরব। তাঁহারা ভাবিতেন, সংস্কৃতেই তবে বুঝি বাঙ্গালা ভাষার গৌরব। যেমন গ্রাম্য স্ত্রীলোক মনে করে যে, শোভা বাড়ুক না-বাড়ুক, ওজনে ভারি সোনা অঙ্গে পরিলেই অলঙ্কার পরার গৌরব হইল, এই গ্রন্থকর্ত্তারা তেমনি জানিতেন ভাষা সুন্দর হউক বা না-হউক, দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃতবাহুল্য থাকিলেই রচনার গৌরব হইল।

এইরূপ সংস্কৃতপ্রিয়তা- এবং সংস্কৃতানুকারিতা-হেতু, বাঙ্গালা সাহিত্য অত্যন্ত নীরস, শ্রীহীন, দুর্ব্বল এবং বাঙ্গালা সমাজে অপরিচিত হইয়া রহিল। টেকচাঁদ ঠাকুর প্রথমে এই বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। তিনি ইংরেজিতে সুশিক্ষিত, ইংরেজিতে প্রচলিত ভাষার মহিমা দেখিয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন, বাঙ্গালার প্রচলিত ভাষাতেই বা কেন গদ্যগ্রন্থ রচিত হইবে না? যে ভাষায় সকলে কথোপকথন করে, তিনি সেই ভাষায় "আলালের ঘরের দুলাল" প্রণয়ন করিলেন। সেই দিন হইতে বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি। সেই দিন হইতে শুষ্কতরুর মূলে জীবনবারি নিষিক্ত হইল।

সেই দিন হইতে সাধু ভাষা এবং অপর ভাষা—দুই প্রকার ভাষাতেই বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণয়ন হইতে লাগিল, ইহা দেখিয়া সংস্কৃত-ব্যবসায়ীরা জ্বালাতন হইয়া উঠিলেন; অপর ভাষা তাঁহাদিগের বড় ঘৃণ্য।

এক্ষণে বাঙ্গালা ভাষার সমালোচকেরা দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছেন। এক দল খাঁটি সংস্কৃতবাদী; যে গ্রন্থে সংস্কৃত-মূলক শব্দ ভিন্ন অন্য শব্দ ব্যবহার হয়, তাহা তাঁহাদের বিবেচনায়

ঘৃণার যোগ্য। অপর সম্প্রদায় বলেন, তোমাদের ও-কচ্‌কচি বাঙ্গালা নহে; উহা আমরা কোন গ্রন্থে ব্যবহার করিতে দিব না। যে ভাষা বাঙ্গালা সমাজে প্রচলিত, যাহাতে বাঙ্গালার নিত্য কার্য্য-সকল সম্পাদিত হয়, যাহা সকল বাঙ্গালীতে বুঝে, তাহাই বাঙ্গালা ভাষা; তাহাই গ্রন্থাদিতে ব্যবহারের যোগ্য। অধিকাংশ সুশিক্ষিত ব্যক্তি এক্ষণে এই সম্প্রদায়ভুক্ত।

স্থূল কথা, সাহিত্য কি জন্য? গ্রন্থ কি জন্য?—যে পড়িবে তাহার বুঝিবার জন্য; না-বুঝিয়া, বহি বন্ধ করিয়া, পাঠক ত্রাহি ত্রাহি করিয়া ডাকিবে, বোধ হয় এ উদ্দেশ্যে কেহ গ্রন্থ লিখে না। যদি এ কথা সত্য হয়, তবে যে ভাষা সকলের বোধগম্য,—অথবা যদি সকলের বোধগম্য কোন ভাষা না থাকে, তবে যে ভাষা অধিকাংশ লোকের বোধগম্য তাহাতেই গ্রন্থ প্রণীত হওয়া উচিত। যদি কোন লেখকের এমন উদ্দেশ্য থাকে যে, আমার গ্রন্থ দুই-চারিজন শব্দ-পণ্ডিতে বুঝুক, আর কাহারও বুঝিবার প্রয়োজন নাই, তবে তিনি গিয়া দুরূহ ভাষায় গ্রন্থ-প্রণয়নে প্রবৃত্ত হউন; যে তাঁহার যশ করে করুক, আমরা কখনও যশ করিব না। তিনি দুই-একজনের উপকার করিলে করিতে পারেন, কিন্তু আমরা তাঁহাকে পরোপকার-কাতর খলস্বভাব বলিব। তিনি জ্ঞান-বিতরণে প্রবৃত্ত হইয়া চেষ্টা করিয়া অধিকাংশ পাঠককে আপনার জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে দূরে রাখেন। যিনি যথার্থ গ্রন্থকার, তিনি জানেন যে, পরোপকার ভিন্ন গ্রন্থ-প্রণয়নের উদ্দেশ্য নাই; জন-সাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধি বা চিত্তোন্নতি ভিন্ন রচনার অন্য উদ্দেশ্য নাই; অতএব যত অধিক ব্যক্তি গ্রন্থের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে, ততই অধিক ব্যক্তি উপকৃত, ততই গ্রন্থের সফলতা। জ্ঞানে মনুষ্য-

মাত্রেরই তুল্যাধিকার। যদি সেই সর্ব্বজনের প্রাপ্য ধনকে, তুমি এমত দুরূহ ভাষায় নিবদ্ধ রাখ যে, কেবল যে কয়জন পরিশ্রম করিয়া সেই ভাষা শিখিয়াছে, তাহারা ভিন্ন আর কেহ তাহা পাইতে পারিবে না, তবে তুমি অধিকাংশ মনুষ্যকে তাহাদিগের স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিলে—তুমি সেখানে বঞ্চকমাত্র।

বিষয়-অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন;—সরলতা এবং স্পষ্টতা। যে রচনা সকলেই বুঝিতে পারে এবং পড়িবামাত্র যাহার অর্থ বুঝা যায়, অর্থ-গৌরব থাকিলে তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা। তাহার পর ভাষার সৌন্দর্য্য; সরলতা এবং স্পষ্টতার সহিত সৌন্দর্য্য মিশাইতে হইবে। অনেক রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য—সে স্থলে সৌন্দর্য্যের অনুরোধে শব্দের একটু অসাধারণতা সহ্য করিতে হয়। প্রথমে দেখিবে, তুমি যাহা বলিতে চাও, কোন্ ভাষায় তাহা সর্ব্বাপেক্ষা পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত হয়। যদি সরল প্রচলিত কথাবার্ত্তার ভাষায় তাহা সর্ব্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট এবং সুন্দর হয়, তবে কেন উচ্চভাষার আশ্রয় লইবে? যদি সে পক্ষে টেকচাঁদি বা হুতোমি ভাষায় সকলের অপেক্ষা কার্য্য সুসিদ্ধ হয়, তবে তাহাই ব্যবহার করিবে। যদি তদপেক্ষা বিদ্যাসাগর- বা ভূদেববাবু-প্রদর্শিত সংস্কৃতবহুল ভাষায় ভাবের অধিক স্পষ্টতা এবং সৌন্দর্য্য হয়, তবে সামান্য ভাষা ছাড়িয়া সেই ভাষার আশ্রয় লইবে। যদি তাহাতেও কার্য্য সিদ্ধ না হয়, আরও উপরে উঠিবে; প্রয়োজন হইলে, তাহাতেও আপত্তি নাই—নিষ্প্রয়োজনেই আপত্তি। বলিবার কথাগুলি পরিস্ফুট করিয়া বলিতে হইবে—যতটুকু বলিবার আছে, সবটুকু বলিবে—তজ্জন্য ইংরেজি, ফার্সি,

আরবি, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য—যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন, তাহা গ্রহণ করিবে, অশ্লীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না। তারপর সেই রচনাকে সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট করিবে—কেননা যাহা অসুন্দর, মনুষ্য-চিত্তের উপরে তাহার শক্তি অল্প। এই উদ্দেশ্যগুলি যাহাতে সরল প্রচলিত ভাষায় সিদ্ধ হয়, সেই চেষ্টা দেখিবে; লেখক যদি লিখিতে জানেন তবে সে চেষ্টা প্রায় সফল হইবে। আমরা দেখিয়াছি, সরল প্রচলিত ভাষা অনেক বিষয়ে সংস্কৃতবহুল ভাষার অপেক্ষা শক্তিমতী। কিন্তু যদি সেই সরল প্রচলিত ভাষায় সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়, তবে কাজে কাজেই সংস্কৃতবহুল ভাষার আশ্রয় লইতে হইবে। প্রয়োজন হইলে, নিঃসঙ্কোচে সে আশ্রয় লইবে।

ইহাই আমাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা রচনার উৎকৃষ্ট রীতি। নব্য ও প্রাচীন উভয় সম্প্রদায়ের পরামর্শ ত্যাগ করিয়া এই রীতি অবলম্বন করিলে, আমাদিগের বিবেচনায়, ভাষা শক্তিশালিনী, শব্দৈশ্বর্য্যে পুষ্টা এবং সাহিত্যালঙ্কারে বিভূষিতা হইবে।

সাগর-সঙ্গমে নবকুমার

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৺ প্রায় দুই শত পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এক দিন মাঘ মাসের রাত্রিশেষে একখানি যাত্রীর নৌকা গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিল। পর্ত্তুগিস্ ও অন্যান্য নাবিকদস্যুদিগের ভয়ে যাত্রীর নৌকা দলবদ্ধ হইয়া যাতায়াত করাই তৎকালের প্রথা ছিল; কিন্তু এই নৌকারোহীরা সঙ্গিহীন। তাহার কারণ এই যে, রাত্রিশেষে ঘোরতর কুজ্ঝটিকা দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়াছিল; নাবিকেরা দিঙ্‌নিরূপণ করিতে না পারিয়া বহর হইতে দূরে পড়িয়াছিল। এক্ষণে কোন্ দিকে কোথায় যাইতেছে, তাহার কিছুই নিশ্চয়তা ছিল না। নৌকারোহিগণ অনেকেই নিদ্রা যাইতেছিলেন। এক জন প্রাচীন এবং এক জন যুবা পুরুষ, এই দুই জন মাত্র জাগ্রৎ অবস্থায় ছিলেন। প্রাচীন যুবকের সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন। বারেক কথাবার্ত্তা স্থগিত করিয়া বৃদ্ধ নাবিকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাঝি, আজ কত দূর যেতে পার্‌বি?" মাঝি কিছু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "বলিতে পারিলাম না।"

বৃদ্ধ ক্রুদ্ধ হইয়া মাঝিকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। যুবক কহিলেন, "মহাশয়, যাহা জগদীশ্বরের হাত, তাহা পণ্ডিতে বলিতে পারে না—ও মূর্খ কি প্রকারে বলিবে? আপনি ব্যস্ত হইবেন না।"

বৃদ্ধ উগ্রভাবে কহিলেন, "ব্যস্ত হব না? বল কি, বেটারা বিশ পঁচিশ বিঘার ধান কাটিয়া লইয়া গেল, ছেলেপিলে সংবৎসর খাবে কি?"

এ সংবাদ তিনি সাগরে উপনীত হইলে পরে পশ্চাদগত অন্য যাত্রীর মুখে পাইয়াছিলেন। যুবা কহিলেন, "আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, মহাশয়ের বাটীতে অভিভাবক আর কেহ নাই— মহাশয়ের আসা ভাল হয় নাই।"

প্রাচীন পূর্ব্ববৎ উগ্রভাবে কহিলেন, "আস্‌ব না? তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে। এখন পরকালের কর্ম্ম করিব না ত কবে করিব?"

যুবা কহিলেন, "যদি শাস্ত্র বুঝিয়া থাকি, তবে তীর্থদর্শনে যেরূপ পরকালের কর্ম্ম হয়, বাটী বসিয়াও সেরূপ হইতে পারে।"

বৃদ্ধ কহিলেন, "তবে তুমি এলে কেন?"

যুবা উত্তর করিলেন, "আমি ত আগেই বলিয়াছি যে, সমুদ্র দেখিব বড় সাধ ছিল, সেই জন্যই আসিয়াছি।" পরে অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলেন, "আহা! কি দেখিলাম! জন্ম-জন্মান্তরেও ভুলিব না—

> 'দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী
> তমালতালী-বনরাজিনীলা
> আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে-
> র্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা॥'"

বৃদ্ধের শ্রুতি কবিতার প্রতি ছিল না, নাবিকেরা পরস্পর যে কথোপকথন করিতেছিল, তাহাই একতান-মনা হইয়া শুনিতে-ছিলেন।

এক জন নাবিক অপরকে কহিতেছিল, "ও ভাই—এ ত বড় কাজটা খারাবি হলো—এখন কি বার-দরিয়ায় পড়লেম—কি কোন্ দেশে এলেম, তা যে বুঝিতে পারি না।"

বক্তার স্বর অত্যন্ত ভয়কাতর। বৃদ্ধ বুঝিলেন যে, কোন বিপদ্-আশঙ্কার কারণ উপস্থিত হইয়াছে। সশঙ্কচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাঝি, কি হয়েছে?" মাঝি উত্তর করিল না। কিন্তু যুবক উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া বাহিরে আসিলেন। বাহিরে আসিয়া দেখিলেন যে, প্রায় প্রভাত হইয়াছে। চতুর্দ্দিক্ অতি গাঢ় কুজ্ঝটিকায় ব্যাপ্ত হইয়াছে—আকাশ, নক্ষত্র, চন্দ্র, উপকূল, কোন দিকে কিছুই দেখা যাইতেছে না। বুঝিলেন, নাবিকদিগের দিগ্‌ভ্রম হইয়াছে। এক্ষণে কোন্ দিকে যাইতেছে, তাহার নিশ্চয়তা পাইতেছে না—পাছে বাহির-সমুদ্রে পড়িয়া অকূলে মারা যায় এই আশঙ্কায় ভীত হইয়াছে।

হিম-নিবারণ-জন্য সম্মুখে আবরণ দেওয়া ছিল, এজন্য নৌকার ভিতর হইতে আরোহীরা এ সকল বিষয় কিছুই জানিতে পারেন নাই। কিন্তু নব্য যাত্রী অবস্থা বুঝিতে পারিয়া বৃদ্ধকে সবিশেষ কহিলেন; তখন নৌকামধ্যে মহাকোলাহল পড়িয়া গেল। যে কয়েকটী স্ত্রীলোক নৌকামধ্যে ছিল, তন্মধ্যে কেহ কেহ কথার শব্দে জাগিয়াছিল, শুনিবামাত্র তাহারা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। প্রাচীন কহিল, "কেনারায় পড়! কেনারায় পড়! কেনারায় পড়!"

নব্য যাত্রী ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "কেনারা কোথা, তাহা জানিতে পারিলে এত বিপদ্ হইবে কেন?"

ইহা শুনিয়া নৌকারোহীদিগের কোলাহল আরও বৃদ্ধি পাইল। নব্য যাত্রী কোন মতে তাহাদিগকে স্থির করিয়া নাবিকদিগকে

কহিলেন, "আশঙ্কার বিষয় কিছু নাই, প্রভাত হইয়াছে—চারি-পাঁচ দণ্ডের মধ্যে অবশ্য সূর্য্যোদয় হইবে। চারি-পাঁচ দণ্ডের মধ্যে নৌকা কদাচ মারা যাইবে না। তোমরা এক্ষণে বাহন বন্ধ কর, স্রোতে নৌকা যথায় যায় যাক্; পশ্চাৎ রৌদ্র হইলে পরামর্শ করা যাইবে।"

নাবিকেরা এই পরামর্শে সম্মত হইয়া তদনুরূপ আচরণ করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নাবিকেরা নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল। যাত্রীরা ভয়ে কণ্ঠাগতপ্রাণ। বেশী বাতাস নাই। সুতরাং তাঁহারা তরঙ্গান্দোলনকম্প বড় জানিতে পারিলেন না। তথাপি সকলেই মৃত্যু নিকট নিশ্চিত করিলেন। পুরুষেরা নিঃশব্দে দুর্গানাম জপ করিতে লাগিলেন, স্ত্রীলোকেরা সুর তুলিয়া বিবিধ শব্দবিন্যাসে কাঁদিতে লাগিল। একটী স্ত্রীলোক গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জ্জন করিয়া আসিয়াছিল, ছেলে জলে দিয়া আর তুলিতে পারে নাই,—সে-ই কেবল কাঁদিল না।

প্রতীক্ষা করিতে করিতে অনুভবে বেলা প্রায় এক প্রহর হইল। এমত সময়ে অকস্মাৎ নাবিকেরা দরিয়ার পাঁচ-পীরের নাম কীর্ত্তিত করিয়া মহা কোলাহল করিয়া উঠিল। যাত্রীরা সকলেই জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, "কি! কি! মাঝি, কি হইয়াছে?" মাঝিরাও একবাক্যে কোলাহল করিয়া কহিতে লাগিল, "রোদ উঠেছে! রোদ উঠেছে! ঐ দেখ ডাঙ্গা!" যাত্রীরা সকলেই ঔৎসুক্য-সহকারে নৌকার বাহিরে আসিয়া, কোথায় আসিয়াছেন, কি বৃত্তান্ত, দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, সূর্য্যপ্রকাশ হইয়াছে। কুজ্ঝটিকার অন্ধকাররাশি হইতে দিঙ্মণ্ডল একেবারে বিমুক্ত

হইয়াছে। বেলা প্রায় প্রহরাতীত হইয়াছে। যে স্থানে নৌকা আসিয়াছে, সে প্রকৃত মহাসমুদ্র নহে, নদীর মোহানা মাত্র, কিন্তু তথায় নদীর যেরূপ বিস্তার, সেরূপ বিস্তার আর কোথাও নাই। নদীর এক কূল নৌকার অতি নিকটবর্ত্তী বটে,—এমন কি, পঞ্চাশৎ হস্তের মধ্যগত, কিন্তু অপর কূলের চিহ্ন দেখা যায় না। আর যে দিকেই দেখা যায়, অনন্ত জলরাশি চঞ্চল রবিরশ্মিমালা-প্রদীপ্ত হইয়া গগনপ্রান্তে গগন-সহিত মিশিয়াছে। নিকটস্থ জল, সচরাচর সকর্দ্দম নদীজলবর্ণ; কিন্তু দূরস্থ বারিরাশি নীলপ্রভ। আরোহীরা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করিলেন যে, তাঁহারা মহাসমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছেন; তবে সৌভাগ্য এই যে, উপকূল নিকটে, আশঙ্কার বিষয় নাই। সূর্য্য-প্রতি দৃষ্টি করিয়া দিক্ নিরূপিত করিলেন। সম্মুখে যে উপকূল দেখিতেছিলেন, সে সহজেই সমুদ্রের পশ্চিম তট বলিয়া সিদ্ধান্ত হইল। তটমধ্যে নৌকার অনতিদূরে এক নদীর মুখ মন্দগামী কলধৌত-প্রবাহবৎ আসিয়া পড়িতেছিল। সঙ্গমস্থলে দক্ষিণ পার্শ্বে বৃহৎ সৈকত-ভূমিখণ্ডে নানাবিধ পক্ষিগণ অগণিত সংখ্যায় ক্রীড়া করিতেছিল। এই নদী এক্ষণে "রসুলপুরের নদী" নাম ধারণ করিয়াছে। ৶

৶ আরোহীদিগের স্ফূর্ত্তিব্যঞ্জক কথা সমাপ্ত হইলে, নাবিকেরা প্রস্তাব করিল যে, জোয়ারের বিলম্ব আছে—এই অবকাশে আরোহিগণ সম্মুখস্থ সৈকতে পাকাদি সমাপন করুন, পরে জলোচ্ছ্বাস আরম্ভেই স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিতে পারিবেন। আরোহিবর্গও এই পরামর্শে সম্মতি দিলেন। তখন নাবিকেরা

তরি তীরলগ্ন করিলে আরোহিগণ অবতরণ করিয়া স্নানাদি প্রাতঃকৃত্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন।

স্নানাদির পর পাকের উদ্যোগে আর এক নূতন বিপত্তি উপস্থিত হইল—নৌকায় পাকের কাষ্ঠ নাই। ব্যাঘ্রভয়ে উপর হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আনিতে কেহই স্বীকৃত হইল না। পরিশেষে সকলের উপবাসের উপক্রম দেখিয়া প্রাচীন, প্রাগুক্ত যুবাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বাপু নবকুমার! তুমি ইহার উপায় না করিলে আমরা এতগুলি লোক মারা যাই।"

নবকুমার কিঞ্চিৎ কাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আচ্ছা যাইব; কুড়ালি দাও, আর দা লইয়া এক জন আমার সঙ্গে আইস।"

কেহই নবকুমারের সহিত যাইতে চাহিল না।

"খাবার সময় বুঝা যাবে"—এই বলিয়া নবকুমার কোমর বাঁধিয়া একাকী কুঠারহস্তে কাষ্ঠাহরণে চলিলেন।

তীরোপরি আরোহণ করিয়া নবকুমার দেখিলেন যে, যতদূর দৃষ্টি চলে, ততদূর-মধ্যে কোথাও বসতির লক্ষণ কিছুই নাই—কেবল বন মাত্র। কিন্তু সে বন, দীর্ঘ বৃক্ষাবলীশোভিত বা নিবিড় বন নহে—কেবল স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ্ মণ্ডলাকারে কোন কোন ভূমিখণ্ড ব্যাপিয়া আছে। নবকুমার তন্মধ্যে আহরণযোগ্য কাষ্ঠ দেখিতে পাইলেন না; সুতরাং উপযুক্ত বৃক্ষের অনুসন্ধানে নদীতট হইতে অধিক দূর গমন করিতে হইল। পরিশেষে ছেদনযোগ্য একটী বৃক্ষ পাইয়া তাহা হইতে প্রয়োজনীয় কাষ্ঠ সমাহরণ করিলেন। কাষ্ঠ বহন করিয়া আনা আর এক বিষম কঠিন ব্যাপার বোধ হইল। নবকুমার দরিদ্রের সন্তান ছিলেন না, এ সকল কর্ম্মে অভ্যাস ছিল না; সম্যক্ বিবেচনা না

করিয়া কাষ্ঠ আহরণে আসিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে কাষ্ঠভার বহন বড় ক্লেশকর হইল। যাহাই হউক, যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতে অল্পে ক্ষান্ত হওয়া নবকুমারের স্বভাব ছিল না, এজন্য তিনি কোন মতে কাষ্ঠভার বহিয়া আনিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর বহেন, পরে ক্ষণেক বসিয়া বিশ্রাম করেন, আবার বহেন; এইরূপে আসিতে লাগিলেন।

এই হেতুবশতঃ নবকুমারের প্রত্যাগমনে বিলম্ব হইতে লাগিল। এদিকে সমভিব্যাহারিগণ তাঁহার বিলম্ব দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইতে লাগিল; তাহাদিগের এইরূপ আশঙ্কা হইল যে, নবকুমারকে ব্যাঘ্রে হত্যা করিয়াছে। সম্ভাব্য কাল অতীত হইলে এইরূপই তাহাদিগের হৃদয়ে স্থিরসিদ্ধান্ত হইল; অথচ কাহারও এমন সাহস হইল না যে, তীরে উঠিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া তাঁহার অনুসন্ধান করে।

নৌকারোহিগণ এইরূপে কল্পনা করিতেছিল, ইত্যবসরে জলরাশিমধ্যে ভৈরব কল্লোল উত্থিত হইল। নাবিকেরা বুঝিল যে, জোয়ার আসিতেছে। নাবিকেরা বিশেষ জানিত যে, এ সকল স্থানে জলোচ্ছ্বাসকালে তটদেশে এরূপ প্রচণ্ড তরঙ্গাভিঘাত হয় যে, তখন নৌকাদি তীরবর্ত্তী থাকিলে তাহা খণ্ডখণ্ড হইয়া যায়। এজন্য তাহারা অতিব্যস্তে নৌকার বন্ধন মোচন করিয়া নদী-মধ্যবর্ত্তী হইতে লাগিল। নৌকা মুক্ত হইতে না হইতে সম্মুখস্থ সৈকতভূমি জলপ্লাবিত হইয়া গেল, যাত্রিগণ কেবল ত্রস্তে নৌকায় উঠিতে অবকাশ পাইয়াছিল, তণ্ডুলাদি যাহা যাহা চরে স্থিত হইয়াছিল, তৎসমুদয় ভাসিয়া গেল। দুর্ভাগ্যবশতঃ নাবিকেরা সুনিপুণ নহে, নৌকা সামলাইতে পারিল না; প্রবল জলপ্রবাহ-

বেগে তরণী রসুলপুর নদীর মধ্যে যাইতে লাগিল। এক জন আরোহী কহিল, "নবকুমার রহিল যে!" এক জন নাবিক কহিল, "আঃ, তোর নবকুমার কি আছে? তাকে শিয়ালে খাইয়াছে।"

জলবেগে নৌকা রসুলপুরের নদীর মধ্যে যাইতেছে, প্রত্যাগমন করিতে বিস্তর ক্লেশ হইবে, এইজন্য নাবিকেরা প্রাণপণে তাহার বাহিরে আসিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। এমন কি, সেই মাঘ মাসে তাহাদিগের ললাটে স্বেদস্রুতি বহিতে লাগিল। এইরূপ পরিশ্রম-দ্বারা রসুলপুরের নদীর ভিতর হইতে বাহিরে আসিতে লাগিল বটে, কিন্তু নৌকা যেমন বাহিরে আসিল, অমনি তথাকার প্রবলতর স্রোতে উত্তরমুখী হইয়া তীরবৎ বেগে চলিল, নাবিকেরা তাহার তিলার্দ্ধ মাত্র সংযম করিতে পারিল না। নৌকা আর ফিরিল না।

যখন জলবেগ এমত মন্দীভূত হইয়া আসিল যে, নৌকার গতি সংযত করা যাইতে পারে, তখন যাত্রীরা রসুলপুরের মোহানা অতিক্রম করিয়া অনেক দূর আসিয়াছিলেন। এখন নবকুমারের জন্য প্রত্যাবর্ত্তন করা যাইবে কি না, এ বিষয়ের মীমাংসা আবশ্যক হইল। এই স্থানে বলা আবশ্যক যে, নবকুমারের সহযাত্রীরা তাঁহার প্রতিবেশী মাত্র, কেহই আত্মবন্ধু নহেন। তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে, তথা হইতে প্রতিবর্ত্তন করা আর এক ভাঁটার কর্ম্ম পরে রাত্রি আগত হইবে, আর রাত্রে নৌকা চালনা হইতে পারিবে না, অতএব পরদিনের জোয়ারের প্রতীক্ষা করিতে হইবে। এ কাল পর্য্যন্ত সকলকে অনাহারে থাকিতে হইবে। দুই দিন নিরাহারে সকলের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইবে।

বিশেষ নাবিকেরা প্রতিগমন করিতে অসম্মত; তাহারা কথার বাধ্য নহে; তাহারা বলিতেছে যে, নবকুমারকে ব্যাঘ্রে হত্যা করিয়াছে। তাহাই সম্ভব। তবে এত ক্লেশ-স্বীকার কি জন্য?

এরূপ বিবেচনা করিয়া যাত্রীরা নবকুমার ব্যতীত স্বদেশে গমনই উচিত বিবেচনা করিলেন। নবকুমার সেই ভীষণ সমুদ্র-তীরে বনবাসে বিসর্জ্জিত হইলেন।

ইহা শুনিয়া যদি কেহ প্রতিজ্ঞা করেন, কখনও পরের উপবাস-নিবারণার্থ কাষ্ঠাহরণে যাইবেন না, তবে তিনি উপহাসাস্পদ। আত্মোপকারীকে বনবাসে বিসর্জ্জন করা যাহাদিগের প্রকৃতি, তাহারা চিরকাল আত্মোপকারীকে বনবাস দিবে—কিন্তু যতবার বনবাসিত করুক না কেন, পরের কাষ্ঠাহরণ করা যাহার স্বভাব, সে পুনর্ব্বার পরের কাষ্ঠাহরণে যাইবে। তুমি অধম—তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন?

সেবা পরম ধর্ম্ম

অক্ষয়চন্দ্র সরকার

[১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে চুঁচুড়ায় অক্ষয়চন্দ্র সরকার জন্মগ্রহণ করেন। ইনি 'বঙ্গদর্শনে'র একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন। 'সাধারণী' নামে সাপ্তাহিক এবং 'নবজীবন' নামে মাসিক পত্র ইনি অতি যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন। ওকালতী ছাড়িয়া দিয়া ইনি চিরজীবন সাহিত্যসেবায় আত্ম-নিয়োগ করেন। ইঁহার সাহিত্য-সমালোচনাশক্তি অসাধারণ ছিল। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার প্রণীত 'সনাতনী,' 'কবি হেমচন্দ্র,' 'গোচারণের মাঠ' (যুক্তাক্ষর-বর্জ্জিত ক্ষুদ্র কাব্য), 'মহাপূজা,' 'রূপক ও রহস্য,' 'পিতাপুত্র' প্রভৃতি পুস্তক বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত।]

১

সুখ, দুঃখ দু'টি ভাই ইহজগতে সুখও আছে, দুঃখও আছে। যিনি বলেন, সুখই আছে, দুঃখটা কেবল মায়া বা ভ্রম মাত্র, তাঁহার কথা বুঝি না। যিনি বলেন, দুঃখ না থাকিলে সুখের উপলব্ধিই হইত না, তাঁহার কথা কতকটা বুঝি। যিনি বলেন, দুঃখে হৃদয় সরস হয়, কোমল হয়, নির্ম্মল হয়, পাপজনিত দুঃখে পাপের প্রায়শ্চিত্তের আরম্ভ হয়, ইত্যাদি, তাঁহাকে গুরু বলিয়া মানি—দিন দিন তাঁহার কথা অধিকতররূপে বুঝিবার চেষ্টা করি।

এই দুঃখের নিবৃত্তি-সাধন-জন্য যিনি সুখ-দুঃখ উভয়ই জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত, তাঁহার বীরত্বের পরিচয়ে শিহরিয়া উঠি, কিন্তু কথাটা যেন কেমন কেমন লাগে। যিনি দুঃখের মাত্রা কমাইতে এবং

সুখের মাত্রা বাড়াইতে যত্নবান্, তাঁহাকে আমাদের সমান-ধর্ম্মা বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু যিনি বুঝাইবার চেষ্টা করেন যে, দুঃখেরও তলে তলে ফল্গুস্রোত আছে, তাঁহাকে আবার গুরু বলিয়া মানি—দিন দিন অধিকতররূপে তাঁহার কথা বুঝিবার চেষ্টা করি। পরোপকারী ব্যক্তিগণ মহাপুরুষ, কেন-না তাঁহারা অন্তের সুখের মাত্রা বাড়াইতে এবং দুঃখের মাত্রা কমাইতে নিয়ত অগ্রসর।

কথাটা অন্য ভাবে বলি। আমরা শিক্ষা-বৈগুণ্যে গণনা করিতেও ভুলিয়া যাই। এক দিন ভাত না পাইলে, সেই দুঃখটাকে ৩৬৪ দিনের ভাত-থাওয়ার সুখ হইতে অধিক বলিয়া মনে করি, কাজেই গণনায় ভুল হয়। এই ম্যালেরিয়া-ভারাক্রান্ত প্রদেশের নিভৃত নিকেতনে ভগ্নস্বাস্থ্য-দেহে পড়িয়া পড়িয়া শাদার উপর কাঁলর দাগ চড়াইতেছি—ইহাতেও সুখ বেশী, না দুঃখ বেশী? গণিতে জানিলে, না ভুলিলে দুঃখ অপেক্ষা সুখের পরিমাণ অনন্ত গুণ বেশী। এই চারি দিকের নিবিড় জঙ্গল—হইতে পারে ম্যালেরিয়ার সূতিকাগার, কিন্তু ইহার অনন্ত সৌন্দর্য্য চক্ষুতে ত ধরে না। এ হরিৎ শোভা স্বর্গেও দুর্লভ। আর ঐ কৃষ্ণ-গোকুলে পাখীর গালভরা আওয়াজের প্রাণভরা সম্মোহন—তাহারই কি তুলনা হয় নাকি? আর কৃষ্ণা-রজনীর প্রদোষ-অন্ধকারে যথন আমাদের অতি নিকটস্থ মঙ্গল গ্রহের উজ্জ্বল পিঙ্গল বর্ণচ্ছটা নিকট-প্রতিবেশী নীলাঞ্জননিভ শনিগ্রহকে উপহাস করিয়া প্রকাশ পায়, আর চতুর্দ্দিকে হীরক-চক্ষু টিপি-টিপি মেলিয়া নক্ষত্রসমূহ সেই পরিহাস, উপহাস নিয়ত লক্ষ্য করে, শ্যামাঙ্গীর অঙ্গে সেই সকল জ্যোতিষ্কপুঞ্জের খেলা—এই সকল পর্য্যবেক্ষণের অসীম আনন্দ কি পরিমাণের সামগ্রী?

শিক্ষা-বিভ্রাটে স্বভাবের সুখের ভাণ্ডার আমরা দেখিতে পাই না,—দেখিতে পাইলেও উহার মহত্ত্ব বুঝিতে পারি না, বুঝিতে পারিলেও একটু সামান্য দুঃখের সহিত অনন্ত সুখভাণ্ডারের গণনা করিতে জানি না। গায়ে একটা ব্রণ টন্ টন্ করিলে মনে করি, সংসার শুদ্ধ দুঃখময়! বাস্তবিক গণনা করিলে অতি সহজেই বুঝা যায়, সংসার দুঃখময়—সংসারে দুঃখ আছে বটে, কিন্তু সকলরূপ সুখের সহিত গণনা করিলে দুঃখের মাত্রা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।

সুখ-দুঃখের গণনা সম্বন্ধে আমার নিজের জীবনের ঘটনা হইতে একটি উদাহরণ দিতেছি। আমার যখন বিয়াল্লিশ বৎসর বয়স্ চলিতেছে, তখন দারুণ বিসূচিকা ব্যামোহে এক দিনের পীড়ায় হঠাৎ পিতার মৃত্যু হইল। আমি চারি দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। ক্রমেই আমার চক্ষে সমস্ত কুজ্ঝটিকাময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কুয়াসা অথচ ফাঁকা কুয়াসা—সমস্তই যেন ফাঁকা, আছে অথচ নাই। আমার কোন চিন্তাও নাই, ভাবনাও নাই, যেন আমি বলিয়াই একটা বোধ নাই। পত্নী ছেলেপিলেদের লইয়া ঘরের মধ্যে থাকেন, আমি একাকী বারান্দায় কম্বল-শয্যায় শয়ন করি। দ্বিতীয় রাত্রিতে এক ঘুমের পর চিন্তা আসিল, ভাবিতে লাগিলাম—দেখা যাউক, আমার বয়সী বা আমার অপেক্ষা বয়সে বড়, আমাদের এখানে এমন কয়জনের পিতা বর্ত্তমান আছেন। দুই ঘণ্টা মনে মনে খতিয়ান্ করার পর দেখিলাম, এক জনের মাত্র আছেন। ক্ষণেক চিন্তাহীন অবস্থায় আবার রহিলাম—আপনা-আপনি কখন শ্বাস বন্ধ হইয়াছিল, চিন্তার সঙ্গে শ্বাস

পড়িল। ভাবিলাম, তবে আমি "ভাগ্যহীন" কিসে?—এ ত স্বাভাবিক ঘটনা। সকল সময়েই এইরূপ খতিয়ান্ করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবে যে, বাস্তবিক আমরা প্রকৃত ভাগ্যহীন নহি—সংসার দুঃখময় নয়।

তোমরা বালকেরা গণিত, বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস—সকলই শিখিবে, কিন্তু নিজ নিজ সুখ-দুঃখের পরিমাণ করিতে শিখিবে না—এ অতি বিকৃত শিক্ষা। তোমরা কেবল শুনিতে থাক, দ্রব্যাদি দুর্ম্মূল্য হওয়াতে তোমাদের সংসার অচল হইতেছে, রোগের জ্বালাতে আমাদিগকে অস্থির করিয়াছে, অকাল-মৃত্যুতে শোকের হাহারব গগন বিদীর্ণ করিতেছে—মানুষ সর্ব্বদাই জ্বালাতন হইতেছে, প্রতিবেশীর করুণা নাই, রাজপুরুষের বিচার নাই—এই সকল শুনিতে শুনিতে তোমরা মনে কর, সংসার নরকেরই অর্দ্ধ অঙ্গ এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইলে ধর্ম্মের ভাব সেই হৃদয়ে আর স্থান পায় কি? পায় না।—সংসার যদি নরক, তবে আমরাও সেই নরকের অধিবাসী—নিয়ত কেবল অন্যকে জ্বালাতন করি এবং অন্য কর্ত্তৃক জ্বালাতন হই। সকলেই অপ্রফুল্ল, সকলেই বিষণ্ণ, সকলেই মলিন, সকলেই চিন্তাকুল।

এ সমাজে দুঃখ-কষ্ট নাই? আছে বৈকি; আর সেই দুঃখ সহ্য করিবার শক্তি সকল জাতি অপেক্ষা আমাদের অধিক আছে। রোগ আমাদের অঙ্গের আভরণ। বিসূচিকা, বসন্ত, প্লেগ, বেরিবেরি আমাদের নিত্য-সহচর; আমরা সকলই সহ্য করিতে শিখিয়াছি। আর জানি—লোকের কষ্ট লাঘব করিতে, রোগে-শোকে সেবা করিতে।

২

সুখের মাত্রা বাড়াইবার এবং দুঃখের মাত্রা কমাইবার জন্ম ভাল-মন্দ নানা উপায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। যোগীর যোগ, ভোগীর ভোগ, বিরক্তের বৈরাগ্য, কর্ম্মীর কাম্য কর্ম্ম প্রভৃতি ভাল-মন্দ নানা উপায় একই উদ্দেশ্য-সাধন-জন্য লোকে স্বীয় স্বীয় প্রবৃত্তি-অনুসারে অবলম্বন করিয়া থাকে। কিন্তু কি যোগী, কি ভোগী, কি কর্ম্মী,—আর কি বিরাগী, কি প্রাচীন ঋষিমণ্ডলী, আর কি আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ—সকল-কালে সকলকেই সেবা-ধর্ম্মের গুণগান করিতে দেখা যায়।

অভাব আছে বলিয়াই জগৎ এরূপ বৈচিত্র্যময় হইয়াছে। অভাব না থাকিলে জীব-সৃষ্টি বৃথা হইত। অভাব আছে বলিয়াই অভাব-পূরণের জন্য এত উদ্যম, এত উদ্যোগ। সংসার অভাব-ক্ষেত্র বলিয়াই কর্ম্মক্ষেত্র। অভাব না থাকিলে সকলকেই স্থাণু-স্থাবর হইতে হইত, মনুষ্য-জীবন বিড়ম্বনা হইত।

মহাজ্ঞানিগণ জগৎ হইতে দুঃখ দূর করিবার জন্য ব্যগ্র—মৎকুণকুলের ধ্বংসসাধন করিবার জন্য সমগ্র গৃহ দগ্ধ করিতে হয়, তাহাতেও তাঁহারা প্রস্তুত, দুঃখ নষ্ট করিতে গিয়া জড় পাহাড় হইতে হয়, তাহাতেও তাঁহারা ক্ষুব্ধ নহেন কিন্তু জগতে দুঃখ আছে বলিয়াই ত আমরা সেবার সুবিধা পাইয়াছি। সেবা মানব-জীবনের পরম ধর্ম্ম। দুঃখ আছে বলিয়াই সেই সেবার পাত্র যত্র তত্র সদাকাল ছড়ান' রহিয়াছে। যিনি অন্নদান, বস্ত্রদান, জ্ঞানদান, বিদ্যাদান করেন, তিনি যেমন জগতের বন্ধু, তেমনই দুঃখ আমাদিগকে সেবার পাত্র অজস্র দান করিতেছেন—

তিনিও মানবের পরম বন্ধু। দুঃখকে শত্রু মনে করিও না, দুঃখ আমাদের পরম বন্ধু, মহাগুরু।

সেবা পরম ধর্ম্ম, মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ; অথচ সর্ব্বস্থানে, সর্ব্বকালে, সকল শ্রেণীর মানবের পক্ষে সেবা সুসাধ্য সহজ ধর্ম্ম। তোমাদের মত বালকের পক্ষে বা দীনদুঃখী অজ্ঞমূর্খের পক্ষে ধন বা জ্ঞান দান করিয়া লোকের উপকার করা অসম্ভব। কিন্তু দীনদুঃখীও আর্ত্তের সেবা করিতে পারে, অজ্ঞমূর্খ লোকেও রোগীর শুশ্রূষা করিতে পারে। তোমরা এখন অল্পবুদ্ধি, অপরিস্ফুটশক্তি, অধ্যয়ন-তপস্যারত—কিন্তু তোমরাও অনায়াসে স্বচ্ছন্দে পিতা-মাতা প্রভৃতি গুরুজনের, পরিবারস্থ অন্যান্য স্বজনের, দাসদাসী, প্রতিবেশীর সেবা করিতে পার। সেবায় শিক্ষায় ব্যাঘাত হয় না। সেবানন্দ-ভোগে মনের বল বাড়ে, মনুষ্যত্বের গৌরব অধিকতর বুঝিতে পারা যায়। সেবাপরায়ণ বালক আপন গৌরব বুঝিতে পারিয়া অধিকতর আগ্রহে লেখাপড়া করে, শিক্ষায় মনোযোগ করে। সুতরাং সেবায় শিক্ষার ব্যাঘাত হয় না, সেবায় শিক্ষার সাহায্য হয়। সেবাই আবার একটি চরম শিক্ষা; সেই শিক্ষা যত কিশোর বয়সে আরম্ভ করা যায়, ততই বয়স্-কালে সহজ ও সুগম হয়। সেবাপরায়ণ ব্যক্তি অন্যের দুঃখ লাঘব করে, আপনি পরমানন্দ উপভোগ করে।

বিশেষতঃ বাঙ্গালাদেশে গৃহস্থালির 'জান্' হইতেছে—সেবা ও দান; সুরে সেবা, পঞ্চমে দান। এই সুর-পঞ্চমে জুড়ি মিলাইয়া বাঙ্গালির গৃহস্থালীর গান। একান্নবর্ত্তী পরিবার ভাল কেন?—না ইহাতে আর্ত্তের সেবার সুবিধা হয়; একান্নবর্ত্তী পরিবার ভাল—অনায়াসে দরিদ্রকে অন্নদান করা চলে। পল্লীবাস ভাল—এত

ম্যালেরিয়াতেও ভাল—কেন-না অতিথি-সেবার সুবিধা হয়। এইরূপ, যে দিক্ দিয়াই দেখা যাউক, ঐ সেবা ও দান সকল দিক্ দিয়াই আমাদের লক্ষ্য বলিয়া বুঝা যায়।

আর্ত্তের সেবা করিলে তাহার মুখমণ্ডলে একটু স্বচ্ছন্দতার সহিত কৃতজ্ঞতার যে অপূর্ব্ব জ্যোতি খেলিতে থাকে, তাহা সৌন্দর্য্যের একশেষ। সেবায়মান কৃতজ্ঞের মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য্য ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না—যিনি কখন প্রাণমনে আর্ত্তের সেবা করিয়াছেন, তিনিই তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন। লক্ষ্য করিলে, আমরা বুঝিতে পারি, জগতে দুঃখ-কষ্ট থাকাতে আমাদের কত লাভ হইয়াছে। দুঃখ না থাকিলে সেবার প্রয়োজন হইত না, আমরা পরম ধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত হইতাম। সেবা করিতে জানিলে, আমরা বুঝিতে পারি, মঙ্গলময়ের মঙ্গল বিধানে সুখে-দুঃখে কি অপূর্ব্ব সুন্দর শৃঙ্খলা রহিয়াছে এবং সেই শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য্য হইতে মানবের পরম ধর্ম্ম কিরূপ সংবর্দ্ধনা প্রাপ্ত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র

শিবনাথ শাস্ত্রী

[১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে চব্বিশ-পরগনার অন্তর্গত, চাঙ্গড়িপোতা গ্রামে মাতুলালয়ে শাস্ত্রী মহাশয়ের জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম হরানন্দ বিদ্যাসাগর। ইঁহাদের নিবাস জয়নগর-মজিলপুর। ইনি যৌবনে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং পরে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যপদ প্রাপ্ত হন। ইনি 'মেজবৌ,' 'নয়নতারা' প্রভৃতি উপন্যাস এবং 'নির্ব্বাসিতের বিলাপ,' 'পুষ্পমালা' প্রভৃতি কবিতাপুস্তক প্রণয়ন করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। ইঁহার রচিত 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', একখানি বিশেষ আবশ্যক ও জ্ঞাতব্য তথ্য-পূর্ণ গ্রন্থ। ইঁহার 'আত্মচরিত'ও বাঙ্গালা ভাষার একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ইঁহার মৃত্যু হয়।]

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে নৈহাটির সন্নিহিত কাঁটালপাড়া নামক গ্রামে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বহুদিন ইংরাজ গভর্নমেণ্টের অধীনে ডেপুটী কালেক্টরের কাজ করিতেন।

বাল্যকাল হইতে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজে পাঠ করেন। সেখানে পাঠ করিবার সময়েই তাঁহার বঙ্গ-সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টি পড়ে। সে সময়ে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রাদুর্ভাবের কাল। তখন প্রতিভাশালী ব্যক্তিমাত্রেই সাহিত্যজগতে কিছু করিতে ইচ্ছুক হইলে, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শিষ্যত্ব স্বীকার করিতেন। গুপ্ত-কবিও তখন প্রতিভার উৎসাহদাতা ছিলেন। তিনি অক্ষয়কুমার দত্তের

উৎসাহদাতাদিগের মধ্যেও একজন ছিলেন। কিন্তু কাব্যজগতে" তাঁহার শিষ্যবর্গের মধ্যে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন বসু, দ্বারকানাথ অধিকারী, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি সমধিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তৎকাল-প্রচলিত রীতি-অনুসারে বঙ্কিম প্রথমে 'প্রভাকরে' লিখিয়া কাব্যরচনা অভ্যাস করিতেন। তখন 'প্রভাকরে' উত্তর-প্রত্যুত্তরে কবিতা লেখা যুবক লেখকদিগের একটা মহা উৎসাহের ব্যাপার ছিল। এই সকল বাগ্‌যুদ্ধ "কলেজীয় কবিতাযুদ্ধ" নামে প্রথিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র যৌবনের প্রারম্ভে 'ললিতা ও মানস' নামে একখানি পদ্যগ্রন্থ প্রচার করিয়াছিলেন।

তিনি হুগলী কলেজ হইতে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে গমন করেন, এবং সেখান হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত বি. এ. উপাধি সর্ব্বপ্রথমে প্রাপ্ত হইয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী কর্ম্ম প্রাপ্ত হ'ন।

১৮৬৪ সালে তাঁহার প্রণীত 'দুর্গেশ-নন্দিনী' নামক উপন্যাস মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়। আমরা সে দিনের কথা ভুলিব না। দুর্গেশ-নন্দিনী বঙ্গসমাজে পদার্পণ করিবামাত্র সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল; এ জাতীয় উপন্যাস বাঙ্গালাতে কেহ অগ্রে দেখে নাই। আমরা তৎপূর্ব্বে 'বিজয়-বসন্ত,' 'কামিনীকুমার' প্রভৃতি কতিপয় সেকেলে 'কাদম্বরী'-ধরণের উপন্যাস, গার্হস্থ্য-পুস্তক-প্রচার-সভার প্রকাশিত 'হংসরূপী রাজপুত্র,' 'চকমকির বাক্স' প্রভৃতি কয়েকটি ছোট গল্প, এবং 'আরব্য উপন্যাস' প্রভৃতি কয়েকখানি উপকথা-গ্রন্থ আগ্রহের সহিত পড়িয়া আসিতেছিলাম। 'আলালের ঘরের দুলাল' তাহার মধ্যে একটু নূতন ভাব

আনিয়াছিল। কিন্তু 'দুর্গেশ-নন্দিনী'তে আমরা যাহা দেখিলাম, তাহা অগ্রে কখনও দেখি নাই। এরূপ অদ্ভুত চিত্রণ-শক্তি বাঙ্গালাতে কেহ অগ্রে দেখে নাই; দেখিয়া সকলে চমকিয়া উঠিল, কি বর্ণনার রীতি, কি ভাষার নবীনতা—সকল বিষয়ে বোধ হইল যেন বঙ্কিমবাবু দেশের লোকের রুচি ও প্রবৃত্তির স্রোত পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া লেখনী ধারণ করিয়াছেন।

অল্প দিন পরে 'কপালকুণ্ডলা' দেখা দিল। যে তুলিকা 'দুর্গেশ-নন্দিনী'র নয়নানন্দকর কমনীয়তা চিত্রিত করিয়াছিল, তাহা 'কপালকুণ্ডলা'র গাম্ভীর্য্যরস-পূর্ণ ভাব সৃষ্টি করিল। লোকে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে 'মৃণালিনী,' 'চন্দ্রশেখর,' 'বিষবৃক্ষ,' 'কৃষ্ণকান্তের উইল,' 'আনন্দমঠ,' 'দেবী চৌধুরাণী,' 'কমলাকান্তের দপ্তর' 'সীতারাম,' 'রাজসিংহ' প্রভৃতি আরও অনেকগুলি উপন্যাস প্রকাশিত হওয়ায় বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গীয় ঔপন্যাসিকদিগের শীর্ষস্থান প্রাপ্ত হইলেন।

বঙ্কিমবাবু স্ব-প্রণীত গ্রন্থসকলে এক নূতন বাঙ্গালা গদ্য লিখিবার পদ্ধতি অবলম্বন করিলেন। তাহা এক দিকে বিদ্যা-সাগরী বা অক্ষয়ী ভাষা ও অপর দিকে আলালী ভাষার মধ্যগা। ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া আমার পূজ্যপাদ মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত 'সোমপ্রকাশে' বঙ্কিমবাবু ও তাঁহার অনুকরণকারীদিগের নাম "শবপোড়া-মড়াদাহের দল" রাখিলেন। অভিপ্রায় এই, যাহারা "শব" বলে তাহারা "দাহ" বলে; যাহারা "মড়া" বলে তাহারা তৎসঙ্গে "পোড়া" বলে—কেহই "শব-পোড়া" বা "মড়াদাহ" বলে না। তাঁহার মতে বঙ্কিমী দল ঐরূপ ভাষাব্যবহার-দোষে দোষী। আমরা, সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদল,

সোমপ্রকাশের পক্ষাবলম্বন করিলাম এবং বঙ্কিমী দলকে "শবপোড়া-মড়াদাহের দল" বলিয়া বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করিলাম। বঙ্কিমের দল ছাড়িবেন কেন? তাঁহারা সোমপ্রকাশের ভাষাকে "ভট্টাচার্য্যের চাণা" নাম দিয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন।

১৮৭১ সালে 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হইল। বঙ্কিমের প্রতিভা আর এক আকারে দেখা দিল। (প্রতিভা এমনি জিনিষ, ইহা যাহা-কিছু স্পর্শ করে, তাহাকেই সজীব করে।) বঙ্কিমের প্রতিভা সেইরূপ ছিল। তিনি মাসিক পত্রিকার সম্পাদক হইতে গিয়া এরূপ মাসিক পত্রিকার সৃষ্টি করিলেন, যাহা প্রকাশমাত্র বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে স্থান পাইল তাহার সকলই যেন চিত্তাকর্ষক, সকলই যেন মিষ্ট। বঙ্গদর্শন দেখিতে দেখিতে উদীয়মান সূর্য্যের ন্যায় লোক-চক্ষুর সমক্ষে উঠিয়া পড়িল। বঙ্কিমচন্দ্র যখন বঙ্গদর্শনের সম্পাদক, তখন তিনি রুশোর সাম্যভাবের পক্ষ, উদারনৈতিকের অগ্রগণ্য, এবং বেন্থাম ও মিলের হিতবাদের পক্ষপাতী। তিনি তাঁহার অমৃতময়ী ভাষাতে সাম্য-নীতি এইরূপ করিয়া ব্যাখ্যা করিতেন যে, দেখিয়া যুবকদলের মন মুগ্ধ হইয়া যাইত। কিন্তু দুঃখের বিষয় বঙ্গদর্শন বহুদিন থাকিল না। বঙ্কিমবাবু বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত হওয়াতে তাহা হস্তান্তরে গেল ও সেই সঙ্গে তাহার আকর্ষণও গেল এবং ক্রমে তিরোভাব হইল।

আমাদের দেশের প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের সাধারণ নিয়মানুসারে বঙ্কিমের প্রতিভার শক্তি পঁয়তাল্লিশ বৎসরের পর যেন মন্দীভূত হইয়া আসিল। তৎপরে তিনি যে কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহাদের ভাষা ও চিত্রণ-শক্তির সেই পূর্ব্বেকার

উন্মাদিনী শক্তি নাই, সে সজীবতা নাই। তাঁহার দৃষ্টিও সম্মুখ হইতে পশ্চাৎ দিকে পড়িতে লাগিল।

শেষ কয় বৎসর তিনি ধর্ম্মতত্ত্বের ব্যাখ্যাতে আপনাকে অর্পণ করিয়াছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, এই অবস্থাতে তিনি আপনার প্রকাশিত 'সাম্য' নামক গ্রন্থের প্রচার বন্ধ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। (যাহা হউক, তাঁহার শেষ-প্রচারিত এই নব-ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ ছিল বৃত্তি-নিচয়ের সামঞ্জস্য, এবং শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার আদর্শ পুরুষ।) এই নব-ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য তিনি কৃষ্ণচরিত্র ও ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ে গ্রন্থরচনা করেন।

এ দিকে তিনি গভর্নমেণ্টের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট দলের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম শ্রেণীতে উঠিয়া রাজপ্রসাদের চিহ্ন-স্বরূপ "রায় বাহাদুর" ও "সি.আই.ই" উপাধি প্রাপ্ত হ'ন। ঘরে-পরে এইরূপে সম্মানিত হইয়া ১৮৯৪ সালের ৮ই এপ্রিল দিবসে তিনি ভবধাম পরিত্যাগ করেন। বঙ্কিমবাবু প্রতিভার জ্যোতিতে দেশ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন

ভীলপ্রদেশ

রমেশচন্দ্র দত্ত

[কলিকাতা রামবাগানে প্রসিদ্ধ দত্তপরিবারে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে রমেশচন্দ্র জন্ম-গ্রহণ করেন। কলিকাতায় পাঠ সমাপ্ত করিয়া ইনি বিহারীলাল গুপ্ত ও সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত বিলাত যাত্রা করেন। তথা হইতে আই. সি. এস্. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইান সরকারী কর্ম্মে ব্রতী হ'ন। ইনি কর্ম্মদক্ষতাগুণে বিভাগীয় কমিশনার পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। তৎপরে অবসর গ্রহণ করিয়া বরোদার রাজ-মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। প্রথম যৌবনে ইনি ইংরাজী রচনায় কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছিলেন, পরে বঙ্কিমচন্দ্রের উৎসাহে বাঙ্গালা রচনায় হস্তক্ষেপ করেন এবং একাদিক্রমে 'বঙ্গবিজেতা,' 'মাধবীকঙ্কণ,' 'রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা,' 'মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত' প্রভৃতি পুস্তক রচনা করিয়া যশস্বী হন। নানাভাবে ইঁহার দেশপ্রীতির সুগভীর পরিচয় পাওয়া যায়।]

হল্‌দীঘাটার যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, একদিন অপরাহ্নে তেজসিংহ একাকী ভীলপ্রদেশের মধ্য দিয়া পথ অতিবাহন করিতেছিলেন।

তেজসিংহ যদি নিজ চিন্তায় অভিভূত না থাকিতেন তবে সেই নির্জ্জন ভীলপ্রদেশের শোভা সন্দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইতেন। পথের উভয়পার্শ্বে নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ সহস্র-হস্ত উচ্চ প্রাচীরের ন্যায় পর্ব্বতরাশি উত্থিত হইয়া যেন সেই নির্জ্জন পথকে গোপনে রক্ষা করিতেছে। পর্ব্বতচূড়ায় ও পার্শ্বদেশে অসংখ্য পর্ব্বত-বৃক্ষ ও লতা-পুষ্প বায়ু-হিল্লোলে ক্রীড়া করিতেছে, ও অপরাহ্নের স্তিমিত সূর্য্যালোকে হাস্য করিতেছে। সে সূর্য্যালোক বহুদূর-নীচস্থ

পর্ব্বততলের পথ পর্য্যন্ত পঁহুছিতেছে না। তেজসিংহ যে পথ দিয়া যাইতেছিলেন, সে পথ] অপরাহ্ণেই.|প্রায় অন্ধকারময়। কোন কোন স্থলে উন্নত পর্ব্বতশিখর হইতে সূর্য্যালোক প্রতিফলিত হইয়া সেই পথের উপর ঈষৎ আলোক বিতরণ করিতেছিল; অন্য স্থলে সেই বৃক্ষাচ্ছাদিত পথ একেবারে অন্ধকারময়। সেই নির্জ্জন পথের পার্শ্ব দিয়া একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বত-নদী কল কল শব্দে শিলা-শয্যার উপর দিয়া দ্রুতবেগে গমন করিতেছে—যেন পার্শ্বস্থ প্রহরি-স্বরূপ উন্নত ও কঠোর পর্ব্বতরাশিকে উপহাস করিয়া কোন ক্রীড়াপটু বালিকা হাসিয়া হাসিয়া দৌড়িয়া যাইতেছে। স্থানে স্থানে স্তিমিত দিবালোকে সেই নদীর জল চকমক্ করিতেছে, অন্য স্থানে সে নদীর গতি কেবল শব্দমাত্রে অনুমেয়। সেই উন্নত পর্ব্বতের কঠোর বক্ষ হইতে কোন কোন স্থানে গুচ্ছ গুচ্ছ রৌপ্যসূত্রের ন্যায় নির্ঝরিণী বহিষ্কৃত হইয়া নীচস্থ সেই নদীর সহিত কল কল শব্দে মিশিয়া যাইতেছে। ভীলপ্রদেশের বিস্ময়কর সৌন্দর্য্যের ন্যায় সৌন্দর্য্য জগতের অল্পস্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়; একজন আধুনিক ফরাশীস্ ভ্রমণকারী মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন, ইউরোপের সমস্ত মনোহর স্থল অপেক্ষাও রাজ-স্থানের ভীলপ্রদেশ সুন্দর ও বিস্ময়কর!

তেজসিংহ এইরূপ নির্জ্জন পথ একাকী অতিবাহন করিতে-ছিলেন। পর্ব্বতচূড়ার উপর স্থানে স্থানে ভীলদিগের "পাল" অর্থাৎ নিবাসস্থান দৃষ্ট হইতেছে, নীচের পথ হইতে দেখিলে বোধ হয় যেন মনুষ্যের আবাস নহে, যেন ঈগলপক্ষী নিজ শাবকগুলিকে লালনপালন করিবার জন্য পর্ব্বতচূড়ায় কুলায় নির্ম্মাণ করিয়াছে! প্রত্যেক পালের চতুর্দ্দিকে বা নীচে অল্পমাত্র

ভূমি কর্ষিত, সেই ভূমির উৎপন্ন শস্য ভীলদিগের আহারের অবলম্বন, দ্বিতীয় অবলম্বন বংশানুগত দস্যুতা। স্থানে স্থানে সেই পর্ব্বতচূড়ার উপর, সায়ংকালীন গগনে বিন্যস্ত ভয়ানক প্রতিকৃতির ন্যায়, এক একজন কৃষ্ণবর্ণ শীর্ণকায় কৌপীনধারী ভীল ধনুর্ব্বাণ-হস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে; তাহারা এই নির্জ্জন পথ ও ভীলপ্রদেশের প্রহরী। তেজসিংহের বীরাকৃতি যদি প্রত্যেক ভীলের পরিচিত না হইত, তাহা হইলে সেই প্রত্যেক ধনুকে শর সংযোজিত হইত।

সেই উপত্যকা অতিক্রম করিয়া কতকদূর আসিতে আসিতে তেজসিংহ একটী রমণীয় ও অতি বিস্তীর্ণ হ্রদের কূলে উপনীত হইলেন। পূর্ব্ববর্ণিত পর্ব্বত-নদী সেই স্বচ্ছ সুন্দর পর্ব্বত-হ্রদে আসিয়া মিশিয়াছে। হ্রদের চতুর্দ্দিকে, যতদূর মনুষ্যনয়নে দৃষ্ট হয়, কেবল পর্ব্বতরাশির পর পর্ব্বতরাশি পর্ব্বত-বৃক্ষে আচ্ছাদিত হইয়া সায়ংকালীন গগনে বিস্ময়কর চিত্রের ন্যায় বিন্যস্ত রহিয়াছে। হ্রদের কূলে যাইয়া তেজসিংহ একবার সম্মুখে অবলোকন করিলেন, এবং সেই মনোহর প্রকৃতির শোভা দেখিয়া নিজের চিন্তা একবার ভুলিলেন।

সায়ংকালের লোহিত আলোক সেই হ্রদের জলের উপর পতিত হইয়া কি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। জলের নিস্তব্ধ বক্ষের উপর চারিদিকের উন্নত পর্ব্বতের ছায়া কি সুন্দর পতিত হইয়াছে। এখানে শব্দ নাই, মনুষ্যের গমনাগমন নাই, জীব-আবাসের চিহ্ন মাত্র নাই, যেন প্রকৃতি এই সুন্দর জগৎ-রচয়িতার পূজার জন্য এই উন্নত পর্ব্বতবেষ্টিত, শান্ত, নির্জ্জন, নিঃশব্দ হ্রদ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। তেজসিংহ অনেকক্ষণ নিঃশব্দে সেই চিত্রখানি

দেখিতে লাগিলেন। হ্রদের জলে হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া তেজসিংহ একটী শিলাখণ্ডে উপবেশন করিলেন।

আমরা এই অবসরে সেই অপূর্ব্ব দেশবাসী ভীলদিগের বিষয়ে দুই-একটী কথা বলিব।

ভারতবর্ষের যে সুন্দর প্রদেশে রাজপুতগণ আসিয়া অসিহস্তে আপনাদিগের আবাসস্থান পরিষ্কার করিয়া পরাক্রান্ত রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল, রাজপুতদিগের আগমনের পূর্ব্বে সেই রাজস্থান ভীল-দিগের আবাসস্থান ছিল। যখন রাজপুতগণ আসিয়া উর্ব্বরা ক্ষেত্র ও রম্য উপত্যকাগুলি কাড়িয়া লইল, তখন স্বাধীনতাপ্রিয় ভীলগণ বিন্ধ্যাচল ও আরাবলী পর্ব্বতে যাইয়া আপনাদিগের মান ও স্বাধীনতা রক্ষা করিতে লাগিল। বোধ হয় খ্রীষ্টের জন্মের কিছু পরেই এই সমস্ত ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইয়াছিল।

সেই অবধি ভীল ও রাজপুতদিগের মধ্যে এক অপূর্ব্ব মিত্রতা রহিল। ভীলগণ নাম মাত্র রাজপুত রাজাদিগের অধীনতা স্বীকার করিল, কিন্তু ফলে আপন আপন পর্ব্বতস্থিত পাল-সমূহে বাস করিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিতে লাগিল, এবং অবসরমতে কি রাজপুত কি মুসলমান সকলকেই লুণ্ঠন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতে লাগিল। তথাপি রাজপুত রাণাদিগের সিংহাসন-আরোহণের সময় একজন ভীল-সর্দ্দার রাজনিদর্শনগুলি রাণাকে অর্পণ করিত, এবং রাজপুতদিগের যুদ্ধ ও বিপদের সময় ভীল-যোদ্ধগণ যথাসাধ্য রাজপুতদিগের সহায়তা করিত।

ভারতবর্ষের সমস্ত বর্ব্বরজাতিই হিন্দুদিগের দুই-একটী দেবকে আপন দেব বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে, এবং হিন্দুদেব হইতে আপনাদিগের উৎপত্তি—এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত করিয়াছে।

ভীলগণ কহে—আমরা মহাদেবের তস্কর, মহাদেব-ঔরসে আমাদের জন্ম। মহাদেব একটী অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে একটী বন্য বালিকার সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া তাহাকে বিবাহ করেন। সেই বালিকার গর্ভজাত একটী কৃষ্ণবর্ণ সন্তান কোন একদিন মহাদেবের বৃষকে হত্যা করে, এবং সেই অবধি শাপগ্রস্ত হইয়া ভীলনামে অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করিতে থাকে। আমরা ভীলগণ তাঁহারই সন্তান।

পর্ব্বতের শিখরে ভীলদিগের পাল বা গ্রাম নির্ম্মিত হয়, পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। পালের মধ্যে প্রত্যেক ভীলের গৃহ, এক একটী দুর্গের ন্যায় চারিদিকে কণ্টক- ও বৃক্ষ-দ্বারা বেষ্টিত। এই পাল-সমূহ হইতে হিংস্র পক্ষীর ন্যায় সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হইয়া কৃষি ও বাণিজ্য-ব্যবসায়ী সভ্য জাতিদিগকে লুণ্ঠন করিয়া ভীলগণ বহুশতাব্দী অবধি জীবনধারণ করিয়াছে। শত্রুরা যদি কখন এই পাল আক্রমণ করে, তবে ভীলনারী ও শিশুগণ গো-মহিষাদি লইয়া নিকটস্থ নিবিড়, দুর্ভেদ্য পর্ব্বত ও জঙ্গলে যাইয়া লুকাইয়া থাকে; পুরুষগণ ধনুর্ব্বাণহস্তে বা প্রস্তর-নিক্ষেপ-দ্বারা নিজ নিজ পাল রক্ষা করে।

ভীলদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দল আছে, প্রত্যেক দল নিজ দলপতি বা সর্দ্দারের অধীনে থাকিয়া কার্য্য করে। এই দলের মধ্যে সর্ব্বদাই বিরোধ ও বিবাদ হয়, কিন্তু আবার যুদ্ধ বা বিপৎকালে সকল দল একত্র হয়। তখন তাহাদিগের যুদ্ধরব প্রতি উপত্যকায় শব্দিত হয়, এক পাল হইতে অন্য পালে সংবাদ প্রেরিত হয়; নিশাকালে ব্যাঘ্র, শৃগাল অথবা পক্ষীর রব অনুকরণ করিয়া ভীলগণ সঙ্কেত-দ্বারা সংবাদ প্রেরণ করে, এবং অল্প সময়ের মধ্যে

শত শত যোদ্ধা দলবদ্ধ হইয়া ঐক্যভাবে শত্রু-বিনাশের চেষ্টা করে। রাজস্থানে অদ্যাপি প্রায় বিশ লক্ষ ভীল বাস করে।

ভীলদিগের মধ্যে জাতিভেদ নাই। তাহারা দুই-একটী হিন্দু-দেবকে ও নানারূপ পীড়াকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করে। মৌয়া বৃক্ষকে বিশেষ সমাদর করে, এবং ঐ বৃক্ষ হইতে মদিরা প্রস্তুত করিয়া সেবন করে। পুরুষগণ মধ্যমাকৃতি, কৃষ্ণকায় এবং কার্য্য-গুণে অসাধারণ শারীরিক বল ও ক্ষমতা লাভ করে। স্ত্রীলোকগণ পুরুষ অপেক্ষা ঈষৎ গৌরবর্ণ ও সুশ্রী, এবং হস্তপদে লাক্ষানির্ম্মিত বলয় প্রভৃতি ধারণ করে। বিবাহের রীতি বড় সহজ—নির্দ্দিষ্ট দিবসে গ্রামের সমস্ত যুবক ও কন্যা একত্র হয়, পরে যুবকেরা আপন আপন মনোনীত এক একটী কন্যাকে বাছিয়া লয়।

বর্ব্বর ভীলদিগের দুইটী অসাধারণ গুণ লক্ষিত হয়। তাহাদের উপকার করিলে তাহারা কদাচ তাহা বিস্মৃত হয় না এবং তাহারা বাক্যদান করিলে কদাচ তাহা লঙ্ঘন করে না।

দিল্লীনগরী

রমেশচন্দ্র দত্ত

দিল্লী অদ্য মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে। আরংজীব স্বয়ং জাঁকজমকপ্রিয় ছিলেন না, কিন্তু রাজকার্য্য-সাধনার্থ সময়ে সময়ে জাঁকজমক আবশ্যক, তাহা বিশেষরূপে জানিতেন। অদ্য শিবজী দরিদ্র মহারাষ্ট্র দেশ হইতে বিপুল-অর্থশালী মোগল-রাজধানীতে আসিয়াছেন; মোগলদিগের ক্ষমতা, সম্পত্তি ও অর্থের প্রাচুর্য্য দেখিলে শিবজী আপন হীনতা বুঝিতে পারিবেন, মোগলদিগের সহিত যুদ্ধের অসম্ভাবিতা বুঝিতে পারিবেন, এই উদ্দেশ্যে আরংজীব অদ্য প্রচুর জাঁকজমকের আদেশ দিয়াছিলেন। সম্রাটের আদেশে দিল্লীনগরী উৎসবের দিনে কুলললনার ন্যায় অপূর্ব্ববেশ ধারণ করিয়াছে।

শিবজী ও রামসিংহ একত্র রাজপথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন। পথ দিয়া অসংখ্য অশ্বারোহী ও পদাতিক গমনাগমন করিতেছে, নগর লোকারণ্য হইয়াছে। বণিক্‌গণ বাজারে দোকানে বহুমূল্য পণ্যদ্রব্য রাশি করিয়া রাখিয়াছে, উৎকৃষ্ট বস্ত্র, বহুমূল্য স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কার, অপূর্ব্ব খাদ্যসামগ্রী ও অপর্য্যাপ্ত গৃহানুকরণদ্রব্য দেখিতে দেখিতে শিবজী রাজপথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন। কোথাও গৃহের উপর নিশান উড়িতেছে, কোথাও সুপরিচ্ছদ গৃহস্থেরা বারান্দায় বসিয়া রহিয়াছে, কোথাও বা গবাক্ষ দিয়া কুলকামিনীগণ প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্র-যোদ্ধাকে

দেখিতেছে। পথে অসংখ্য শকট, শিবিকা, হস্তী ও অশ্ব,—রাজা, মন্সবদার, সেখ, আমীর ও ওমরাহগণ সর্ব্বদা গমনাগমন করিতেছে। অশ্বারোহিগণ তীব্রবেগে যেন নগর কাঁপাইয়া যাইতেছে; সুন্দর অলঙ্কার ও রক্তবর্ণ বস্ত্রে মণ্ডিত হইয়া শুঁড় নাড়িতে নাড়িতে গজেন্দ্রগমনে গজেন্দ্রগণ চলিয়া যাইতেছে; শিবিকাবাহকগণ হুহুঙ্কার শব্দে যেন আরোহীর পদমর্য্যাদা প্রচার করিয়া চলিয়া যাইতেছে। শিবজী এরূপ নগর কখনও দেখেন নাই, কোথায় পুনা বা রায়গড়!

যাইতে যাইতে রামসিংহ দূরে তিনটি শ্বেত গম্বুজ দেখাইয়া বলিলেন, "ঐ দেখুন, জুম্মা মস্‌জীদ। সম্রাট্ শাজিহান জগতের অর্থ একত্র করিয়া ঐ উন্নত প্রশস্ত মস্‌জীদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, ওরূপ মস্‌জীদ জগতে আর নাই।"

শিবজী বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে দেখিলেন, রক্তবর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত মস্‌জীদের প্রাচীর বিস্তীর্ণ স্থান ব্যাপিয়া শোভা পাইতেছে, তাহার উপর সুন্দর শ্বেত-প্রস্তর-বিনির্ম্মিত তিনটি গম্বুজ ও দুই দিকে দুই মিনার যেন গগন ভেদ করিয়া উঠিয়াছে।

এই অপরূপ মস্‌জীদের সম্মুখেই রাজপ্রাসাদ ও দুর্গের বিস্তীর্ণ রক্তবর্ণ প্রস্তর-বিনির্ম্মিত প্রাচীর দৃষ্ট হইল। দুর্গের পশ্চাতে যমুনা নদী, সম্মুখে বিস্তীর্ণ রাজপথ শব্দপূর্ণ ও লোকারণ্য। সেই স্থানের ন্যায় সমারোহপূর্ণ আর একটি স্থানও ভারতবর্ষে ছিল না, জগতে ছিল কি না সন্দেহ। দুর্গের প্রাচীরের উপর শত শত নিশান বায়ুপথে উড়িতেছে, যেন জগতে মোগলসম্রাটের ক্ষমতা ও গৌরব প্রকাশ করিতেছে। দুর্গদ্বারে একজন প্রধান মন্সবদারের প্রশস্ত শিবির, মন্সবদার দুর্গদ্বার রক্ষা করিতেছেন। দুর্গের

বাহিরে সেনা রেখায় রেখায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে, বন্দুকের কিরীচ-শ্রেণী সূর্য্যালোকে ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছে, প্রত্যেক কিরীচ হইতে রক্তবস্ত্রের নিশান বায়ুমার্গে উড়িতেছে। দুর্গসম্মুখে অসংখ্য লোক অসংখ্য প্রকার দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করিতে আসিয়াছে, দুর্গ-প্রাচার হইতে মস্‌জীদ-প্রাচীর পর্য্যন্ত সমস্ত পথ শব্দপূর্ণ ও লোকপূর্ণ। অশ্বারোহী, গজারোহী ও শিবিকারোহী, ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান পদাভিষিক্ত পুরুষগণ, বহুলোকে সমন্বিত হইয়া বহু সমারোহে সর্ব্বদাই দুর্গদ্বারের ভিতরে যাইতেছেন বা বাহিরে আসিতেছেন। তাঁহাদিগের পরিচ্ছদ-শোভায় নয়ন ঝলসিয়া যাইতেছে, লোকের কলরবে কর্ণ বিদীর্ণ হইতেছে। সকল শব্দকে নিমগ্ন করিয়া মধ্যে মধ্যে দুর্গের মধ্য হইতে কামানের শব্দ নগর কম্পিত করিতেছে ও রাজাধিরাজ আলম্‌গীরের অর্থাৎ জগতের অধিপতির ক্ষমতাবার্ত্তা জগৎ-সংসারে প্রচার করিতেছে। বিস্ময়োৎফুল্ল-লোচনে অনেকক্ষণ এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া অবশেষে শিবজী রামসিংহের সহিত দুর্গদ্বার অতিক্রম করিয়া দুর্গে প্রবেশ করিলেন।

প্রবেশ করিয়া শিবজী যাহা দেখিলেন, তাহাতে আরও বিস্মিত হইলেন। চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ "কারখানা"য় অসংখ্য শিল্প-কারগণ রাজ-ব্যবহার্য্য নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে; অপূর্ব্ব সুবর্ণ- ও রৌপ্য-খচিত বস্ত্র, মলমল, মসলিন বা ছিট; বহুমূল্য গালিচা, চন্দ্রাতপ, তাম্বু বা পর্দ্দা; সুন্দর পরিধেয় উষ্ণীষ, শাল বা গাত্রাবরণ; অপরূপ সুবর্ণ ও মণিমাণিক্যের বেগম-পরিধেয় অলঙ্কার; সুন্দর চিত্র, সুন্দর কারুকার্য্য, সুন্দর শ্বেত-প্রস্তরের গৃহানুকরণ দ্রব্য; রাশিরাশি নীল, পীত, রক্তবর্ণ বা হরিদ্বর্ণ প্রস্তরের নানারূপ খেলনা-দ্রব্য; কত বর্ণনা করিব। ভারতবর্ষে

যত অপূর্ব্ব শিল্পকার ছিল, সম্রাট্-আদেশে তাহারা মাসিক বেতন পাইয়া প্রতিদিন দুর্গে কার্য্য করিতে আসিত। সম্রাট্ রাজ-কার্য্যার্থ বা নিজ প্রয়োজনের জন্য যে-কোন বস্তু আবশ্যক বোধ করিতেন, বিলাসপ্রিয়া বেগমগণ যতরূপ অপূর্ব্ব দ্রব্য আদেশ করিতেন, প্রাসাদবাসীদিগের যত প্রকার সামগ্রী প্রয়োজন হইত, তৎসমস্তই এই স্থানে প্রস্তুত হইত।

শিবজী এ সমস্ত দেখিবার সময় পাইলেন না। অসংখ্য লোকের মধ্য দিয়া "দেওয়ান-আম" নামক উন্নত প্রশস্ত রক্তবর্ণ-প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রাসাদের নিকট আসিলেন। সম্রাট্ সচরাচর এই স্থানে সভার অধিবেশন করিতেন, কিন্তু অদ্য যেন শিবজীকে প্রাসাদের সমস্ত গৌরব দেখাইবার জন্যই সুন্দর শ্বেত-প্রস্তর-নির্ম্মিত, নানারূপ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত এবং জগতে অতুল্য "দেওয়ান-খাস" নামক প্রাসাদে সভার অধিবেশন করিয়াছিলেন। শিবজী সেই স্থানে যাইয়া দেখিলেন, প্রাসাদের ভিতর রত্ন-মাণিক্য-বিনির্ম্মিত সূর্য্যরশ্মি-প্রতিঘাতী ময়ূর-সিংহাসনের উপর সম্রাট্ আরংজীব উপবেশন করিয়া আছেন। সম্রাটের চারিদিকে রৌপ্য-নির্ম্মিত রেল, রেলের বাহিরে ভারতবর্ষের অগ্রগণ্য রাজা, মনসবদার, ওমরাহ ও সেনাপতিগণ নিঃশব্দে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।

রামসিংহ শিবজীর পরিচয়-দান করিয়া রাজসদনে উপস্থিত হইলেন।

বাল্মীকির জয়

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

[১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে চব্বিশ-পরগণার নৈহাটি গ্রামের প্রসিদ্ধ ভট্টাচার্য্য-বংশে শাস্ত্রী মহাশয়ের জন্ম হয়। ইনি সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন এবং তথা হইতে এম.এ. পরীক্ষা পাস করিয়া উত্তর-কালে ঐ কলেজের অধ্যক্ষের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ইনি কিছুদিন এসিয়াটিক সোসাইটির সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন। সরকারী চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ইনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ও সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক হইয়াছিলেন। ইনি প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য, ভারতীয় পুরাতত্ত্ব এবং সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে বহু মৌলিক গবেষণা করিয়াছিলেন। প্রত্নতত্ত্বের গবেষণা-দ্বারা শাস্ত্রী মহাশয় প্রভূত যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। গভর্নমেণ্ট ইঁহাকে "মহামহোপাধ্যায়" ও "সি.আই.ই." উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। এসিয়াটিক সোসাইটি ইঁহাকে "ফেলো" করিয়াছিলেন; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইঁহাকে "ডি লিট্." উপাধি দিয়াছিলেন; এবং গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ার্‌লণ্ডের রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটি "অনররি মেম্বর" করিয়া ইঁহাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। ইঁহার রচিত 'বাল্মীকির জয়,' 'ভারত মহিলা' প্রভৃতি পুস্তক মধুর কবিত্বপূর্ণ ভাষার জন্য সর্ব্বত্র আদর লাভ করিয়াছে। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ইনি পরলোক-গমন করেন।]

১

আজ কৌশাম্বীনাথ যজ্ঞ করিবেন, তথায় সমস্ত ভূচর, খেচর, উভচর প্রভৃতি সমস্ত প্রাণী আহূত হইয়াছে। যজ্ঞ সংবৎসরব্যাপী,

কৌশাম্বীর চতুর্দ্দিকস্থ বিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্র লোকে লোকারণ্য। কিন্তু মন কাহারও স্থির নহে। এরূপ অগাধ জনসমুদ্রমধ্যে যখন চারি দিকে এরূপ শত্রুতা ও বৈরিতা, তখন একটুতেই প্রলয়কাণ্ড বাধিয়া উঠিতে পারে। বাস্তবিক বাধিয়াও উঠিল। কৌশাম্বীনাথ সূর্য্যবংশীয় নরপতি, ব্রাহ্মণপক্ষপাতী; তিনি বশিষ্ঠকে আপন পুরোহিত নিযুক্ত করিলেন। অমনি বিশ্বামিত্রের দল ও পরশুরামের দল ক্ষেপিয়া উঠিল। বিশ্বামিত্রের মন্ত্রী খর-দূষণ ও বালিরাজকে সঙ্গী পাইলেন। তিনি অনেক দিবসাবধি বহুসংখ্যক প্রবলপরাক্রম দস্যুদলপতিকে অর্থ-দ্বারা বশ করিয়াছিলেন। তাহারা আসিয়া তাঁহার সহিত যোগ দিল। বশিষ্ঠপক্ষীয় ব্রাহ্মণ এবং অযোধ্যা ও মিথিলার রাজগণ যজ্ঞরক্ষার্থ বদ্ধপরিকর হইলেন। বশিষ্ঠের আশ্রিত পারদ-হূনাদিজাতিও তাঁহার রক্ষার্থ অস্ত্র ধরিয়া যজ্ঞস্থলে উপস্থিত রহিলেন। এরূপ স্থলে শান্তিরাজ্যপতি গুহকও নিজ দল সঙ্গে উপস্থিত আছেন। তাঁহার প্রথম চেষ্টা মিটাইয়া দিবেন, শেষ অন্ততঃ যুদ্ধ রহিত করিবেন; না হয়, অন্যায়পক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করিবেন। আর বাল্মীকি কাঁদিয়া কাঁদিয়া সকলের হাত ধরিয়া বেড়াইতেছেন। কেহই তাঁহাকে মানিতেছে না। বাল্মীকির কান্নায় পাষাণ-হৃদয়ও দ্রব হয়; কিন্তু যাহারা রাজনীতিজ্ঞ, যাহারা উচ্চতর জাতি, যাহারা সভ্য বলিয়া গর্ব্ব করে, যাহারা আপন প্রভুত্ব বজায় রাখিবার জন্য আপন প্রিয়তম স্ত্রীপুত্রেরও গলায় ছুরি দিতে কুণ্ঠিত হয় না, তাহাদের মন পাষাণ-অপেক্ষাও কঠিনতর উপাদানে নির্ম্মিত। মানুষ লইয়া যাহারা খেলা করে, আপন সামান্য কার্য্যসাধনার্থ যাহারা লক্ষ লক্ষ মানুষের সর্ব্বনাশ, এমন কি প্রাণনাশ

করিতে এতটুকু সঙ্কোচ করে না, তাহাদের কি কান্নায় মন গলে? গলুক আর নাই গলুক, বাল্মীকির বিশ্রাম নাই।

তিনি একবার বশিষ্ঠের নিকট যাইতেছেন, একবার খর-দূষণের হাত ধরিতেছেন। সেনাগণ, সমবেত লোকগণ তাঁহার কান্নায় অধীর হইতেছে, কিন্তু বড়লোক রাজনীতিজ্ঞ একেবারে দয়া-মায়া-শূন্য—দৃক্‌পাতও করিতেছেন না। শেষে বশিষ্ঠ হুকুম দিলেন, বেদীতে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বালিত কর। অধ্বর্য্যুগণ বেদীতে আরোহণ করিলেন। বাল্মীকির ভরসা নির্ম্মূল হইল। তিনি কাঁদিয়া গুহকের সম্মুখে গড়াইয়া পড়িলেন। গুহক তাঁহাকে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন। সকলেই জানে যজ্ঞাগ্নি জ্বলিলেই রক্তস্রোত চলিতে আরম্ভ করিবে। বেদীতে ব্রাহ্মণ উঠিয়াছে শুনিয়াই বিরোধী দল সজ্জিত হইয়া বেদীর পার্শ্বে দাঁড়াইল। যাজ্ঞিকদল তাহাদিগকে দূর করিয়া দিবার জন্য অপর পার্শ্বে দাঁড়াইল। গুহক ঠিক সম্মুখে—যে, প্রয়োজন হইলে একেবারে মধ্যস্থলে আসিয়া পড়িতে পারেন। বাল্মীকি বেদীতে উঠিয়া ব্রাহ্মণদিগের হস্ত হইতে অগ্নি কাড়িয়া লইলেন; শেষে নিজে কুণ্ডের মধ্যে বসিয়া রহিলেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে টানিয়া বেদীর বাহির করিয়া দিল। তিনি আর আসিতে না পারেন, এ জন্য তিন শত সদস্য তাঁহার হস্তপদাদি বন্ধন করিতে উদ্যত হইল। একটা মহা-গোলযোগ বাধিয়া গেল। ব্রাহ্মণেরা আবার অগ্নি জ্বালিবার উদ্যোগ করিল।

কিন্তু এ কি হইল, অকস্মাৎ কোথা হইতে কয়েক বিন্দু জল ব্রাহ্মণদিগের গায়ে পড়িল? উপরে মেঘ নাই, অথচ জল পড়িল। জল নিশ্চয়ই অশুচি হইবে সিদ্ধান্ত করিয়া, ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগকে

অশুচি বিবেচনা করিয়া স্নানাদি করিয়া শুচি হইবার জন্য প্রস্থান করিল। কয়েক মুহূর্ত্ত মহাপ্রলয় বন্ধ রহিল। সকলেরই মনে কেমন একটা আলৌকিক ভাবের উদয় হইল। কি হইবে ভয়ে সকলেই ভীত হইল। সকলেই জানিল শীঘ্রই যাহা হউক একটা ঘোরতর যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হইবে।

২

ঘুরিতে ঘুরিতে বিশ্বামিত্র পড়িতেছেন। ক্রমে ব্রহ্মার কৌশলে সেই অবস্থায় তাঁহার জ্ঞান হইল। জ্ঞান হইলে তাঁহার মনের ভাব কি হইল, মানুষে কি লিখিবে? একবার ভাবিলেন, আমি কোথায়? একবার চক্ষু মেলিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলেন। দেখিলেন, পুনর্ব্বার চক্ষু মুদ্রিত হইল, আবার অজ্ঞান। আবার জ্ঞান হইল। আবার অজ্ঞান। আবার জ্ঞান হইল। আবার অজ্ঞান। একবার ভাবিলেন, কোথায় যাইতেছি? একবার মনে করিলেন, বুঝি নরক নিকটে। ভয়ে ভীত হইয়া আবার অজ্ঞান হইলেন।

একবার ভাবিলেন, আমার সৃষ্টি কোথায়? আবার অজ্ঞান। আবার ভাবিলেন, তাহা ত গিয়াছে। তখন ভাবিলেন, যদি পৃথিবীতে থাকিতাম,—আবার অজ্ঞান। কেন দুরাকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলাম,—কেন বড় হইতে গিয়াছিলাম—কেন তপ করিতে গিয়াছিলাম—কেন দিগ্বিজয় করিতে গিয়াছিলাম—কেন সব হারাইলাম! এখন কোথায় যাইতেছি, জানি না। ফিরিবার শক্তি নাই। চাহিবার শক্তি নাই। ভাবিতে ভাবিতে বিশ্বামিত্র কাঁদিয়া ফেলিলেন। সেই দরবিগলিত অশ্রুধারা ব্রাহ্মণদিগের গায়ে

পড়িল। রোদনে শরীর আরও ক্ষীণ হইল। আবার অজ্ঞান হইলেন। অজ্ঞান হইয়া বোধ হইল, ঋভুগণ গান করিতেছে, আর সব ভাই ভাই গাইতেছে,—বলিতেছে, মানুষ যদি মানুষের উপর কর্ত্তা হইতে না চাহিত, তবে কত দিন সব ভাই ভাই হইয়া যাইত। রাজা যদি আপন কাজ করিত, কত দিন সব ভাই ভাই হইয়া যাইত। এই গান শুনিতেছেন, আর মনের ভিতর তলায় যে মন আছে, সেখানে দুরাকাঙ্ক্ষাকে স্থান দিব না প্রতিজ্ঞা করিতেছেন। এমন সময়ে চৈতন্য হইল। তখন চেতন-অবস্থায় কেবল পরহিতে জীবন উৎসর্গ করিব প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, আবার অজ্ঞান হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে পড়িতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণেরা ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, অগ্নি জ্বালিবার জন্য যে কুণ্ড প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে প্রকাণ্ড মনুষ্যাকার কি একটা পদার্থ উপর হইতে পড়িতেছে। সকলেই সেই দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ভয়ে সকলের আত্মাপুরুষ শুষ্ক হইয়া গেল। সমস্ত লোক এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময় ও ভয়ে অভিভূত হইয়া বাক্‌শক্তি-শূন্য হইয়া রহিল। যাহারা বাল্মীকিকে ধরিয়া রাখিয়াছিল, তাহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল। বাল্মীকি দৌড়িয়া যজ্ঞকুণ্ডাভিমুখে গমন করিয়া দেখিলেন, একটি প্রকাণ্ড পুরুষ তথায় পড়িয়া আছেন। বাল্মীকি অলৌকিক শক্তিবলে জানিতে পারিলেন, কুণ্ডস্থ মৃতপ্রায় দেহপিণ্ড বিশ্বামিত্র; তখন তাঁহার ক্রন্দনের অবধি রহিল না। তাঁহার বীণা একেবারে অতিকরুণ স্বরে গান ধরিল। নয়নজলে তাঁহার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তিনি বলিলেন, "তোরা দেখ্, তোরা তুচ্ছ মানব, তোরা সামান্য—দেখ দেখি, যে বিশ্বামিত্র পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছে, যে বিশ্বামিত্র

ব্রহ্মারও উপর হইয়াছিল, দেখ্ রে, নিয়তির বলে তাহার কি হইয়াছে! দেখ্ একবার সেই বিশাল বীর—সেই প্রকাণ্ড তপস্বী—সেই অদ্ভুত মনুষ্য—তাহার কি দশা হইয়াছে। দেখ্ দেখি রে,—তোরা সামান্য সুখে-দুঃখে পাগল—দেখ্, বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি আজি ধ্বংস হইয়াছে, তাহার ব্রহ্মত্ব গিয়াছে, তাহার যা ছিল, সে যে মনুষ্য হইয়া জন্মিয়াছিল, এখন বুঝি তাহাও নাই, এখন বুঝি তাহার জীবনও নাই। ভাব্ দেখি, বিশ্বামিত্রের কি কষ্ট! যখন বিশ্বামিত্র—তাহারই এই দশা, তখন ভাব্ দেখি, তোদের কি হইয়াছে! তখন মনে কর্ দেখি, তোদের কি হইবে! ঐ দেখ্, ব্রহ্মা আজি বিশ্বামিত্রের জন্য কাঁদিয়া আকুল! যে বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের হাতে এত লাঞ্ছনা পাইয়াছে, আজি সে-ও কাঁদিয়া আকুল হইতেছে। অতএব তোরা ঝগড়াবিবাদ ত্যাগ কর্, তোরা স্থির হইয়া থাক্। জীবন দিন কত বই নয়।"

সকলেই নীরব হইয়া বাল্মীকির করুণ বীণাঝঙ্কার শুনিতে লাগিল। সকলের মন গলিয়া গেল। সকলেরই মনে অনুতাপ উপস্থিত হইল। সকলেই কাঁদিয়া আকুল হইল। অস্ত্র-শস্ত্র, বিবাদ-বচসা ত্যাগ করিল। ক্রমে তাহাদের মন ফিরিল।

এ দিকে ক্রমে বিশ্বামিত্রের সংজ্ঞা হইতে লাগিল। বীণাঝঙ্কার দূরস্থ সঙ্গীত-ধ্বনির ন্যায় তাঁহার কর্ণে লাগিতে লাগিল। তিনি মূর্চ্ছিত, কত ভীষণ স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। ক্রমে শরীর শীতল হইতে লাগিল। অনেকক্ষণের পর বিশ্বামিত্র চক্ষু মেলিলেন। বাল্মীকির গান চলিতে লাগিল। গানের মৃদুমন্দ তিরস্কার ও দয়া-ভিক্ষা বিশ্বামিত্রের মনে শর-বৎ বিঁধিতে লাগিল। তিনি চক্ষু উন্মীলিত করিয়াই সম্মুখে দেখিলেন ব্রহ্মা। ক্রমে সমবেত

জনগণমধ্যে ব্রহ্মার মূর্ত্তি আবির্ভূত হইল। সঙ্গে দেবর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিগণও আবির্ভূত হইলেন। নয়নজলে শরীর স্নাত হইতেছে। তিনি যোড়-করে ব্রহ্মার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং কাঁদিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ কোলে করিয়া লইলেন। তাঁহার মুখচুম্বন ও গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "বৎস, আজি তুমি ব্রাহ্মণ হইলে।"

বিশ্বামিত্র আবার কাঁদিয়া তাঁহার পায়ে পড়িলেন, বাল্মীকির গান চলিতে লাগিল। বিশ্বামিত্র ব্রহ্মার দয়ায় মুগ্ধ হইয়া কহিলেন, "দেব, আমি কোথায়?" ব্রহ্মা বলিলেন, "পৃথিবীতে। তোমার যন্ত্রণার আমি অবসান করিয়া দিতেছি," বলিয়া নিজে কমণ্ডলুস্থিত স্বর্গীয় বারিবর্ষণে বিশ্বামিত্রের শরীরে বল প্রদান করিলেন। বিশ্বামিত্র দাঁড়াইয়া উঠিয়া দেখিলেন, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড রোদন করিতেছে, আর একজন গায়ক গান করিতেছে। বশিষ্ঠ দৌড়িয়া আসিয়া বিশ্বামিত্রকে আলিঙ্গন করিলেন। আজি বিশ্বামিত্রের দুর্দ্দিনে তাঁহার দয়া হইয়াছে। আর সে ভাব নাই। যে ভাবে একদিন বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণ হইতে দেন নাই, সে ভাব আর নাই। কঠিনতা গলিয়া কোমল হইয়া গিয়াছে। স্বয়ং স্বহস্তে উপবীত লইয়া মন্ত্রপূত করত বিশ্বামিত্রের গলে দিলেন; বলিলেন, "ভাই রে, আজি তোর আমার এক হইলাম। আজি তুই বামণ হইলি। আয় দুজনে কোলাকুলি করি।" বিশ্বামিত্র বলিলেন, "দেব, আমি না বুঝিয়া সৌভাগ্যমদে মত্ত হইয়া তোমায় অনেক কষ্ট দিয়াছি, অনেক যন্ত্রণা দিয়াছি, অনেক কটূক্তি করিয়াছি। আজি আমার বিপদে তোমার চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে। তোমার দুঃখে কিন্তু আমি এক দিনও কাঁদি নাই।

আজি তোমার করুণা দেখিয়া আমার নয়নজল প্রথম পড়িল। জানিলাম, 'ব্রাহ্মণ বড়ই দয়ালু।' আর ব্রহ্মন্, তুমি সৃষ্টিকর্ত্তা, তোমায় কত কটূক্তি করিয়াছি, তোমায় কারাগারে শৃঙ্খল-বদ্ধ করিতে গিয়াছিলাম। আজি আমার বিপদে তুমি আমার প্রাণ দিলে। তোমার করুণা অপার!" ব্রহ্মা বলিলেন, "বৎস, তোমার ন্যায় প্রকাণ্ড পুরুষকে ক্ষমা না করিলে সৃষ্টিকর্ত্তার ক্ষমাগুণ বৃথা মাত্র।"

বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের দেখাদেখি ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় সব যুদ্ধসজ্জা ত্যাগ করিয়া কোলাকুলি আরম্ভ করিল। সকলে আপনার মনোগত দুরভিসন্ধি ব্যক্ত করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। গুহক-চণ্ডাল ভয়ানক সময় আশঙ্কা করিতেছিলেন, তাহার এই শুভ পরিণাম দেখিয়া আহ্লাদে ঊর্দ্ধনৃত্য করিতে লাগিলেন। কৌশাম্বীনাথ যজ্ঞের এই পরিণাম দেখিয়া প্রথমে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন, পরে দেখিয়া শুনিয়া আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া ভাণ্ডার-স্থিত যজ্ঞার্থ-আহৃত প্রচুর সামগ্রী বিশ্বামিত্রের উপনয়ন-উপলক্ষে অকাতরে দান করিতে লাগিলেন। আর বাল্মীকি আহ্লাদে নৃত্য করিতেছেন, ভাই ভাই গাইতেছেন, আর যাহাকে পাইতেছেন গাঢ় আলিঙ্গন করিতেছেন,—স্পৃশ্য, অস্পৃশ্য, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ম্লেচ্ছ, যবন, রাক্ষস, বানর—কিছু জ্ঞান নাই। শেষে নাচিতে নাচিতে, গাইতে গাইতে আসিয়া ব্রহ্মাকে আলিঙ্গন করিলেন। তারপর ব্রহ্মা বলিয়া চিনিতে পারিয়া একটু অপ্রতিভ হইবার জোগাড় করিতেছেন, এমন সময়ে ব্রহ্মা তাঁহাকে পুনরায় আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "বাল্মীকি, আজি তোমারই জয়!" বশিষ্ঠ দূর হইতে আসিয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,

"বাল্মীকি, আজি তোমারই জয়।" বিশ্বামিত্র আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "আজি তোমারই জয়!" চারি দিক্ হইতে "জয় বাল্মীকির জয়" ধ্বনি উঠিতে লাগিল। গুহকের লোক চীৎকার করিয়া উঠিল, "জয় বাল্মীকির জয়। জয় বাল্মীকির জয়!" দিগন্ত হইতে প্রতিধ্বনি আসিল, "জয় বাল্মীকির জয়!"

মধুসূদনের বাল্যকাল

যোগীন্দ্রনাথ বসু

[ডায়মণ্ড হারবার মহকুমায় ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে যোগীন্দ্রনাথ বসুর জন্ম হয়। ইনি শিশুদিগের জন্য অনেক কবিতা লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে 'ভারতবর্ষের মানচিত্র' নামক কবিতাটিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'পৃথ্বীরাজ' নামক বৃহৎ কাব্য রচনার পর ইনি 'কবিভূষণ' উপাধি লাভ করেন। কিন্তু 'মাইকেল মধুসূদনের জীবনচরিত'ই ইঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি দেহত্যাগ করিয়াছেন।]

উচ্চাভিলাষই মহত্বের ভিত্তিভূমি। উচ্চাকাঙ্ক্ষা ব্যতীত জ্ঞান, ধর্ম্ম, অর্থ কোন বিষয়েই মনুষ্য শ্রেষ্ঠতা লাভে সমর্থ হয় না। মহত্ত্ববীজ এই উচ্চাভিলাষ বাল্য হইতেই মধুসূদনের প্রকৃতিতে লক্ষিত হইত। সমকালবর্ত্তী লেখকগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইব, পূর্ণবয়সে ইহাই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল, এবং যতদিন না তাঁহার সে আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইয়াছিল, ততদিন তিনি নিরস্ত হন নাই। তাঁহার বাল্যের উচ্চাভিলাষ, তাঁহার বুদ্ধিমতী জননীর উৎসাহ-বাক্যে এবং তাঁহার পিতার আদর্শে সম্যক্ পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। তাঁহার জননী অতি সম্ভ্রান্ত গৃহের দুহিতা ছিলেন। পিতৃকুলের সম্ভ্রমে এবং কৃতী স্বামীর ও প্রতিভাবান্ পুত্রের গৌরবে তিনি আপনাকে গৌরবান্বিতা মনে করিতেন। সাধারণ নারীগণের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর প্রবৃত্তি তাঁহার হৃদয়ে

স্থান প্রাপ্ত হইত না। মহদ্বংশে জন্মগ্রহণ করিলে যে মহদভিলাষ মনুষ্যের হৃদয়ে, স্বভাবতঃ উদিত হইয়া থাকে, জাহ্নবী দাসী মেধাবী পুত্রের হৃদয়ে তাহা বদ্ধমূল করিবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন। মধুসূদনের পিতাও তাঁহার সমসাময়িকদিগের মধ্যে একজন প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যবহারাজীব ছিলেন। পিতার সম্ভ্রম ও কৃতিত্ব বালক মধুসূদনকে মহত্বলাভে প্রণোদিত করিত। সেই জন্য লেখাপড়া-সম্বন্ধে তাঁহাকে, কোন দিন, কাহারও তাড়না সহ্য করিতে হয় নাই। নিজের উচ্চাভিলাষ ও আন্তরিক বিদ্যানুরাগ গুণেই তিনি বঙ্গদেশের একজন অগ্রগণ্য বিদ্বান্ হইয়াছিলেন। কি পঠদ্দশায়, কি শিক্ষকতা-কার্য্যের সময়, কি ব্যারিষ্টার-অবস্থায়, কখনই মধুসূদন বিদ্যোপার্জ্জন-সম্বন্ধে অযত্ন প্রকাশ করেন নাই। ছাত্রাবস্থায় হিন্দুকলেজে থাকিতে তিনি যেমন যত্নসহকারে গ্রন্থাভ্যাস করিতেন, মান্দ্রাজে শিক্ষকতা-কার্য্য করিবার সময়েও তেমনই করিতেন। মান্দ্রাজে থাকিতে তেলুগু, তামিল, হিব্রু ও সংস্কৃত ভাষা এবং ফ্রান্সে থাকিতে ফরাসী, জর্ম্মান ও ইতালীয় প্রভৃতি ভাষা শিক্ষার জন্য তিনি দেহ, মন নিয়োজিত করিয়াছিলেন। কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকালয় এবং লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ম, যখনই যেখানে সুবিধা পাইয়াছিলেন, তখনই সেখান হইতে গ্রন্থরাশি আনাইয়া, নিজের জ্ঞান-পিপাসা পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। রোগ, দরিদ্রতা, পারিবারিক অশান্তি প্রভৃতি যে সকল বিঘ্ন মনুষ্যের জ্ঞান-লালসা বিশুষ্ক করিয়া দেয়, মধুসূদনের জীবনে তাহার কোনটারই অভাব ছিল না; কিন্তু নিত্যপ্রবহণশীল উৎসের ন্যায় তাঁহার জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহা সংসারের কঠোর নিদাঘতাপের মধ্যেও, তাঁহার হৃদয় হইতে

নিরন্তর নিঃসৃত হইত। এই জ্ঞানার্জনস্পৃহা এবং কাব্যানুরক্তি-সম্বন্ধে তিনি তাঁহার কোন সম্ভ্রান্ত বন্ধুকে এইরূপ লিখিয়াছিলেন,—

"এ ধরার কর্ম্মভার মন বেদনিলে,
কার কর-পদ্ম-স্পর্শে সারে সে বেদনা
বরদার দয়াসম ? হাত বুলাইলে
জননী ব্যথিত দেহে, কোথা ব্যথা থাকে ?
এ কথা তোমার কাছে অবিদিত নহে।"

সংসার-যন্ত্রণায় নিপীড়িত-হৃদয় যে বাগ্দেবীর "কর-পদ্ম-স্পর্শে" সমস্ত যন্ত্রণা বিস্মৃত হইতে পারে, মধুসূদন আত্ম-জীবনে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

মধুসূদন বহু ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং বহু গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সমস্ত শিক্ষার ও অধ্যয়নের নিষ্কর্ষ, তাঁহার কাব্যানুরক্তি। নানাদেশীয় কাব্য-শাস্ত্রের অনুশীলনে তাঁহার সমকক্ষ কোন ব্যক্তি বঙ্গদেশে বোধ হয় এ পর্য্যন্ত জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার জীবনের অন্যান্য অনেক গুণের ন্যায় এই কাব্যানুরাগও তাঁহার জননীর প্রদত্ত শিক্ষা হইতে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। সে সময় স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষার বড় প্রচলন ছিল না। কিন্তু জাহ্নবী দাসী তৎকালেও লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি রামায়ণ, মহাভারত এবং কবিকঙ্কণ চণ্ডী প্রভৃতি বাঙ্গালা কাব্যসমূহ অতি যত্নের সহিত পাঠ করিতেন। তাঁহার স্মরণশক্তি অতি তীক্ষ্ণ ছিল, পঠিত গ্রন্থের অনেক অংশ তিনি মুখে মুখে আবৃত্তি করিতে পারিতেন। মেধাবী মধুসূদন, আট-দশ বৎসর বয়সের সময়, মাতাকে ও বাটীর অন্যান্য প্রাচীন মহিলাদিগকে এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া

শুনাইতেন এবং মাতার দৃষ্টান্ত-অনুসারে তাহা কণ্ঠস্থ করিতেন। কোন সহৃদয় ব্যক্তি বলিয়াছেন, মনুষ্য মাতৃস্তনদুগ্ধের সঙ্গে যাহা শিক্ষা করে, জীবনে কখনও তাহা বিস্মৃত হইতে পারে না। মধুসূদনের জীবনে এ কথা অতি সুন্দররূপে প্রমাণিত হইয়াছে। বহু ভাষায় এবং বহু গ্রন্থে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াও, মাতৃ-প্রদত্ত শিক্ষার ফলে বাঙ্গালা রামায়ণ ও মহাভারত সম্বন্ধে মধুসূদনের অনুরাগের কখনও খর্ব্বতা হয় নাই। পূর্ণবয়সে যখন সংস্কৃত, পারসীক, লাটিন, গ্রীক, ইংরাজী, ফরাসীস, জর্ম্মান, এবং ইতালীয়ান—পৃথিবীর এই আটটী প্রধান ভাষার রত্নভাণ্ডার তাঁহার নিকট উন্মুক্ত হইয়াছিল, এবং যখন তিনি বাল্মীকি, হোমর, ভার্জ্জিল, দান্তে, মিল্টন প্রভৃতি মহাকবিদিগকে সুহৃদ্‌রূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তখনও তিনি তাঁহার শৈশবের সহচর, দরিদ্র কাশীরাম দাস ও কৃত্তিবাসকে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। তাঁহার মান্দ্রাজ হইতে প্রত্যাগমনের পর তাঁহার কোন আত্মীয় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া দেখেন, তিনি একখানি কাশীদাসী মহাভারত মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেছেন। মধুসূদন বেশভূষায় এবং আহার-ব্যবহারে সাহেবের ন্যায় থাকিতেন; সুতরাং তাঁহার আত্মীয় ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, "একি, সাহেব লোকের হাতে মহাভারত!"

মধুসূদন হাসিয়া বলিলেন, "সাহেব আছি বলিয়া কি বইও পড়িতে দিবে না? রামায়ণ, মহাভারত আমার কেমন ভাল লাগে, না পড়িয়া থাকিতে পারি না।"

মান্দ্রাজে অবস্থান কালে, যখন চর্চ্চার অভাবে, তিনি বাঙ্গালা ভাষা বিস্মৃত হইতেছিলেন, তখনও তিনি কলিকাতা হইতে

রামায়ণ ও মহাভারত আনাইয়া, যত্নের সহিত পাঠ করিতেন। কেবল রামায়ণ, মহাভারত নহে—বাঙ্গালা ভাষার অনেক প্রাচীন কাব্যই তিনি অতি সমাদরের সহিত পাঠ করিতেন। চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীতে তিনি তাঁহার স্বদেশীয় কবিগণের প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা শিষ্টাচারের জন্ম নয়; তাহা প্রকৃতই তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধার ও অনুরাগের ফল।

রামায়ণ ও মহাভারত পাঠের সহিত মধুসূদনের ভবিষ্যৎ জীবনের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে। যে মহাগ্রন্থদ্বয়, শত শত বৎসর অবধি হিন্দু নরনারীদিগকে অনুপ্রাণিত করিয়া আসিতেছে, এবং সহস্র সহস্র ভারতসন্তান যাহা হইতে আপন আপন ভাবী মহত্ত্বের বীজ প্রাপ্ত হইতেছেন, তাহা মধুসূদনেরও প্রকৃতিদত্ত প্রতিভাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। বাল্যে পুনঃপুনঃ রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ করিয়া, তিনি তাঁহার কবিশক্তি-বিকাশের সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় আরও কত ভারতীয় কবি যে এরূপ সহায়তা প্রাপ্ত হইতেছেন, তাহার সংখ্যা নাই। লোকের বিশ্বাস, কল্পতরুর নিকট প্রার্থনা করিলে, অভীষ্ট বর প্রাপ্ত হওয়া যায়। রামায়ণ ও মহাভারত ভারত-সন্তানের পক্ষে সেই কল্পতরু। আমাদিগের জাতীয় জীবন-গঠনের পক্ষে এই দুই গ্রন্থ যেরূপ সহায়তা করিয়াছে, আর কোন দেশের কোন কাব্য সেরূপ করিয়াছে কি না সন্দেহ। মধুসূদনের প্রকৃতিদত্ত কবিশক্তি-বিকাশের পক্ষে যে সকল সামগ্রী অনুকূলতা করিয়াছিল, রামায়ণ ও মহাভারত তাহাদিগের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে উল্লেখের উপযুক্ত। কিন্তু এই রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ-সম্বন্ধে বাল্মীকির ও বেদব্যাসের অপেক্ষা কৃত্তিবাসের ও কাশীদাসেরই নিকট

মধুসূদন সমধিক ঋণী ছিলেন। মহর্ষিদ্বয়ের সৃষ্ট চরিত্র হইতে যদিও তিনি তাঁহার কাব্যসমূহের ব্যক্তি নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ভাষাজ্ঞান, বর্ণনানৈপুণ্য এবং পুরাণান্তর্গত বিষয়-সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা কৃত্তিবাস এবং কাশীদাস হইতেই লব্ধ। মেঘনাদ-বধের ও বীরাঙ্গনার অনেক স্থলেই, সেই জন্য, ইহাদিগের প্রভাব লক্ষিত হইবে।

মধুসূদনের কাব্যানুরক্তির অপর কারণ তাঁহার বাল্য-শিক্ষা। শৈশবে গ্রামস্থ পাঠশালায় তিনি যে শিক্ষকের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিতেন, তিনি পারসীক ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন; এবং বাঙ্গালা, সংস্কৃতও, শুনিতে পাওয়া যায়, ইংরাজীও অল্প অল্প জানিতেন। ছাত্রদিগকে তিনি অনেক পারসীক ভাষার কবিতা আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেন এবং তাঁহাদিগকে সেই সকল কবিতা কণ্ঠস্থ করিতে বলিতেন। তিনি নিজে কবিতা রচনা করিতে পারিতেন কি না, তাহা জানিতে পারা যায় না; তবে তিনি যে কবিতানুরাগী ছিলেন, তাহা তাঁহার ছাত্রদিগের হৃদয়ে কাব্যানুরাগ সঞ্চারিত করিবার চেষ্টা-দ্বারাই সপ্রমাণ হইতেছে। শিক্ষক মহাশয়ের উপদেশ-অনুসারে মধুসূদন, অল্প বয়সে, অনেক পারসীক কবিতা কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন, এবং সমবয়সীদিগকে তাহা আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেন। হিন্দু কলেজে অধ্যয়নের সময়েও তিনি পারসী "গজল" গান করিয়া সঙ্গীদিগকে আমোদিত করিতেন।

মধুসূদনের কাব্যানুরক্তির অপর একটী কারণ তাঁহার সঙ্গীত-প্রিয়তা। বাল্য হইতে, কবিতার ন্যায়, গীতবাদ্যের দিকেও তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তাঁহার পিতার ও পিতৃব্যগণের ন্যায় তিনিও আগমনী ও বিজয়া সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে গলদশ্রু

হইতেন। অবস্থার কোনও রূপ পরিবর্ত্তনে তাঁহার সঙ্গীতানুরাগের হ্রাস হয় নাই। তাঁহার ব্যারিষ্টার হইয়া ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমনের পর, কোন ব্রাহ্মণ একবার তাঁহার নিকট একটী মোকদ্দমা-সম্বন্ধে পরামর্শ জানিবার জন্য গিয়াছিলেন। মধুসূদনের সঙ্গে ব্রাহ্মণের পূর্ব্ব পরিচয় ছিল এবং তিনি জানিতেন যে ব্রাহ্মণ অতি সুন্দর "সখীসংবাদ" গান করিতে পারেন। মধুসূদন মোকদ্দমার কথা রাখিয়া, সখীসংবাদ শুনিবার জন্য ব্রাহ্মণকে পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন, এবং তাঁহার নিকট ক্রমান্বয়ে দশ-পনরটী সখীসংবাদ শুনিয়া, বিনা অর্থ গ্রহণে তাঁহার মোকদ্দমা-সম্বন্ধে উপযুক্ত পরামর্শ দান করিলেন।

প্রকৃতি আপন নীরব ভাষায় যে শিক্ষা প্রদান করেন, পৃথিবীর কোন কাব্য বা কোন উপদেষ্টার উপদেশ হইতে সে শিক্ষালাভ করিতে পারা যায় না। প্রকৃতির নিত্যনবীন মুখশ্রী যে কত অপ্রেমিককে প্রেমিক ও কত অকবিকে কবি করিতেছে, তাহাদের সংখ্যা নাই। সেইজন্য মধুসূদনের শৈশবের অন্যান্য অনুকূল উপাদানের ন্যায়, তাঁহার জন্মভূমির কথারও উল্লেখ আবশ্যক। প্রকৃতির অতি সৌন্দর্য্যময় নিকেতনে মধুসূদনের জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। তাঁহার জন্মভূমি সাগরদাঁড়ি অতি সুকোমল গ্রাম্য-শোভায় পূর্ণ। নদী, প্রান্তর এবং বৃক্ষলতা প্রভৃতি যে সকল উপাদান লইয়া বঙ্গের পল্লীগ্রামের সৌন্দর্য্য, তাহাদের কোনটীরও সেখানে অভাব নাই। নির্ম্মল-সলিলা কপোতাক্ষী, ইহার তিনদিক্ বেষ্টন করিয়া, ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষশ্রেণী, শাখায় শাখায় সম্বদ্ধ হইয়া, স্থানে স্থানে তাহার উপর অবনত হইয়া পড়িয়াছে। শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত ভূমি, নদীর তট

হইতে জলের রেখা পর্য্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে। নগরের কৃত্রিমতার সঙ্গে সেখানকার কোন সম্বন্ধ নাই। প্রকৃতি অতি সরল, গ্রাম্য মূর্ত্তিতে সেখানে বিরাজিতা। নদীজলে কুল-ললনাগণ স্নানাবগাহন করিতেছেন; ক্ষুদ্র, বৃহৎ নানাপ্রকারের তরণীসমূহ নদীবক্ষে গমনাগমন করিতেছে; কৃষকবনিতাগণ কলসীকক্ষে নদীতটে দণ্ডায়মান হইয়া একদৃষ্টিতে তাহাদিগের পানে চাহিয়া রহিয়াছে; রাখালবালকগণ পশুপাল ছাড়িয়া, ইতস্ততঃ ক্রীড়া করিতেছে; দেখিলে, নগরের কোলাহল বিস্মৃত হইয়া, সেই সরল, গ্রাম্য সৌন্দর্য্যে মগ্ন হইয়া যাইতে হয়। কপোতাক্ষীর পশ্চিমদিকে দূরপ্রসারিত শ্যামল প্রান্তর। নদীর উভয়তটে বৃক্ষলতার অন্তরালে স্থানে স্থানে কৃষকদিগের কুটীর; মধ্যে মধ্যে দুই একটী প্রাচীন বট বা অশ্বত্থ বৃক্ষ। উদ্যানজ তরুসমূহের ঘনসন্নিবেশে গ্রামটী মধ্যাহ্নকালেও ছায়াপূর্ণ। মধুসূদনের কণ্ঠস্বর নীরব হইয়াছে কিন্তু তাঁহার জন্মভূমির বিহগগণের সঙ্গীতের বিরাম হয় নাই। পাপিয়ার গগনভেদী কণ্ঠস্বরে এখনও তাহা পূর্ব্বের ন্যায় দিবারাত্র প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কত অযত্নসম্ভূত তরুলতা উদ্যানজ বৃক্ষরাজির সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া, গ্রামটীকে আরণ্যশোভায় অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে। মধুসূদনের পৈত্রিক বাসভবনের অদূরবর্ত্তী নদীতটে দণ্ডায়মান হইয়া, একবার জ্যোৎস্নালোকে, পাপিয়ার দিগন্তপ্লাবী সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে, নিস্তব্ধ গ্রামটীর এবং ধীরবাহিনী কপোতাক্ষীর দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে, অতি নীরস হৃদয়ও ভাবে পূর্ণ হয় এবং গ্রামটীকে স্কটের ভাষায় "কবিপুত্রের উপযুক্ত ধাত্রী" (meet nurse for a poetic child) বলিতে ইচ্ছা করে। নিদাঘের জ্যোৎস্নালোকে যিনি কপোতাক্ষীর

সৌন্দর্য্য দর্শন করিবেন, তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, মধুসূদন যে তাহাকে দুগ্ধস্রোতের সহিত তুলনা করিয়াছেন, তাহা অসঙ্গত হয় নাই।

খ্রীষ্টধর্ম্ম-গ্রহণের পর মধুসূদন তাঁহার জীবনের অতি সামান্য অংশই সাগরদাঁড়িতে অতিবাহিত করিয়াছিলেন; কিন্তু স্বদেশের মনোহারিণী মূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়ে চিরজাগরূক ছিল। বাল্যাবস্থায় কোথায় তিনি ক্রীড়া করিতেন, কোথায় বেড়াইতে ভালবাসিতেন, পূর্ণবয়সে তাহা তাঁহার সুস্পষ্টরূপে স্মরণ ছিল। সাগরদাঁড়ির রাস্তাগুলি পাকা করিয়া বাঁধাইবেন, কপোতাক্ষীতে একটী অবতরণিকা প্রস্তুত করাইয়া দিবেন এবং তাহার কূলে "মাইকেলোস্থান" নামক একটী উদ্যান নির্ম্মাণ করাইয়া, সেখানে একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিবেন, এই তাঁহার বাসনা ছিল। কিন্তু তাঁহার জীবনের অন্যান্য সহস্র অভিলাষের ন্যায় ইহার কোনটীই পূর্ণ হয় নাই। বহুকাল প্রবাসের পর, একবার সাগরদাঁড়িতে আসিয়া, তিনি বলিয়াছিলেন, "এই মধুমাখা স্থানে আসিলে যেমন আনন্দ পাওয়া যায়, পৃথিবীর আর কোন স্থানে গেলে সেরূপ পাওয়া যায় না।" আর একদিন কপোতাক্ষীর কূলে বেড়াইতে বেড়াইতে বলিয়াছিলেন, "কপোতাক্ষ, যে তোমার তীরে পাতার কুটীরে বাস করিতে পায়, সেও পরম সুখী।" সুদূর ফরাসী ভূমি হইতে তিনি "কপোতাক্ষ"কে উদ্দেশ করিয়া লিখিয়াছিলেন,—

"সতত হে নদ, তুমি পড় মোর মনে।
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে;

সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে
শোনে মায়া-যন্ত্র-ধ্বনি) তব কলকলে
জুড়াই এ কাণ আমি ভ্রান্তির ছলনে।
বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদদলে,
কিন্তু এ স্নেহের তৃষা মিটে কার জলে ?
দুগ্ধস্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি-স্তনে।"

জননী-জন্মভূমির মোহিনীমূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়ে কিরূপ গভীর ভাব অঙ্কিত করিয়াছিল, ইহা হইতেই তাহা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইবে।

লোকভয়

অশ্বিনীকুমার দত্ত

[১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বরিশাল জেলার বাটাজোড় গ্রামে অশ্বিনীকুমার দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ব্রজমোহন দত্ত। অশ্বিনীকুমার একজন বিখ্যাত দেশভক্ত নেতা ছিলেন। 'ভক্তিযোগ,' 'কর্ম্মযোগ,' 'জ্ঞানযোগ' প্রভৃতি চিন্তাপূর্ণ গ্রন্থ এবং ভক্তিতত্ত্ব-বিষয়ক সঙ্গীতাবলী রচনার জন্ম ইনি সাহিত্য-সমাজে চিরকাল আদৃত হইবেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে এই দেশভক্তের মৃত্যু হয়।]

লোকভয় ভক্তিপথের বিশেষ প্রতিবন্ধক। আমরা অনেক সময়ে লোকনিন্দার ভয়ে অনেক সৎকার্য্য হইতে বিরত থাকি,—লোকনিন্দার ভয়ে মনুষ্যত্বহীন হইয়া পড়ি।

সাধুভাবে চলিতে গেলে এ পৃথিবীতে অনেক সময়ে নিন্দা-ভাজন হইতে হয়, নানারূপ কষ্টে পড়িতে হয়। যাঁহারা মানুষ অপেক্ষা ভগবান্‌কে অধিক ভয় করেন, তাঁহারা প্রায়ই আমাদিগের মধ্যে পাগল বলিয়া পরিচিত হন। যাঁহারা কোন কু-নীতি কি কু-প্রথা অথবা কু-আচার সংস্কার করিতে যান, তাঁহারা যে কত কষ্ট পাইয়া থাকেন, তাহা পৃথিবীর প্রধান প্রধান সংস্কারকদিগের জীবনী আলোচনা করিলেই দেখিতে পাইবে। যিশু খ্রীষ্ট পাপের বিরুদ্ধে ভগবদ্বিধি প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়াই ক্রুশে হত হইয়াছিলেন। আজিও চৈতন্যকে কেহ কেহ ভণ্ড পাষণ্ড বলিয়া থাকে!

কিন্তু যিনিই কেন বিরুদ্ধবাদী হউন না, যাঁহারা প্রকৃত সাধু তাঁহারা ভগবৎপদে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কখনও বিচলিত হন

না। ধর্ম্মের জন্ত যে কত মহাত্মা পাষণ্ডদিগের অত্যাচারে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া এই পৃথিবীকে ধন্ত করিয়াছেন, তাঁহাদিগের দৃষ্টান্ত মনে হইলেও জীবন পবিত্র হয়। তাঁহাদিগের পদানুসরণ করিতে গেলে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতে হইবে, লোকনিন্দার কষ্ট ত কিছুই নয়। রামপ্রসাদ গাইতেন :—

"জয় কালী জয় কালী বল,
লোক বলে ব'ল্‌বে পাগল হ'ল।"

ভক্তমাত্রেরই এই কথা। আমাদের ত প্রাণ-নাশের আশঙ্কা নাই, তবে মানুষ দুই একটি কথা বলিবার ভয়ে কি পরমার্থ ত্যাগ করিবে? যিনি ভগবানের মিলনসুখ সম্ভোগ করিতে ইচ্ছুক, তিনি আর লোকের কথা গ্রাহ্য করিবেন কেন? একটি ভক্ত পরমানন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিয়াছিলেন :—

তেরি মেরি দোস্তী লাগল্ লোক সব বদ্‌নামী কিয়া।
লোক সব্‌কো বক্‌নে দিজে তুম্‌নে হাম্‌নে কাম কিয়া॥

অর্থাৎ, "তোমাতে আমাতে বন্ধুত্ব হইয়াছে, লোকেরা নিন্দা করিতেছে; বলুক তাহাদিগের যাহা ইচ্ছা হয়, তুমি আমি কাজ হাসিল করিয়াছি। তুমি আমি যাহা কর্ত্তব্য তাহাই করিয়াছি—পরস্পর যে বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছি অতি উত্তম হইয়াছে, যাহার যাহা বলিতে ইচ্ছা হয় বলুক না, আমাদিগের তাহাতে কি আসে যায়?"

লোকভয় দ্বারা আমরা কতদূর ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছি ও সমাজকে কতদূর ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছি একবার চিন্তা করা কর্ত্তব্য। কোন ব্যক্তি মোহরির কার্য্য করিতেছেন, মাসিক ২০৲ টাকার অধিক বেতন পান না; তিনিও মনে করেন, "আমি নিজে বাজার

করিলে লোকে কি বলিবে? একটি চাকর না রাখিলে চলে না।" মাসিক ৪৲ টাকা বেতনে একটি চাকর রাখেন, তাহার আহারের ব্যয় আর ৪৲ টাকা, বাকী ১২৲ টাকায় পরিবারের ভরণপোষণ হইতে পারে না; সুতরাং তাঁহার নিকটে কোন কার্য্য উপস্থিত হইলেই দেখিতে পাই তিনি কখন কখনও বাম হস্ত প্রসারণ করিয়া থাকেন। উৎকোচগ্রাহীদিগের মধ্যে অনেকের মুখেই শুনিতে পাওয়া যাইবে, "মহাশয়, করি কি? ভদ্র লোকের সন্তান। যে বেতন পাই তাহা ত জানেন। একটি ব্রাহ্মণ, কি একটি চাকর, না রাখিলে লোকে বলিবে কি? এদিকে ব্রাহ্মণ চাকর রাখিতে হইলে, বলুন দেখি, পরিবারের ভরণপোষণ চলে কি রূপে—কাযে কাযেই আর কি করি?"

মহৎ ব্যক্তিদের জীবন আলোচনা করিয়া,—তাঁহারা যাহা খাঁটি বুঝিয়াছেন তাহাই করিয়া গিয়াছেন, 'লোকভয়কে তৃণজ্ঞানও করেন নাই'—এই ভাবটি হৃদয়ে যত দৃঢ় করিতে পারা যাইবে ততই লোকভয় দূর হইবে। ধর্ম্মের জন্য, সত্যের জন্য, তাঁহারা যে দুর্দ্দমনীয় তেজ দেখাইয়াছেন, তাহার একটি স্ফুলিঙ্গ কাহারও জীবনে পড়িলে তাহার লোকভয় থাকিতে পারে না। সুতরাং সেই মহাত্মাদিগের চরিত্র পুনঃ পুনঃ আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

আর একটি বিষয় মনে রাখিলে লোকভয় অনেক কমিয়া যাইবে। পৃথিবীতে সহস্র সহস্র দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই, যাঁহারা প্রথমে কোন সদ্বিষয়ে বিরোধী হইয়াছিলেন, তাঁহারাই শেষে সেই বিষয়ের অত্যন্ত পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছেন। ধর্ম্মের, সত্যের, যাহা ভাল তাহার চিরকালই জয় হয়। এই জীবনে অনেকবার দেখিয়াছি যে, যাহারা কোন ব্যক্তির নিন্দা না করিয়া

জলগ্রহণ করিত না, এমনই ঘটনাচক্র আসিয়া পড়িল যে, তাহারাই আবার নিজেদের ভুল বুঝিয়া সেই ব্যক্তির পরম বন্ধু হইয়া দাঁড়াইল। অনেক 'সল' (Saul) এই পৃথিবীতে 'পলে' (Paul) পরিণত হয়। অনেক শত্রু-ওমর মিত্র-ওমর হইয়া পড়ে।

মনে কর এই পৃথিবীতে কেহই তোমার পক্ষসমর্থন করিবে না, তাহাতেই বা কি? যাহা সত্য, যাহা ধর্ম্ম, তাহা যে ভগবানের অনুমোদিত সে বিষয়ে ত কোন সন্দেহ নাই। ধর, একদিকে ভগবান্ আর একদিকে সমস্ত পৃথিবী; তৌলে কোন্ দিক্ গুরুতর বোধ হয়? তুমি কোন্ দিকে যাইবে?

কণ্টক দূর করিবার যে উপায়গুলি বলা হইল, তাহাদের মধ্যে, সকলেই বোধ হয় লক্ষ্য করিয়া থাকিবে, মনের কার্য্যই অধিক: কু-চিন্তা সু-চিন্তা দ্বারা, কু-ভাব সু-ভাব দ্বারা, দমন করা প্রয়োজন। সকল পাপেরই উৎপত্তি মনে, এবং মন উহাদের বিনাশ সাধনে অক্ষম।

যে বৃত্তিগুলি অধোমুখী হইয়াছিল, মনের দ্বারা তাহাদিগকে ঊর্দ্ধমুখী করিতে হইবে। ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলি বাহিরে বিষয়ভূমিতে বিচরণ করিতেছিল, সু-চিন্তা দ্বারা তাহাদিগকে অন্তর্মুখ করিতে পারিলেই কণ্টক উন্মুলিত করা হইল।

উপসংহারে কণ্টকগুলি সম্বন্ধে আর একটি কথা বলা প্রয়োজনীয়: ইহারা অনেক সময়ে ছদ্মবেশে উপস্থিত হয়। অনেক সময়ে পাপ পুণ্যের বেশ ধরিয়া আইসে। সয়তান গরদের ধুতি পরিয়া তিলক কাটিয়া উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে কুমন্ত্রণা দেয়। সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে, এই সময়ে তাহার কুহকে ভুলিয়া না যাই। কোন ব্যক্তি কোন অন্যায় কার্য্য

করিয়াছে, কি অপবিত্র বাক্য বলিয়াছে, এবং তাহার জন্য বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত নহে; তুমি তাহার প্রতিবাদ করা কিংবা তাহাকে শাস্তি দেওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য মনে করিলে, হয়ত কেহ বলিয়া উঠিলেন—"ক্ষমা কর, অত প্রতিবাদ করিলে কি চলে? পৃথিবীতে এরূপ কতই হইতেছে, ইহার বিরুদ্ধে ক্রোধ করিলে লাভ কি? একটু ক্ষমা চাই।" এস্থলে যিনি পাপের বিরুদ্ধে দণ্ড ধারণ করিতে নিষেধ করিয়া ক্ষমার দোহাই দিলেন, তিনি প্রকৃতপক্ষে পাপকে প্রশ্রয় দিলেন। তিনি হয়ত বুঝিতে পারেন নাই যে, ক্ষমার বেশে পাপ তাঁহাকে অধিকার করিয়াছে। যদি কেহ জানেন যে, কোন ব্যক্তি বড় কষ্টে পড়িয়াছে, কিন্তু তাহাকে নগদ টাকা দান করিলে তাহার অপব্যবহার করিবে, এবং যদি তিনি দয়ার্দ্র হইয়া পুণ্য ভাবিয়া তাহাকে নগদ টাকা দান করেন, তাহা হইলে তিনি জানিয়া রাখুন যে, পাপ পুণ্যবেশ ধারণ করিয়া তাঁহাকে প্রবঞ্চিত করিয়াছে।

ছদ্মবেশী পাপ সম্বন্ধে এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। মনের চারিদিকে অতি সতর্ক এবং বুদ্ধিমান্ প্রহরী রাখিতে হইবে, যেন পাপ কোন প্রকারে কোনরূপ চতুরতা অবলম্বন করিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিতে না পারে।

ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে

জগদীশচন্দ্র বসু

[জগদীশচন্দ্র বসু ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুরের একটি প্রাচীন বংশে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি ইংলণ্ড যাত্রা করেন। সেখানে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি.এস্.-সি. ডিগ্রী এবং পরে ডি.এস্-সি. উপাধি লাভ করেন। ইনি কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। জগদীশচন্দ্র বর্ত্তমান জগতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদিগের অন্যতম। উদ্ভিদ-জগতে ইঁহার মৌলিক গবেষণা জগৎ-বিখ্যাত। গভর্ণমেণ্ট ইঁহাকে 'স্যর' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। ইঁহার "অব্যক্ত" নামক পুস্তক ও ইংরেজী ভাষায় লিখিত Response of the Living and the Non-Living নামক গ্রন্থ সুপ্রসিদ্ধ। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ৭৯ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়।]

আমাদের বাড়ীর নিম্নেই গঙ্গা প্রবাহিত। বাল্যকাল হইতেই নদীর সহিত আমার সখ্য জন্মিয়াছিল। বৎসরের এক সময়ে কূল প্লাবন করিয়া জলস্রোত বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইত; আবার হেমন্তের শেষে ক্ষীণকলেবর ধারণ করিত। প্রতিদিন জোয়ার-ভাটায় বারিপ্রবাহের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতাম। নদীকে আমার একটি গতিপরিবর্ত্তনশীল জীব বলিয়া মনে হইত। সন্ধ্যা হইলেই একাকী নদীতীরে আসিয়া বসিতাম। ছোট ছোট তরঙ্গগুলি তীরভূমিতে প্রতিহত হইয়া কুলু কুলু গীত গাহিয়া অবিশ্রান্ত চলিয়া যাইত। যখন অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া আসিত এবং বাহিরের কোলাহল একে একে নীরব হইয়া যাইত, তখন নদীর

সেই কুলু কুলু ধ্বনির মধ্যে কত কথাই শুনিতে পাইতাম। কখন মনে হইত, এই যে অজস্র জলধারা প্রতিদিন চলিয়া যাইতেছে, ইহা ত কখনও ফিরে না; তবে এই অনন্ত স্রোত কোথা হইতে আসিতেছে? ইহার কি শেষ নাই? নদীকে জিজ্ঞাসা করিতাম, "তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?" নদী উত্তর করিত, "মহাদেবের জটা হইতে।" তখন ভগীরথের গঙ্গা-আনয়ন বৃত্তান্ত স্মৃতিপথে উদিত হইত।

তাহার পর, বড় হইয়া নদীর উৎপত্তি-সম্বন্ধে অনেক ব্যাখ্যা শুনিয়াছি; কিন্তু যখনই শ্রান্তমনে নদীতীরে বসিয়াছি, তখনই সেই চিরাভ্যস্ত কুলু কুলু ধ্বনির মধ্যে সেই পূর্ব্বকথা শুনিতাম, "মহাদেবের জটা হইতে।"

একবার নদীতীরে আমার এক প্রিয়জনের পার্থিব অবশেষ চিতানলে ভস্মীভূত হইতে দেখিলাম। আমার সেই আজন্ম-পরিচিত বাৎসল্যের বাসমন্দির সহসা শূন্যে পরিণত হইল। সেই স্নেহের এক গভীর বিশাল প্রবাহ কোন্ অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় দেশে বহিয়া চলিয়া গেল? যে যায়, সে ত আর ফিরে না; তবে কি সে অনন্তকালের জন্য লুপ্ত হয়? মৃত্যুতেই কি জীবনের পরিসমাপ্তি। যে যায়, সে কোথায় যায়? আমার প্রিয়জন আজ কোথায়?

তখন নদীর কলধ্বনির মধ্যে শুনিতে পাইলাম, "মহাদেবের পদতলে।"

চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার হইয়া আসিয়াছিল, কুলু কুলু শব্দের মধ্যে শুনিতে পাইলাম, "আমরা যথা হইতে আসি, আবার তথায় ফিরিয়া যাই। দীর্ঘ প্রবাসের পর উৎসে মিলিত হইতে যাইতেছি।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোথা হইতে আসিয়াছ, নদি ?" নদী সেই পুরাতন স্বরে উত্তর করিল, "মহাদেবের জটা হইতে।"

একদিন আমি বলিলাম, "নদি, আজ বহুকাল অবধি তোমার সহিত আমার সখ্য। পুরাতনের মধ্যে কেবল তুমি! বাল্যকাল হইতে এ পর্য্যন্ত তুমি আমার জীবন বেষ্টন করিয়া আছ, আমার জীবনের এক অংশ হইয়া গিয়াছ ; তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ, জানি না। আমি তোমার প্রবাহ অবলম্বন করিয়া তোমার উৎপত্তিস্থান দেখিয়া আসিব।"

শুনিয়াছিলাম, উত্তর-পশ্চিমে যে তুষারমণ্ডিত গিরিশৃঙ্গ দেখা যায়, তথা হইতে জাহ্নবীর উৎপত্তি হইয়াছে। আমি সেই শৃঙ্গ লক্ষ্য করিয়া, বহু গ্রাম, জনপদ ও বিজন অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিলাম। যাইতে যাইতে কূর্ম্মাচল নামক পুরাণপ্রথিত দেশে উপস্থিত হইলাম। তথা হইতে সরযূনদীর উৎপত্তিস্থান দর্শন করিয়া দানবপুরে আসিলাম। তাহার পর, পুনরায় বহুল গিরিগহন-লঙ্ঘনপূর্ব্বক উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইলাম।

একদিন অতীব বন্ধুর পার্ব্বত্য পথে চলিতে চলিতে পরিশ্রান্ত হইয়া বসিয়া পড়িলাম। আমার চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতমালা, তাহাদের পার্শ্বদেশে নিবিড় অরণ্যানী ; এক অভ্রভেদী শৃঙ্গ তাহার বিরাট্ দেহ-দ্বারা পশ্চাতের দৃশ্য অন্তরাল করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান। আমার পথপ্রদর্শক বলিল, "এই শৃঙ্গে উঠিলেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। নিম্নে যে রজতসূত্রের ন্যায় রেখা দেখা যাইতেছে, উহাই বহু দেশ অতিক্রম করিয়া তোমাদের দেশে অতি বেগবতী, কূল-প্লাবিনী, স্রোতস্বতী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। সম্মুখস্থ শিখরে আরোহণ করিলেই দেখিতে পাইবে এই সূক্ষ্ম সূত্রের আরম্ভ কোথায়।"

এই কথা শুনিয়া আমি সমুদয় পথশ্রম বিস্মৃত হইয়া নব উদ্যমে পর্ব্বতে আরোহণ করিতে লাগিলাম।

আমার পথপ্রদর্শক হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "সম্মুখে দেখ, জয় নন্দাদেবী। জয় ত্রিশূল।"

কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে পর্বতমালা আমার দৃষ্টি অবরোধ করিয়াছিল। এখন উচ্চতর শৃঙ্গে আরোহণ করিবামাত্র আমার সম্মুখে আবরণ অপসৃত হইল। দেখিলাম, অনন্ত-প্রসারিত নীল নভোমণ্ডল। সেই নিবিড় নীলস্তর ভেদ করিয়া দুই শুভ্র তুষার-মূর্ত্তি শূন্যে উত্থিত হইয়াছে। একটি গরীয়সী রমণীর ন্যায়। মনে হইল যেন আমার দিকে সস্নেহ প্রশান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন। যাঁহার বিশাল বক্ষে বহু জীব আশ্রয় ও বৃদ্ধি পাইতেছে, এই মূর্ত্তি সেই মাতৃরূপিণী ধরিত্রীর বলিয়া চিনিলাম। ইহার অনতিদূরে মহাদেবের ত্রিশূল স্থাপিত। এই ত্রিশূল পাতালগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া মেদিনী-বিদারণপূর্ব্বক শাণিত অগ্রভাগ-দ্বারা আকাশ-বিদ্ধ করিতেছে। ত্রিভুবন এই মহাস্ত্রে গ্রথিত।*

এইরূপে পরস্পরের পার্শ্বে, সৃষ্ট জগৎ ও সৃষ্টিকর্ত্তার হস্তের আয়ুধ সাকাররূপে দর্শন করিলাম। এই ত্রিশূল যে স্থিতি ও প্রলয়ের চিহ্নরূপী, তাহা পরে বুঝিলাম।

আমার পথপ্রদর্শক বলিল, "সম্মুখে এখনও দীর্ঘ পথ রহিয়াছে; উহা অতীব দুর্গম; দুই দিন চলিলে পর তুষার-নদী দেখিতে পাইবে।"

* কুমায়ুনের উত্তরে দুই তুষার-শিখর দেখা যায়। একটির নাম নন্দাদেবী অপরটি ত্রিশূল নামে খ্যাত।

সেই দুই দিন বহু বন ও গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিয়া অবশেষে তুষারক্ষেত্রে উপনীত হইলাম। নদীর ধবল সূত্রটি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া এ পর্য্যন্ত আসিতেছিল, কল্লোলিনীর মৃদু গীত এত দিন কর্ণে ধ্বনিত হইতেছিল, সহসা যেন কোনো ঐন্দ্রজালিকের মন্ত্রপ্রভাবে সে গীত নীরব হইল, নদীর তরল নীর অকস্মাৎ কঠিন, নিস্তব্ধ তুষারে পরিণত হইল। (ক্রমে দেখিলাম, স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড ঊর্ম্মিমালা প্রস্তরীভূত হইয়া রহিয়াছে, যেন ক্রীড়াশীল চঞ্চল তরঙ্গগুলিকে কে "তিষ্ঠ" বলিয়া অচল করিয়া রাখিয়াছে। কোনো মহাশিল্পী যেন সমগ্র বিশ্বের স্ফটিকখনি নিঃশেষ করিয়া এই বিশালক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ সমুদ্রের মূর্ত্তি রচনা করিয়া গিয়াছেন।)

দুই দিকে উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী, বহুদূর-প্রসারিত সেই পর্ব্বতের পাদমূল হইতে উত্তুঙ্গ ভৃগুদেশ পর্য্যন্ত অগণ্য উন্নত বৃক্ষ নিরন্তর পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে। শিখর-তুষার-নিঃসৃত জলধারা বঙ্কিম গতিতে নিম্নস্থ উপত্যকায় পতিত হইতেছে। সম্মুখে নন্দাদেবী ও ত্রিশূল এখন আর স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না, মধ্যে ঘন কুজ্ঝটিকা; এই যবনিকা অতিক্রম করিলেই দৃষ্টি অবারিত হইবে।

তুষার-নদীর উপর দিয়া ঊর্দ্ধে আরোহণ করিতে লাগিলাম। এই নদী ধবলগিরির উচ্চতম শৃঙ্গ হইতে আসিতেছে। আসিবার সময় পর্ব্বতদেহ ভগ্ন করিয়া প্রস্তর-স্তূপ বহন করিয়া আনিতেছে, সেই প্রস্তর-স্তূপ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। অতি দুরারোহ স্তূপ হইতে স্তূপান্তরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। যত ঊর্দ্ধে উঠিতেছি বায়ুস্তর ততই ক্ষীণতর হইতেছে; সেই ক্ষীণ বায়ু দেবধূপের সৌরভে পরিপূর্ণ। ক্রমে শ্বাস-প্রশ্বাস কষ্টসাধ্য হইয়া

উঠিল, শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল, অবশেষে হতচেতন-প্রায় হইয়া নন্দাদেবীর পদতলে পতিত হইলাম।

সহসা শত শত শঙ্খনাদ একত্র কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। অর্দ্ধোন্মীলিত-নেত্রে দেখিলাম, সমগ্র পর্ব্বত ও বনস্থলীতে পূজার আয়োজন হইয়াছে। জলপ্রপাতগুলি যেন সুবৃহৎ কমণ্ডলু-মুখ হইতে পতিত হইতেছে; সেই সঙ্গে পারিজাত বৃক্ষসকল স্বতঃ পুষ্প বর্ষণ করিতেছে; দূরে দিক্ আলোড়ন করিয়া শঙ্খধ্বনির ন্যায় গম্ভীর ধ্বনি উঠিতেছে। ইহা শঙ্খধ্বনি কি পতনশীল তুষার-পর্ব্বতের বজ্রনিনাদ স্থির করিতে পারিলাম না।

কতক্ষণ পরে সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে হৃদয় উচ্ছ্বসিত ও দেহ পুলকিত হইয়া উঠিল। এতক্ষণ যে কুজ্ঝটিকা নন্দাদেবী ও ত্রিশূল আচ্ছন্ন করিয়াছিল, তাহা ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া শূন্যমার্গ আশ্রয় করিয়াছে। নন্দাদেবীর শীর্ষোপরি এক অতি বৃহৎ ভাস্বর জ্যোতি বিরাজ করিতেছে, তাহা একান্ত দুর্নিরীক্ষ্য। সেই জ্যোতিঃপুঞ্জ হইতে নির্গত ধূমরাশি দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছে। তবে, এই কি মহাদেবের জটা? এই জটা পৃথিবীরূপিণী নন্দাদেবীকে চন্দ্রাতপের ন্যায় আবৃত করিয়া রাখিয়াছে! এই জটা হইতে হীরককণার তুল্য তুষারকণাগুলি নন্দাদেবীর মস্তকে উজ্জ্বল মুকুট পরাইয়া দিয়াছে। এই কঠিন হীরককণাই ত্রিশূলাগ্র শাণিত করিতেছে।

শিব ও রুদ্র! রক্ষক ও সংহারক! এখন ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলাম। মানস-চক্ষে উৎস হইতে বারিকণার সাগরোদ্দেশে যাত্রা ও পুনরায় উৎসে প্রত্যাবর্ত্তন স্পষ্ট দেখিতে

পাইলাম। এই মহাচক্র-স্থাপিত স্রোতে সৃষ্টি- ও প্রলয়-রূপ পরস্পরের পার্শ্বে স্থাপিত দেখিলাম।

সম্মুখে আকাশভেদী যে পর্ব্বতশ্রেণী দেখিতেছি, হিমানুরূপ বারিকণা উহাদের শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে; প্রবেশ করিয়া মহাবিক্রমে উহাদের দেহ বিদীর্ণ করিতেছে। চ্যুত শিখর বজ্র-নিনাদে নিম্নে পতিত হইতেছে।

বারিকণারাই নিম্নে শুভ্র তুষার-শয্যা রচনা করিয়া রাখিয়াছে। ভগ্ন শৈল এই তুষার-শয্যায় শায়িত হইল। তখন কণাগুলি একে অন্যকে ডাকিয়া বলিল, "আইস, আমরা ইহার অস্থি দিয়া পৃথিবীর দেহ নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করি।"

কোটি কোটি ক্ষুদ্র হস্ত অসংখ্য অণুপ্রমাণ শক্তির মিলনে, অনায়াসে সেই পর্ব্বতভার বহিয়া নিম্নে চলিল। কোন পথ ছিল না, পতিত পর্ব্বতখণ্ডের ঘর্ষণেই পথ কাটিয়া লইল—উপত্যকা রচিত হইল। পর্ব্বতগাত্রে ঘর্ষিত হইতে হইতে উপলস্তূপ চূর্ণীকৃত হইল।

আমি যে স্থানে বসিয়া আছি, তাহার উভয়তঃ তুষারবাহিত প্রস্তরখণ্ড রাশীকৃত রহিয়াছে। ইহার নিম্নেই তুষারকণা তরলাকৃতি ধারণ করিয়া ক্ষুদ্র সরিতে পরিণত হইয়াছে। এই সরিৎ পর্ব্বতের অস্থিচূর্ণ বহন করিয়া গিরিদেশ অতিবর্ত্তন করিয়া বহুল সমৃদ্ধ নগর ও জনপদের মধ্য দিয়া সাগরোদ্দেশে প্রবাহিত হইতেছে।

পথে একস্থানে উভয়কূলস্থ দেশ মরুভূমিপ্রায় হইয়াছিল। নদী তট উল্লঙ্ঘন করিয়া দেশ প্লাবিত করিল। পর্ব্বতের অস্থিচূর্ণ সংযোগে মৃত্তিকার উর্ব্বরতা-শক্তি বর্দ্ধিত হইল। কঠিন পর্ব্বতের দেহাবশেষ-দ্বারা বৃক্ষলতার সজীব শ্যামদেহ নির্ম্মিত হইল।

বারিকণাগণই বৃষ্টিরূপে পৃথিবী ধৌত করিতেছে, এবং মৃত ও পরিত্যক্ত দ্রব্য বহন করিয়া সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিতেছে। তথায় মনুষ্যচক্ষুর অগোচরে নূতন রাজ্যের সৃষ্টি হইতেছে।

সমুদ্রে মিলিত বারিকণাকুল সর্ব্বদা বিতাড়িত হইয়া বেলাভূমি ভঙ্গ করিতেছে।

জলকণা কখনও ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া পাতালপুরস্থ অগ্নি-কুণ্ডে আহুতিস্বরূপ হইতেছে। সেই মহাযজ্ঞোত্থিত ধূমরাশি পৃথিবী বিদারণ করিয়া আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গার-রূপে প্রকাশ পাইতেছে; সেই মহাতেজে পৃথিবী কম্পিত হইতেছে; ঊর্দ্ধভূমি অতলে নিমজ্জিত ও সমুদ্রতল উন্নত হওয়ায় নূতন মহাদেশ নির্ম্মিত হইতেছে।

সমুদ্রে পতিত হইয়াও বারিবিন্দুগণের বিশ্রাম নাই। সূর্য্যের তেজে উত্তপ্ত হইয়া ইহারা ঊর্দ্ধে উড্ডীন হইতেছে। ইহারাই একদিন অশনি ও ঝঞ্ঝাবলে পর্ব্বতশিখরাভিমুখে ধাবিত হইয়া, তথায় বিপুল জটাজাল-মধ্যে আশ্রয় লইবে; আবার কালক্রমে বিশ্রামান্তে পর্ব্বতপৃষ্ঠে তুহিনাকারে পতিত হইবে। এই গতির বিরাম নাই, শেষ নাই!

এখনও ভাগীরথী-তীরে বসিয়া তাহার কুলু কুলু ধ্বনি শ্রবণ করি। এখনও তাহাতে পূর্ব্বের ন্যায় কথা শুনিতে পাই। এখন আর বুঝিতে ভুল হয় না।

"নদি, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?"—ইহার উত্তরে এখন সুস্পষ্ট স্বরে শুনিতে পাই—

"মহাদেবের জটা হইতে।"

স্যর আশুতোষ

বিপিনচন্দ্র পাল

[শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত পৈল গ্রামে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বিপিনচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইনি 'সন্ধ্যা,' 'প্রবাহিণী,' 'বঙ্গদর্শন' (নব পর্য্যায়), 'বিজয়া,' 'নারায়ণ' প্রভৃতি পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। ইনি সাহিত্য, রাজনীতি, দর্শন প্রভৃতি বহু বিষয়ে পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার প্রত্যেক লেখায় চিন্তাশীলতা ও বিজ্ঞাবত্তার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। ইঁহার প্রণীত 'চরিত্র-চিত্র' গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যে সমাদর লাভ করিয়াছে। বিপিনচন্দ্র বাঙ্গালা তথা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাগ্মী ছিলেন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ইঁহার মৃত্যু হয়।]

এ জগতে সকল ক্ষেত্রেই অধিকারভেদ আছে। মানুষের গুণাগুণের খাঁটি বিচার করিতে গেলেও অধিকারী অনধিকারীর কথা ভাবিতে হয়। নির্ম্মল চিত্ত ব্যতীত কোন বিষয়েই সত্য দেখিবার অধিকার জন্মে না। যাঁহারা ক্ষুদ্র স্বার্থের প্রেরণায় আশুতোষের ভজনা করিতে যাইতেন, তাঁহারা আশুতোষের সত্য পরিচয় কখনও লাভ করেন নাই। অন্য পক্ষে, যাঁহারা কেবল আশুতোষের বাহিরের কর্ম্ম দেখিয়াই তাঁহার অন্তরের ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার করিয়াছেন, তাঁহারাও তাঁহার প্রতি কখনও সুবিচার করিতে পারেন নাই। বাহিরের কর্ম্মে সচরাচর কর্ম্মীকে সত্যভাবে প্রকাশ করিতে পারে না। কর্ম্মের নিজের একটা বিধান আছে। কর্ম্মীকে এই বিধান মানিয়া চলিতে হয়। কর্ম্মের খাতিরে কর্ম্মীকে অনেক সময়ে আপনাকে চাপিয়া রাখিতে হয়। অনেক সময়ে

নিজের স্বধর্ম্মকে উপেক্ষা করিয়া কর্ম্মের পরধর্ম্মের অনুসরণ করিতে হয়। কর্ম্ম-দ্বারা কর্ম্মীর কখনই খাঁটি বিচার হয় না। আশুতোষের কর্ম্মের দ্বারা তাঁহার বিচার করিলে চলিবে না; তাঁহার নিজস্ব প্রকৃতি-দ্বারাই তাঁহার বাহিরের কর্ম্মজীবনের ভাল-মন্দের ওজন করিতে হইবে। যাঁহারা আশুতোষের চরিত্রের অন্তঃপুরে কখনও প্রবেশ করিবার অধিকার পান নাই, তাঁহারা তাঁহার জটিল প্রকৃতির এবং বিচিত্র কর্ম্মের ভাল-মন্দের সত্য বিচার কখনও করিতে পারিবেন না।

এ সংসারে যে মানুষই দশ জনের অপেক্ষা মাথা উঁচু করিয়া উঠে, সে-ই, একদিকে যেমন কতকগুলি লোকের অকৃত্রিম অনুরাগ এবং শ্রদ্ধা লাভ করে, সেইরূপ আবার বহুতর লোকের অন্তরে অকারণ অসূয়াও জাগাইয়া দেয়। এই অসূয়াতেও বহুলোকের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়া আশুতোষের চরিত্রের সত্য বিচার করিতে দেয় নাই। আশুতোষের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হইবার পূর্ব্বে আমিও তাঁহাকে যে চক্ষে দেখিতাম, পরিচয়-লাভের পরে সে ভাবে দেখি নাই।

বাহির হইতে আশুতোষকে অত্যন্ত দাম্ভিক ভাবিতাম। নিকটে যাইয়া একবারও কোন প্রকারে এই দাম্ভিকতার পরিচয় পাই নাই। ফলতঃ তাঁহার আচার-আচরণে ও কথাবার্ত্তায় তাঁহাকে প্রায় সর্ব্বদাই অতিশয় ডিমোক্র্যাটিক (democratic) বলিয়া মনে হইয়াছে। এই ইংরাজী কথাটার প্রতিশব্দ আমাদের ভাষায় নাই। আপনার পোষাক-পরিচ্ছদে, আচার-আচরণে ও কথাবার্ত্তায় যে নিজেকে আর দশ জন হইতে পৃথক্ করিয়া ও উঁচু করিয়া ধরিবার চেষ্টা না করে, তাহাকে ইংরাজীতে আমরা

democratic কহি। এই লক্ষণটা আশুতোষের মধ্যে সর্ব্বদাই প্রকাশ পাইত বলিয়া মনে হইয়াছে। পোষাক-পরিচ্ছদ আশুতোষের অত্যন্ত সাদাসিদে ছিল। জজিয়তী করিতে যাইয়া তাঁহাকে হাইকোর্টের জজেদের পোষাক পরিতে হইত বটে, কিন্তু পারতপক্ষে বোধ হয়, তিনি কখনও দেশের লোকের সভাসমিতিতে যাইবার সময়ে এই রাজ-বেশ ধারণ করিতেন না।

সচরাচর মানুষ আপনার ঐশ্বর্য্য-বিস্তার করিয়াই নিজেকে চারিদিকের সাধারণ লোক হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিতে চাহে। আশুতোষের মধ্যে ঐশ্বর্য্য-বিস্তারের এই আকাঙ্ক্ষা দেখা যায় নাই। তিনি দেশের দশ জন হইতে আপনাকে পৃথক্ রাখিতে চাহেন নাই বলিয়াই আপনার মানসিক মতবাদে অত্যন্ত উদার হইয়াও ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক আচার-আচরণে এবং ধর্ম্মের বাহ্য ক্রিয়াকলাপে কখনও প্রচলিত হিন্দুয়ানীর গণ্ডী ছাড়িয়া যান নাই। ইহার মূলে তাঁহার স্বধর্ম্মনিষ্ঠা অপেক্ষা, আমার মনে হয়, গভীর স্বাজাত্যাভিমানই বেশী বিদ্যমান ছিল। আশুতোষ আর দশ জন বাঙ্গালী গৃহস্থের মতন বাড়ীতে সচরাচর খালি গায়ে থাকিতেন। শুনিয়াছি, বড় বড় সাহেব-সুবা দেখা করিতে আসিলেও তিনি কখনও আপনার স্বজাতির এই বিবস্ত্র বর্ব্বরতাকে ঢাকিবার জন্য ব্যস্ত হইতেন না। স্যাড্‌লার কমিশনের সভ্যরূপে দেশবিদেশে বেড়াইবার সময়ে, তিনি কখনও বাঙ্গালীর মামুলী পোষাক ছাড়িয়া ইংরেজ দরবারের প্রচলিত পরিচ্ছদ পরিধান করেন নাই।

আশুতোষ বাঙ্গালাকে, বাঙ্গালীর ভাষাকে, বাঙ্গালীর সাধনা ও সভ্যতাকে কতটা যে ভালবাসিতেন, বাঁকিপুরে বাঙ্গালা সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে যাইয়া তাহার পরিচয় পাই। প্রথম যখন

তাঁহাকে সম্মিলনের সভাপতিত্বে বরণ করিবার প্রস্তাব হয়, সত্য বলিতে কি, তখন কথাটা ভাল লাগে নাই। আশুতোষের এই পদের কোন যোগ্যতা আছে বলিয়া কল্পনা করি নাই। কিন্তু তাঁহার অভিভাষণ শুনিয়া আমার সে ভ্রান্তি দূর হইয়া যায়। আশুতোষ, বাঙ্গালা লেখক না হইয়াও বাঙ্গালা সাহিত্যকে কি গভীর অনুরাগের চক্ষে দেখিতেন, এই অভিভাষণে তাহার প্রথম পরিচয় পাই। বাঙ্গালা সাহিত্যকে আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত করিয়া, বাঙ্গালার মনীষাকে আধুনিক বিশ্বসাধনার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আশুতোষের প্রাণে গভীর আকাঙ্ক্ষা ছিল। বাঁকিপুরের সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণে এই আকাঙ্ক্ষা পরিস্ফুট হইয়া উঠে। এই বাসনার প্রেরণাতেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধি-পরীক্ষাতে আশুতোষ বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যকে একটা বিশিষ্ট স্থান দিয়াছিলেন।

বাঙ্গালা সাহিত্য ও বাঙ্গালীর সাধনাকে বড় করিয়া তুলিবার জন্য তাঁহার প্রাণে যে গভীর আকাঙ্ক্ষা ছিল, এ সকলে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আশা করিয়াছিলাম, রাজকর্ম্ম হইতে অবসর পাইয়া আশুতোষ আপনার অসাধারণ শক্তি এবং মনীষাকে এ দিকে প্রয়োগ করিবেন। সে আশা পূর্ণ হইল না। কিন্তু ইহাতে আশুতোষের গভীর স্বাজাত্যাভিমানের মূল্য বা মর্য্যাদার হ্রাস হয় নাই।

বিষ্ণুপ্রয়াগ

জলধর সেন

[১২৬৬ সালে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে) নদীয়া জেলার কুমারখালি গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে কুমারখালি বিদ্যালয় হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি ১০৲ বৃত্তি পান। অল্প বয়সেই ইনি 'গ্রামবার্ত্তা'র সম্পাদক কাঙ্গাল হরিনাথের সংস্পর্শে আসেন। তাঁহার নিকটই ইনি সাহিত্য-সাধনার প্রেরণা লাভ করেন। ১২৯৭ সালে ইঁহার হিমালয়-যাত্রা আরম্ভ হয় এবং ইনি দুই বৎসর যাবৎ হিমালয় পর্ব্বতের দুর্গম স্থানও ভ্রমণ করেন। ইঁহার সেই ভ্রমণ-কাহিনী-সম্বলিত 'হিমালয়' নামক গ্রন্থ বাঙ্গালা সাহিত্যের এক মূল্যবান্ সামগ্রী। ইনি প্রায় ১১ বৎসর সাপ্তাহিক 'বসুমতী'র সম্পাদক ছিলেন; পরে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে 'হিতবাদী' পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। 'সুলভ সমাচারে'র সম্পাদক রায় বাহাদুর নরেন্দ্রনাথ সেনের মৃত্যু হইলে, ইনি ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত পত্রিকার সম্পাদক হন। তৎপরে ইনি ১৩২০ সালে 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রের সম্পাদক হন এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত দীর্ঘ ২৬ বৎসর ইহার সম্পাদনা করেন। ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, ছোট গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি পঞ্চাশ খানির বেশি বই ইনি লিখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে 'প্রবাসচিত্র,' 'হিমালয়,' 'নৈবেদ্য,' 'দুঃখিনী,' 'বিশুদাদা,' 'অভাগী,' 'তিন পুরুষ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি 'রায় বাহাদুর' উপাধি লাভ করেন। ১৩৪৫ সালে কলিকাতায় ইঁহার মৃত্যু হয়।]

আমরা যখন যোশীমঠ হ'তে খানিকটে নেমে এসেছি, সেই সময় খানিক দূরে জলের একটা গম্ভীর কল্লোল শুনা গেল। এই অবিরাম কল্লোলের সঙ্গে কা'র যে তুলনা দেওয়া যেতে পারে,

অনেক চিন্তা ক'রেও স্থির ক'র্‌তে পারি নি। কোথা হ'তে এই শব্দ আস্‌চে, তা' কিছুই ঠিক ক'র্‌তে পার্‌লুম না, বিশেষ আমাদের তিন জনেরই অভিজ্ঞতা সমান; সুতরাং কোন রকমেই মীমাংসা হ'ল না। তবে অনুমান, এ শব্দ অলকনন্দার স্রোতের শব্দ ভিন্ন আর কিছু নয়। ক্রমে যখন ধীরে ধীরে বিষ্ণুগঙ্গার সাঁকোর উপর এসে প'ড়্‌লুম, তখন খুব প্রবল শব্দ শুন্‌তে পাওয়া গেল। একটু এদিকে ওদিকে সন্ধান ক'র্‌তেই দেখ্‌লুম, বিষ্ণুগঙ্গা খুব প্রবল বেগে ব'য়ে যাচ্ছে; এ তা'রই শব্দ। আমরা ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে নদীর কাছে এসে দাঁড়ালুম। এখানে নদীর তলদেশ অত্যন্ত ভয়ানক, বড় উঁচু নীচু, তাই এ রকম জলের শব্দ হ'চ্ছে।

আমরা সাঁকো পার হ'য়ে বাজারে উপস্থিত হ'লুম। খানিকটে অপ্রশস্ত সমতল জায়গায় খান চার দোকান; তা'তে আটা, ডাল, ঘি, নুন, গুড় বিক্রয় হয়। আমরা বাজারে উপস্থিত হওয়া মাত্র একজন দোকানদার—ফর্‌মাইস পেলে সে তখনি গরম গরম পুরী, ভুজ্জি (তরকারী) ত'য়েরি ক'রে দিতে পারে—এই কথা আমাদের কাছে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা ক'র্‌লে এবং কথার সাক্ষীস্বরূপ আর তিন জন লোককে দাঁড় করালে; তা'রাও মুক্তকণ্ঠে এই হালুইকর ঠাকুরের যশোগানে প্রবৃত্ত হ'ল। এদের রকম সকম দেখে আমার বড়ই আমোদ বোধ হয়েছিল; আমার আরও আমোদের কারণ,—তা'রা আমাদের যতটা নির্ব্বোধ ভেবে দু'পয়সা উপায়ের চেষ্টা ক'র্‌ছিল, সুখের বিষয় আমরা ততটা নির্ব্বোধ নই, কিন্তু সে জন্য তা'দের মনে অনেকখানি আশার সঞ্চার সম্বন্ধে কোনও বাধা হয় নি। দেখ্‌লুম, কলিকাতার চীনাবাজারের দোকানদারেরাই যে ধূর্ত্ত ও ব্যবসাকার্য্যে দক্ষ, তা' নয়; হিমালয়-

বক্ষে এই সকল দোকানদারেরাও জানে কি রকম ক'র্‌লে দু'পয়সা হ'তে পারে।

যা-হ'ক, মিষ্ট কথা ও ভবিষ্যতে পুরীর খরিদ্দার হওয়ার ষোল আনা রকম আশা দিয়ে এই দোকানদার-পুঙ্গবটিকে বশ করা গেল। কোথায় রাত্রি কাটান' যায় তা' ঠিক কর্‌বার জন্যে তা'র উপরই ভার দিলুম। বুঝ্‌লুম আজ তা'কে যে লোভ দেখান' গিয়েছে, তা'তেই সে আমাদের জন্যে কষ্ট স্বীকার ক'র্‌বে। কিন্তু তা'র চেষ্টার কোনও ত্রুটি না হ'লেও, অদৃষ্ট আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছে; কাজেই কোথাও আড্ডা মিল্‌ল' না। বামুন ঠাকুর অনুসন্ধানের পর অকৃতকার্য্য হ'য়ে যখন আমাদের সম্মুখে কাতরভাবে দাঁড়া'ল, তখন আমাদের নিজের কথা ভেবে যতটা দুঃখ না হ'ক, ঠাকুরের ভাব দেখে তা'র চেয়ে বেশী দুঃখ হ'য়েছিল। আমি ঠাকুরকে বুঝিয়ে দিলুম, তা'র আর কষ্ট কর্‌বার দরকার নেই, আমরাই একটা বাসা খুঁজে নিচ্ছি; কিন্তু এতে যেন সে নিরুৎসাহ না হয়, লুচি তরকারী তার দোকান ছাড়া আমরা আর কোথাও নিচ্ছি নে।

আশ্রয়ের সন্ধানে বেরিয়ে পড়া গেল। স্থান আর মেলে না। সকাল-বেলায় যে সব যাত্রী যোশিমঠে না গিয়ে রাস্তা থেকে আমাদের ছেড়ে নীচের পথ দিয়ে বরাবর এখানে চ'লে এসেছে, তা'রাই এখানে সকল আড্ডা দখল ক'রে ফেলেছে, একটি প্রাণীও ঐ স্থান ছেড়ে যায় নি; সুতরাং পরে আসার জন্যে আমাদের স্থানাভাব হ'য়ে উঠেছে। এখনো অনেক বেলা আছে, অথচ যাত্রীর দল আর অগ্রসর না হ'য়ে, এখানে কেন সময়ক্ষেপ ক'র্‌ছে জান্‌বার জন্যে বিশেষ কৌতূহল বোধ হ'ল। শুন্‌লুম,

আগামী কাল যে পথে চ'ল্‌তে হবে, তার মত ভয়ানক, বিপদ্‌পূর্ণ রাস্তা বদ্‌রিনারায়ণের পথে আর নেই ; অপরাহ্নে এ পথে চলা দুরূহ। রাত্রে নিদ্রায় শ্রান্তি দূর ক'রে সকালে এই পথে চলা সুবিধাজনক ও যুক্তিসঙ্গত মনে ক'রে যাত্রীরা আজকের মত এখানেই অপেক্ষা ক'র্‌ছে। অথ কয়েকখানি ঘর তা'রা এমনি পরিপূর্ণ মাত্রায় দখল ক'রেছে যে, তার মধ্যে একটু পা বাড়াবার জায়গা নেই। লোক যে বড় বেশী তা' নয় : তা'রা যদি একটু গোছাল' ভাবে আসনগুলি বিছিয়ে নিত, তা হ'লে প্রত্যেক ঘরে আরো ৫।৭ জনের স্থান হ'তে পার্‌ত'। যা-হ'ক্‌, উপস্থিত রাগটা চাপা দিয়ে বাসার অনুসন্ধানে অন্যত্র প্রস্থান করা গেল।

খানিক ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে স্বামীজী ও অচ্যুত ভায়া ব'সে প'ড়্‌লেন। আমার শ্রান্তি ক্লান্তি নেই ; আমি ভাবলুম, আগে সঙ্গমস্থলটা দেখে আসি, তার পর যা' হয় করা যাবে। সঙ্গমস্থলে চ'ল্‌লুম। বাজারের পিছনে খানিকটে নীচেই সঙ্গমস্থল, কিন্তু বাজারের পিছনে অল্প একটু নেমেই একেবারে ঠিক সঙ্গমস্থলের মাথার উপরে পাহাড়ের গায়ে একটা খুব নূতন ছোট মন্দির দেখ্‌লুম। মন্দিরটি এমন স্থানে নির্ম্মিত যে, এখানে মহাদেব প্রতিষ্ঠা না ক'রে যদি একজন কবিকে প্রতিষ্ঠা করা যে'ত, তা হ'লে ঠিক কাজ করা হ'ত। বিষ্ণুগঙ্গা ও অলকনন্দা নীচে দিয়ে আনন্দোচ্ছ্বাসের বিপুল কল্লোলে পরস্পরকে আলিঙ্গন ক'রেছে ; পাশে ঈষৎ-বক্র সমুন্নত বিশাল পর্ব্বত আকাশ ভেদ ক'রে উঠেছে এবং তা'রই গায়ে এই ক্ষুদ্র মন্দির, প্রকৃতির স্বহস্ত-নির্ম্মিত চিত্রবৎ। তখন সন্ধ্যার বড় বিলম্ব ছিল না, আলো ও অন্ধকারের কোমল মিলন মন্দিরের শোভন দৃশ্যকে আরও

মধুর ক'রে তুলেছিল। আরও অগ্রসর হ'য়ে দেখ্‌লুম, মন্দিরটির পাদদেশ হ'তে আরম্ভ ক'রে পাহাড়ের গা কুঁদে ছোট ছোট সিঁড়ি ত'য়েরি করা হ'য়েছে; সিঁড়ি একেবারে সঙ্গমস্থলে এসে প'ড়েছে। উদ্দাম তরঙ্গ সেই সিঁড়িতে ও পর্ব্বতের কঠিন গায়ে ক্রমাগত আছড়ে প'ড়্‌ছে। এ পর্য্যন্ত অনেক সুন্দর দৃশ্য দেখেছি, কিন্তু এই প্রকারের এমন সুন্দর দৃশ্য আমার চক্ষে এই নূতন। মন্দিরের কাছে এসে ইচ্ছা হ'লো, আজ এখানেই থাকি। মন্দিরের বাইরে খানিক বারান্দা বের করা ছিল, তা'তে তিন চারজন লোক বেশ থাক্‌তে পারে; কিন্তু কা'কেও না দেখে দাঁড়িয়ে ইতস্ততঃ ক'র্‌ছি, এমন সময় দেখি সেই দোকানদার বামুন সেখানে উপস্থিত। কথায় কথায় জান্‌তে পার্‌লুম, মন্দির এখন সেই দোকানদারেরই জিম্মায় আছে। আমি তখন সেই মন্দিরে থাক্‌বার অভিপ্রায় প্রকাশ ক'র্‌লুম। সে প্রথমে কিছুতেই রাজি হ'লো না, কারণ মন্দিরটি নূতন ত'য়েরি হ'য়েছে, তা'তে এখনো দেবতা-প্রতিষ্ঠা হয় নি। এক বৎসর হ'ল ইন্দোরের রাণী এসে এই মন্দির ত'য়েরি করিয়ে দিয়েছেন। এই বৎসর নর্ম্মদাতীর হ'তে মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি এনে মন্দির ও দেবতা উভয়েরই প্রতিষ্ঠা করা হবে।

আমি ত' জোর জবরদস্তি ক'রে মন্দিরের সম্মুখে ব'সে প'ড়্‌লুম, সেও কিন্তু নাছোড়বান্দা। যা'-হ'ক, দুইচারিটী বচন দেওয়ার পর সে আর কোন আপত্তি ক'র্‌ল না। মন্দিরদ্বারে একটী ছোট ছেলে ব'সেছিল; তা'কে বাজারে পাঠিয়ে স্বামীজী ও অচ্যুত ভায়াকে ডাকিয়ে আন্‌লুম। স্বামীজী মন্দির ও স্থানের সৌন্দর্য্য দেখে একেবারে আনন্দে অধীর। এই সুন্দর স্থান

আবিষ্কার করার জন্যে তিনি আজ আমাকে কলম্বসের পাশে আসন দিতে সঙ্কুচিত হ'লেন না। বাস্তবিক কোথায় আজ স্থানাভাবে এই শীতে বরফের মধ্যে, অনাবৃত আকাশতলে বাস করার জন্যে তাঁ'রা প্রস্তুত হ'চ্ছিলেন, আর কোথায় এই সুন্দরস্থানে দেববাঞ্ছিত মন্দিরের মধ্যে সুখশয্যা!

মন্দিরের ভিতরটা আটকোণবিশিষ্ট, উপরে যথারীতি চূড়া। দ্বারের সম্মুখে গাড়ী-বারান্দার মত' একটা বারান্দা বের করা, তার তিন দিকে 'বড় বড় কপাট লাগান'; সুতরাং ইচ্ছা ক'রলেই চারিদিক্ বন্ধ ক'রে বেশ সুরক্ষিত অবস্থায় থাকা যায়।

আমরা মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ না ক'রে আগে যে সিঁড়ির কথা বলেছি, সেই সিঁড়ি দিয়ে সঙ্গমস্থলে নেমে গেলুম। সেখানে—আর শুধু সেখানে কেন—এই মন্দির মধ্যে কথা ব'ল্‌তে হ'লে খুব চেঁচিয়ে ব'ল্‌তে হয়, কারণ জলের এত শব্দ যে, কিছুই শুন্‌তে পাওয়া যায় না। বিষ্ণুপ্রয়াগ সমতল স্থানে নয়; দুদিক্ হ'তে যে দুটা নদী আস্‌ছে, উভয়েই পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে নাম্‌ছে, সুতরাং অন্য স্থান অপেক্ষা এখানে নদীর স্রোত এবং শব্দ দুইই বেশী। তার উপর যেখানে সঙ্গমস্থল, তার আট দশ হাত উজানে অলকনন্দা একটা পাহাড়ের উপর থেকে লাফিয়ে নীচে প'ড়্‌ছে, —সুতরাং এই মন্দিরের কাছে শব্দ আরও বেশী। সমুদ্রগর্জ্জন অনেকেই শুনেছেন; অপার জলধির বিপুল গর্জ্জন, বায়ুহিল্লোলে উন্মত্ত তরঙ্গরাশির অসীম মুক্তপ্রদেশে অবাধ নৃত্য এবং তা'র প্রবল বিক্রম, এ সকলের মধ্যে কোমলতা বা সঙ্কীর্ণতা নেই, তাই বুঝি আমাদের ক্ষুদ্র কল্পনা তা'র ভিতর প'ড়ে শ্রান্ত, অবসন্ন ও ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে পড়ে; কিন্তু সঙ্গমস্থলের জলের অবস্থা সে রকম

নয়। এই অবিশ্রান্ত শব্দে মনে শ্রান্তি আনে না, শান্তি আনে; এই উগ্র শব্দের মধ্যে এমন একটু কোমলতা, এমন একটু মিষ্টতা আছে, যা মর্ম্মস্পর্শী। অনেকক্ষণ শব্দ শুন্‌তে শুন্‌তে বোধ হয় ঘুম আসে; কিন্তু তাই ব'লে এর বিক্রম কম নয়। সঙ্গমস্থলের এই ঘূর্ণিত ফেনিল জলে নামে কা'র সাধ্য? নাম্‌তে সাহসই হয় না। দিবারাত্রি জল আলোড়িত হ'চ্ছে; জলের কাছে গেলে মাথা ঘুরে যায়। ইন্দোরের রাণী মন্দির হ'তে সিঁড়ি প্রস্তুত ক'রিয়ে তা'র সব নীচের সিঁড়ির দু' পাশে পাহাড়ের মধ্যে লোহার শিকল বাঁধিয়ে দিয়েছেন। এই শিকল জলের উপর দোলে, যাত্রীরা এই শিকল ধ'রে জলস্পর্শ করে, স্নান কর্‌বার শক্তি কা'রও নেই। যা'দের মাথা ভাল নয়, একটা কিছু গোলমাল দেখ্‌লেই সহজে যা'দের মাথা ঘুরে উঠে, তা'দের এ জলের কাছে যাওয়া উচিত নয়। হিমালয়ের মধ্যে এমন স্থান আছে যা'দের সঙ্গে এর তুলনা হ'তে পারে; কিন্তু সে তুলনা হিমালয়বাসী ছাড়া আর কেউ বুঝ্‌বেন কি না সন্দেহ; তার চেয়ে যদি বলা যায়, এ একটা ছোটখাট নায়েগ্রার মত, তা' হ'লে বোধ করি অনেকে বুঝ্‌তে পারেন; কারণ, বাঙ্গালীর মধ্যে দু' চারজন ছাড়া আর কেউ নায়েগ্রা না দেখ্‌লেও অনেকেই তা'র বর্ণনা প'ড়ে প'ড়ে তা'তে অভ্যস্ত হ'য়ে গেছেন। এই সঙ্গমস্থল নায়েগ্রার একটা ছোট প্রতিকৃতি ব'ল্‌লেই, বোধ হয়, বর্ণনা ষোল আনা রকম হয়। এতে যিনি সন্তুষ্ট নন, তাঁ'কে সঙ্গে ক'রে আমি পাহাড় পর্ব্বত ভেঙ্গে বরং এখানে আস্‌তে রাজী আছি, কিন্তু বর্ণনা দিতে সম্পূর্ণই অক্ষম।

কবিজীবনী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বর্ত্তমান যুগে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিগণের মধ্যে অন্যতম। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। বর্ত্তমান যুগের বঙ্গসাহিত্যের উপর ইঁহার অতুল প্রভাব। ইনি বাল্যকালে 'কবি-কাহিনী,' 'নির্ঝরের স্বপ্ন-ভঙ্গ,' 'তারকার আত্মহত্যা' প্রভৃতি বহু কবিতা রচনা করেন। তৎপরে 'সোনার তরী,' নৈবেদ্য,' 'গীতাঞ্জলি,' 'ক্ষণিকা,' 'কথা ও কাহিনী' প্রভৃতি বহু কাব্য, 'গোরা,' 'চোখের বালি,' 'নৌকাডুবি' প্রভৃতি বিবিধ উপন্যাস এবং 'রাজা ও রাণী,' 'বিসর্জ্জন' প্রভৃতি বহু নাটক রচনা করিয়াছেন। ইঁহার রচিত অনেক গ্রন্থই জগতের নানা ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। ইঁহার রাজনীতি এবং সমাজ ও সাহিত্য ও বিষয়ক বহু প্রবন্ধ বঙ্গীয় গদ্যসাহিত্যের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করিয়াছে। ইনি একাধিকবার য়ুরোপ, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি স্থানে নিমন্ত্রিত হইয়া বক্তৃতা করেন এবং সর্ব্বত্রই বিশেষভাবে অভিনন্দিত হন। অনেক দিন পূর্ব্বে বোলপুরে ইনি একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন; নালন্দা বিহারের অনুকরণে নি এই বিদ্যালয়টিকে 'বিশ্বভারতী' প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়াছেন এবং তথায় সর্ব্বদেশের পণ্ডিতদিগকে আমন্ত্রণ করিতেছেন। কলিকাতা ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ইঁহাকে 'ডক্টর' উপাধি প্রদান করিয়াছেন এবং গভর্নমেন্ট ইঁহাকে 'নাইট' উপাধিতে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। ইনি 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজি অনুবাদ করিয়া য়ুরোপের জ্ঞানমর্য্যাদার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার 'নোবেল্ প্রাইজ' প্রাপ্ত হন; এই পুরস্কারের মূল্য এক লক্ষ টাকার অধিক। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের অগস্ট মাস হইতে দুই বৎসর ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রধান আচার্য্যের পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের বার্ষিক পদবী-সম্মান-বিতরণ-সভায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালা ভাষায় যে 'ছাত্র-সম্ভাষণ' পাঠ করেন, তাহা ভাব ও ভাষায় অপূর্ব্ব।]

আমাদের প্রাচীন ভারতবর্ষের কোন কবির জীবনচরিত নাই। আমি সে জন্য চির-কৌতূহলী, কিন্তু দুঃখিত নহি। বাল্মীকি-সম্বন্ধে যে গল্প প্রচলিত আছে, তাহাকে ইতিহাস বলিয়া কেহই গণ্য করিবেন না। কিন্তু আমার মতে তাহাই কবির প্রকৃত ইতিবৃত্ত। বাল্মীকির পাঠকগণ বাল্মীকির কাব্য হইতে যে জীবন-চরিত সৃষ্টি করিয়া লইয়াছেন, তাহা বাল্মীকির প্রকৃত জীবনের অপেক্ষা অধিক সত্য। কোন্ আঘাতে বাল্মীকির হৃদয় ভেদ করিয়া কাব্য-উৎস উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল?—করুণার আঘাতে। রামায়ণ করুণার অশ্রুনির্ঝর ক্রৌঞ্চবিরহীর শোকার্ত্ত ক্রন্দন রামায়ণ-কথার মর্ম্মস্থলে ধ্বনিত হইতেছে। রাবণও ব্যাধের মত প্রেমিকযুগলকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে। লঙ্কাকাণ্ডের যুদ্ধব্যাপার উন্মত্ত বিরহীর পাখার ঝট্‌পটি। রাবণ যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিল, মৃত্যুবিচ্ছেদের অপেক্ষাও তাহা ভয়ানক। মিলনের পরেও এ বিচ্ছেদের প্রতীকার হইল না।

সুখের আয়োজনটি কেমন সুন্দর হইয়া আসিয়াছিল! পিতার স্নেহ, প্রজাদের প্রীতি, ভ্রাতার প্রণয়—তাহারই মাঝখানে ছিল নবপরিণীতা রামসীতার যুগলমিলন। যৌবরাজ্যের অভিষেক এই সুখসম্ভোগকে সম্পূর্ণ এবং মহীয়ান্ করিবার জন্যই উপস্থিত হইয়াছিল। ঠিক এমনি সময়েই ব্যাধ শর লক্ষ্য করিল—সেই শর বিদ্ধ হইল সীতাহরণকালে। তাহার পরে, শেষ পর্য্যন্ত বিরহের আর অন্ত রহিল না। দাম্পত্যসুখের নিবিড়তম আরম্ভের সময়েই তাহার দারুণতম অবসান।

ক্রৌঞ্চমিথুনের গল্পটি রামায়ণের মূল ভাবটির সংক্ষিপ্ত রূপক। মূল কথা এই, লোকে এই সত্যটুকু নিঃসন্দেহে আবিষ্কার করিয়াছে

যে. মহাকবির নির্ম্মল অনুষ্টুপ্ ছন্দঃপ্রবাহ করুণার উত্তাপেই বিগলিত হইয়া স্পন্দমান হইয়াছে,—অকালে দাম্পত্যপ্রেমের চিরবিচ্ছেদঘটনই ঋষির করুণার্দ্র কবিত্বকে উন্মথিত করিয়াছে।

আবার আর একটি গল্প আছে—রত্নাকরের কাহিনী। সে আর এক ভাবের কথা;—রামায়ণের কাব্যপ্রকৃতির আর এক দিকের সমালোচনা। এই গল্প রামায়ণের রামচরিত্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছে। এই গল্পে বলিতেছে, রামসীতার বিচ্ছেদদুঃখের অপরিসীম করুণা যে রামায়ণের প্রধান অবলম্বন, তাহা নহে; রামচরিত্রের প্রতি ভক্তিই ইহার মূল। দস্যুকে কবি করিয়া তুলিয়াছে, রামের এমন চরিত্র,—ভক্তির এমন প্রবলতা। রামায়ণের রাম যে ভারতবর্ষের চক্ষে কত বড় হইয়া দেখা দিয়াছেন, এই গল্পে যেন তাহা মাপিয়া দিতেছে।

এই দু'টি গল্পেই বলিতেছে, প্রতিদিনের কথাবার্ত্তা, চিঠিপত্র, দেখাসাক্ষাৎ, কাজকর্ম্ম, শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে কবিত্বের মূল নাই—তাহার মূলে একটি বৃহৎ আবেগের সঞ্চার, যেন একটি আকস্মিক অলৌকিক আবির্ভাবের মত—তাহা কবির আয়ত্তের অতীত। কবিকঙ্কণ যে কাব্য লিখিয়াছেন, তাহাও স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়া। কালিদাসের সম্বন্ধে যে গল্প আছে, তাহাও এইরূপ। অকস্মাৎ দৈবপ্রভাবে তিনি কবিত্বরসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন। বাল্মীকি নিষ্ঠুর দস্যু ছিলেন এবং কালিদাস অরসিক মূর্খ ছিলেন, এই উভয়ের একই তাৎপর্য্য।

এই গল্পগুলি জনগণ কবির জীবন হইতে সংগ্রহ করে নাই, তাঁহার কাব্য হইতে সংগ্রহ করিয়াছে। কবির জীবন হইতে যে সকল তথ্য পাওয়া যাইতে পারিত, কবির কাব্যের সহিত তাহার

কোন গভীর ও চিরস্থায়ী যোগ থাকিত না। বাল্মীকির প্রাত্যহিক কথাবার্ত্তা, কাজকর্ম্ম কখনই তাঁহার রামায়ণের সহিত তুলনীয় হইতে পারিত না, কারণ সেই সকল ব্যাপার সাময়িক, অনিত্য ;— রামায়ণ তাঁহার অন্তর্গত নিত্যপ্রকৃতির—সমগ্রপ্রকৃতির সৃষ্টি ; তাহা এক অনির্ব্বচনীয় অপরিমেয় শক্তির বিকাশ—তাহা অন্যান্য কাজকর্ম্মের মত ক্ষণিক-বিক্ষোভ-জনিত নহে।

খোকাবাবুর প্রত্যাবর্ত্তন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাইচরণ যখন বাবুদের বাড়ি প্রথম চাকরি করিতে আসে তখন তাহার বয়স বারো। যশোহর জিলায় বাড়ি। লম্বা চুল, বড়ো বড়ো চোখ, শ্যামচিক্কণ ছিপছিপে বালক। জাতিতে কায়স্থ। তাহার প্রভুরাও কায়স্থ। বাবুদের এক বৎসর বয়স্ক একটি শিশুর রক্ষণ ও পালন কার্য্যে সহায়তা করা তাহার প্রধান কর্ত্তব্য ছিল।

সেই শিশুটি কালক্রমে রাইচরণের কক্ষ ছাড়িয়া স্কুলে, স্কুল ছাড়িয়া কলেজে, অবশেষে কলেজ ছাড়িয়া মুন্সেফিতে প্রবেশ করিয়াছে। রাইচরণ এখনো তাঁহার ভৃত্য।

তাহার আর একটি মনিব বাড়িয়াছে; মাতাঠাকুরাণী ঘরে আসিয়াছেন; সুতরাং অনুকূল বাবুর উপর রাইচরণের পূর্ব্বে যতটা অধিকার ছিল তাহার অধিকাংশই নূতন কর্ত্রীর হস্তগত হইয়াছে।

কিন্তু কর্ত্রী যেমন রাইচরণের পূর্ব্বাধিকার কতকটা হ্রাস করিয়া লইয়াছেন তেমনি একটি নূতন অধিকার দিয়া অনেকটা পূরণ করিয়া দিয়াছেন। অনুকূলের একটি পুত্রসন্তান অল্পদিন হইল জন্মলাভ করিয়াছে—এবং রাইচরণ কেবল নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে।

তাহাকে এমনি উৎসাহের সহিত দোলাইতে আরম্ভ করিয়াছে, এমনি নিপুণতার সহিত তাহাকে দুই হাতে ধরিয়া আকাশে

10—1340 B.T.

উৎক্ষিপ্ত করে, তাহার মুখের কাছে আসিয়া এমনি সশব্দে শিরশ্চালন করিতে থাকে, উত্তরের কোনো প্রত্যাশা না করিয়া এমন সকল সম্পূর্ণ অর্থহীন অসঙ্গত প্রশ্ন সুর করিয়া শিশুর প্রতি প্রয়োগ করিতে থাকে যে, এই ক্ষুদ্র আহুকোলবটি রাইচরণকে দেখিলে একেবারে পুলকিত হইয়া উঠে।

অবশেষে ছেলেটি যখন হামাগুড়ি দিয়া অতি সাবধানে চৌকাঠ পার হইত এবং কেহ ধরিতে আসিলে খিল্ খিল্ হাস্যকলরব তুলিয়া দ্রুতবেগে নিরাপদ স্থানে লুকাইতে চেষ্টা করিত, তখন রাইচরণ তাহার অসাধারণ চাতুর্য্য ও বিচারশক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া যাইত। মার কাছে গিয়া সগর্ব্ব বিস্ময়ে বলিত, "মা, তোমার ছেলে বড়ো হলে জজ হবে, পাঁচ হাজার টাকা রোজগার করবে।"

পৃথিবীতে আর কোনো মানবসন্তান যে, এই বয়সে চৌকাঠ লঙ্ঘন প্রভৃতি অসম্ভব চাতুর্য্যের পরিচয় দিতে পারে তাহা রাইচরণের ধ্যানের অগম্য, কেবল ভবিষ্যৎ জজদের পক্ষে কিছুই আশ্চর্য্য নহে।

অবশেষে শিশু যখন টল্‌মল্ করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার, এবং যখন মাকে মা, পিসিকে পিচি, এবং রাইচরণকে চন্ন বলিয়া সম্ভাষণ করিল, তখন রাইচরণ সেই প্রত্যয়াতীত সংবাদ যাহার তাহার কাছে ঘোষণা করিতে লাগিল।

সব চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, "মাকে মা বলে, পিসিকে পিসি বলে, কিন্তু আমাকে বলে চন্ন!" বাস্তবিক শিশুর মাথায় এ বুদ্ধি কী করিয়া যোগাইল বলা শক্ত। নিশ্চয়ই কোনো বয়স্ক

লোক কখনই এরূপ অলোকসামান্যতার পরিচয় দিত না, এবং দিলেও তাহার জজের পদপ্রাপ্তিসম্ভাবনা সম্বন্ধে সাধারণের সম্পূর্ণ সন্দেহ উপস্থিত হইত।

কিছুদিন বাদে মুখে দড়ি দিয়া রাইচরণকে ঘোড়া সাজিতে হইল। মল্ল সাজিয়া তাহাকে শিশুর সহিত কুস্তি করিতে হইত—আবার পরাভূত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া না গেলে বিষম বিপ্লব বাধিত।

এই সময়ে অনুকূল পদ্মাতীরবর্ত্তী এক জিলায় বদলি হইলেন। অনুকূল তাঁহার শিশুর জন্য কলিকাতা হইতে এক ঠেলাগাড়ি লইয়া গেলেন। সাটিনের জামা এবং মাথায় একটা জরির টুপি, হাতে সোনার বালা এবং পায়ে দুইগাছি মল পরাইয়া রাইচরণ নবকুমারকে দুই বেলা গাড়ি করিয়া হাওয়া খাওয়াইতে লইয়া যাইত।

বর্ষাকাল আসিল। ক্ষুধিত পদ্মা উদ্যান গ্রাম শস্যক্ষেত্র এক এক গ্রাসে মুখে পুরিতে লাগিল। বালুকাচরের কাশবন এবং বনঝাউ জলে ডুবিয়া গেল। পাড় ভাঙার অবিশ্রাম ঝুপ্ ঝাপ্ শব্দ এবং জলের গর্জ্জনে দশদিক মুখরিত হইয়া উঠিল, এবং দ্রুতবেগে ধাবমান ফেনরাশি নদীর তীব্রগতিকে প্রত্যক্ষগোচর করিয়া তুলিল।

অপরাহ্ণে মেঘ করিয়াছিল, কিন্তু বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা ছিল না। রাইচরণের খামখেয়ালী ক্ষুদ্র প্রভু কিছুতেই ঘরে থাকিতে চাহিল না। গাড়ির উপর চড়িয়া বসিল। রাইচরণ ধীরে ধীরে গাড়ি ঠেলিয়া ধান্যক্ষেত্রের প্রান্তে নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। নদীতে একটিও নৌকা নাই, মাঠে

একটিও লোক নাই—মেঘের ছিদ্র দিয়া দেখা গেল, পরপারে জনহীন বালুকাতীরে শব্দহীন দীপ্ত সমারোহের সহিত সূর্য্যাস্তের আয়োজন হইতেছে। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে শিশু সহসা একদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "চন্ন ফু।"

অনতিদূরে সজল পঙ্কিল ভূমির উপর একটি বৃহৎ কদম্ব-বৃক্ষের উচ্চশাখায় গুটিকতক কদম্ব-ফুল ফুটিয়াছিল, সেই দিকে শিশুর লুব্ধ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। দুই চারি দিন হইল রাইচরণ কাঠি দিয়া বিদ্ধ করিয়া তাহাকে কদম্ব-ফুলের গাড়ি বানাইয়া দিয়াছিল, তাহাতে দড়ি বাঁধিয়া টানিতে এত আনন্দ বোধ হইয়াছিল যে, সেদিন রাইচরণকে আর লাগাম পরিতে হয় নাই; ঘোড়া হইতে সে একেবারেই সহিসের পদে উন্নীত হইয়াছিল।

কাদা ভাঙিয়া ফুল তুলিতে যাইতে চন্নর প্রবৃত্তি হইল না— তাড়াতাড়ি বিপরীত দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "দেখো দেখো ও—ই দেখো পাখী—ওই উড়ে—এ গেলো! আয়রে পাখী আয় আয়"—এইরূপ অবিশ্রান্ত বিচিত্র কলরব করিতে করিতে সবেগে গাড়ি ঠেলিতে লাগিল।

কিন্তু যে ছেলের ভবিষ্যতে জজ হইবার কোনো সম্ভাবনা আছে, তাহাকে এরূপ সামান্ত উপায়ে ভুলাইবার প্রত্যাশা করা বৃথা—বিশেষত চারিদিকে দৃষ্টি আকর্ষণের উপযোগী কিছুই ছিল না এবং কাল্পনিক পাখী লইয়া অধিকক্ষণ কাজ চলে না।

রাইচরণ বলিল, "তবে তুমি গাড়িতে বসে থাকো, আমি চট্ করে ফুল তুলে আনচি। খবরদার জলের ধারে যেয়ো না।" বলিয়া হাঁটুর উপর কাপড় তুলিয়া কদম্ব-বৃক্ষের অভিমুখে চলিল।

কিন্তু ঐ যে জলের ধারে যাইতে নিষেধ করিয়া গেল, তাহাতে

শিশুর মন কদম্ব-ফুল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সেই মুহূর্তেই জলের দিকে ধাবিত হইল। দেখিল, জল খল্‌খল্‌ ছল্‌ছল্‌ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে; যেন দুষ্টামি করিয়া কোন্‌ এক বৃহৎ রাইচরণের হাত এড়াইয়া এক লক্ষ শিশুপ্রবাহ সহাস্য কলস্বরে নিষিদ্ধ স্থানাভিমুখে দ্রুতবেগে পলায়ন করিতেছে।

তাহাদের সেই অসাধু দৃষ্টান্তে মানবশিশুর চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। গাড়ি হইতে আস্তে আস্তে নামিয়া জলের ধারে গেল—একটা দীর্ঘ তৃণ কুড়াইয়া লইয়া তাহাকে ছিপ কল্পনা করিয়া ঝুঁকিয়া মাছ ধরিতে লাগিল—দুরন্ত জলরাশি অস্ফুট কলভাষায় শিশুকে বারবার আপনাদের খেলাঘরে আহ্বান করিল।

একবার ঝপ্‌ করিয়া একটা শব্দ হইল, কিন্তু বর্ষার পদ্মাতীরে এমন শব্দ কত শোনা যায়! রাইচরণ আঁচল ভরিয়া কদম্ব-ফুল তুলিল। গাছ হইতে নামিয়া সহাস্যমুখে গাড়ির কাছে আসিয়া দেখিল কেহ নাই। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল কোথাও কাহারও কোনো চিহ্ন নাই।

মুহূর্তে রাইচরণের শরীরের রক্ত হিম হইয়া গেল। সমস্ত জগৎসংসার মলিন বিবর্ণ ধোঁয়ার মতো হইয়া আসিল। ভাঙা বুকের মধ্য হইতে একবার প্রাণপণ চীৎকার করিয়া ডাকিয়া উঠিল, "বাবু—খোকাবাবু, লক্ষ্মী, দাদাবাবু আমার!"

কিন্তু চন্ন বলিয়া কেহ উত্তর দিল না, দুষ্টামি করিয়া কোনো শিশুর কণ্ঠ হাসিয়া উঠিল না; কেবল পদ্মা পূর্ব্ববৎ ছল্‌ছল্‌ খল্‌খল্‌ করিয়া ছুটিয়া চলিতে লাগিল, যেন সে কিছুই জানে না এবং পৃথিবীর এই সকল সামান্য ঘটনায় মনোযোগ দিতে তাহার যেন এক মুহূর্ত সময় নাই।

সন্ধ্যা হইয়া আসিলে উৎকণ্ঠিত জননী চারিদিকে লোক পাঠাইয়া দিলেন। লণ্ঠন-হাতে নদীতীরে লোক আসিয়া দেখিল, রাইচরণ নিশীথের ঝোড়ো বাতাসের মত সমস্ত ক্ষেত্রময় "বাবু, খোকাবাবু আমার" ভগ্নকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বেড়াইতেছে। অবশেষে ঘরে ফিরিয়া রাইচরণ দড়াম্ করিয়া মাঠাকরুণের পায়ের কাছে আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল। তাহাকে যত জিজ্ঞাসা করে সে কাঁদিয়া বলে, "জানিনে মা।"

যদিও সকলেই মনে মনে বুঝিল, পদ্মারই এই কাজ, তথাপি গ্রামের প্রান্তে যে একদল বেদের সমাগম হইয়াছে তাহাদের প্রতিও সন্দেহ দূর হইল না। এবং মাতাঠাকুরাণীর মনে এমন সন্দেহ উপস্থিত হইল যে, রাইচরণই বা চুরি করিয়াছে; এমন কি, তাহাকে ডাকিয়া অত্যন্ত অনুনয়পূর্ব্বক বলিলেন, "তুই আমার বাছাকে ফিরিয়ে এনে দে—তুই যত টাকা চা'স্ তোকে দেবো।" শুনিয়া রাইচরণ কেবল কপালে করাঘাত করিল। গৃহিণী তাহাকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিলেন।

অনুকূল বাবু তাঁহার স্ত্রীর মন হইতে রাইচরণের প্রতি এই অন্যায় সন্দেহ দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন রাইচরণ এমন জঘন্য কাজ কী উদ্দেশ্যে করিতে পারে। গৃহিণী বলিলেন, "কেন? তাহার গায়ে সোনার গহনা ছিল।"

রাইচরণ দেশে ফিরিয়া গেল। এতকাল তাহার সন্তানাদি হয় নাই। কিন্তু দৈবক্রমে, বৎসর না যাইতেই তাহার স্ত্রী অধিক বয়সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়া লোকলীলা সংবরণ করিল।

এই নবজাত শিশুটির প্রতি রাইচরণের অত্যন্ত বিদ্বেষ জন্মিল। মনে করিল, এ যেন ছল করিয়া খোকাবাবুর স্থান অধিকার করিতে আসিয়াছে। মনে করিল, প্রভুর একমাত্র ছেলেটি জলে ভাসাইয়া নিজে পুত্রসুখ উপভোগ করা যেন একটি মহাপাতক। রাইচরণের বিধবা ভগ্নী যদি না থাকিত তবে এ শিশুটি পৃথিবীর বায়ু বেশি দিন ভোগ করিতে পারিত না।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই ছেলেটিও কিছুদিন বাদে চৌকাঠ পার হইতে আরম্ভ করিল, এবং সর্ব্বপ্রকার নিষেধ লঙ্ঘন করিতে সকৌতুক চতুরতা প্রকাশ করিতে লাগিল। এমন কি, ইহার কণ্ঠস্বর হাস্যক্রন্দনধ্বনি অনেকটা সেই শিশুরই মতো। এক-একদিন যখন ইহার কান্না শুনিত, রাইচরণের বুকটা সহসা ধড়াস্ করিয়া উঠিত, মনে হইত দাদাবাবু রাইচরণকে হারাইয়া কোথায় কাঁদিতেছে।

ফেল্‌না—রাইচরণের ভগ্নী ইহার নাম রাখিয়াছিল ফেল্‌না—যথাসময় পিসিকে পিসি বলিয়া ডাকিল। সেই পরিচিত ডাক শুনিয়া একদিন হঠাৎ রাইচরণের মনে হইল—তবে তো খোকাবাবু আমার মায়া ছাড়িতে পারে নাই। সে তো আমার ঘরে আসিয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

তখন মাঠাকুরুণের সেই দারুণ সন্দেহের কথা, হঠাৎ মনে পড়িল—আশ্চর্য্য হইয়া মনে মনে কহিল, "আহা মায়ের মন জানিতে পারিয়াছিল, তাহার ছেলেকে কে চুরি করিয়াছে।"—তখন, এতদিন শিশুকে যে অযত্ন করিয়াছে, সেজন্য বড় অনুতাপ উপস্থিত হইল। শিশুর কাছে আবার ধরা দিল।

এখন হইতে ফেল্‌নাকে রাইচরণ এমন করিয়া মানুষ করিতে

লাগিল যেন সে বড় ঘরের ছেলে। সাটিনের জামা কিনিয়া দিল। জরির টুপি আনিল। মৃত স্ত্রীর গহনা গলাইয়া চুড়ি এবং বালা তৈয়ারী হইল। পাড়ার কোনো ছেলের সহিত তাহাকে খেলিতে দিত না—রাত্রিদিন নিজেই তাহার একমাত্র খেলার সঙ্গী হইল। পাড়ার ছেলেরা সুযোগ পাইলে তাহাকে নবাবপুত্র বলিয়া উপহাস করিত এবং দেশের লোক রাইচরণের এইরূপ উন্মত্তবৎ আচরণে আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

ফেল্‌নার যখন বিদ্যাভ্যাসের বয়স হইল তখন রাইচরণ নিজের জোত জমা সমস্ত বিক্রয় করিয়া ছেলেটিকে কলিকাতা লইয়া গেল। সেখানে বহুকষ্টে একটি চাকরির জোগাড় করিয়া ফেল্‌নাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইল। নিজে যেমন তেমন করিয়া থাকিয়া ছেলেকে ভালো খাওয়া, ভালো পরা, ভালো শিক্ষা দিতে ত্রুটি করিত না। মনে মনে বলিত, বৎস, ভালবাসিয়া আমার ঘরে আসিয়াছ বলিয়া যে তোমার কোন অযত্ন হইবে, তা হইবে না।

এমন করিয়া বারো বৎসর কাটিয়া গেল। ছেলে পড়ে শুনে ভালো এবং দেখিতে শুনিতেও বেশ, হৃষ্টপুষ্ট উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ—কেশবেশবিন্যাসের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি, মেজাজ কিছু সুখী এবং সৌখীন। বাপকে ঠিক বাপের মতো মনে করিতে পারিত না। কারণ, রাইচরণ স্নেহে বাপ, সেবায় ভৃত্য ছিল, এবং তাহার আর একটি দোষ ছিল, সে যে ফেল্‌নার বাপ এ কথা সকলের কাছেই গোপন রাখিয়াছিল। যে ছাত্রনিবাসে ফেল্‌না বাস করিত, সেখানকার ছাত্রগণ রাইচরণকে লইয়া সর্ব্বদা কৌতুক করিত, এবং পিতার অসাক্ষাতে ফেল্‌নাও যে সেই কৌতুকালাপে যোগ দিত না তাহা বলিতে পারি না। অথচ নিরীহ বৎসল-স্বভাব

রাইচরণকে সকল ছাত্রই বড়ো ভালোবাসিত, এবং ফেল্‌নাও ভালোবাসিত, কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি ঠিক বাপের মতো নহে, তাহাতে কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ মিশ্রিত ছিল।

রাইচরণ বৃদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। তাহার প্রভু কাজ কর্ম্মে সর্ব্বদাই দোষ ধরে। বাস্তবিক তাহার শরীরও শিথিল হইয়া আসিয়াছে, কাজেও তেমন মন দিতে পারে না, কেবলি ভুলিয়া যায়—কিন্তু যে ব্যক্তি পুরা বেতন দেয় বার্দ্ধক্যের ওজর সে মানিতে চাহে না। এদিকে রাইচরণ বিষয় বিক্রয় করিয়া যে নগদ টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল তাহাও নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। ফেল্‌না আজ-কাল বসনভূষণের অভাব লইয়া সর্ব্বদাই খুঁৎখুঁৎ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

একদিন রাইচরণ হঠাৎ কর্ম্মে জবাব দিল এবং ফেল্‌নাকে কিছু টাকা দিয়া বলিল,—আবশ্যক পড়িয়াছে, আমি কিছু দিনের মতো দেশে যাইতেছি। এই বলিয়া বারাসতে গিয়া উপস্থিত হইল। অনুকূল বাবু তখন সেখানে মুন্সেফ ছিলেন।

অনুকূলের আর দ্বিতীয় সন্তান হয় নাই, গৃহিণী এখনো সেই পুত্রশোক বক্ষের মধ্যে লালন করিতেছিলেন।

একদিন সন্ধ্যার সময় বাবু কাছারি হইতে আসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন এবং কর্ত্রী একটি সন্ন্যাসীর নিকট হইতে সন্তান-কামনায় বহুমূল্যে একটি শিকড় ও আশীর্ব্বাদ কিনিতেছেন—এমন সময়ে প্রাঙ্গণে শব্দ উঠিল—"জয় হোক্ মা।"

বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে রে?"

রাইচরণ আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, "আমি রাইচরণ।"

বৃদ্ধকে দেখিয়া অনুকূলের হৃদয় আর্দ্র হইয়া উঠিল। তাহার বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে সহস্র প্রশ্ন এবং আবার তাহাকে কর্মে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিলেন।

রাইচরণ ম্লান হাস্য করিয়া কহিল, "মাঠাকৃরুণকে একবার প্রণাম করিতে চাই।"

অনুকূল তাহাকে সঙ্গে করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। মাঠাকৃরুণ রাইচরণকে তেমন প্রসন্নভাবে সমাদর করিলেন না—রাইচরণ তৎপ্রতি লক্ষ্য না করিয়া জোড়হস্তে কহিল—"প্রভু, মা, আমিই তোমাদের ছেলেকে চুরি করিয়া লইয়াছিলাম। পদ্মাও নয়, আর কেহও নয়, কৃতঘ্ন অধম এই আমি"—

অনুকূল বলিয়া উঠিলেন, "বলিস্ কিরে। কোথায় সে।"

"আজ্ঞা, আমার কাছেই আছে, আমি পরশ্ব আনিয়া দিব।"

সেদিন রবিবার কাছারি নাই। প্রাতঃকাল হইতে স্ত্রী পুরুষে দুইজনে উন্মুখভাবে পথ চাহিয়া বসিয়া আছেন। দশটার সময় ফেল্‌নাকে সঙ্গে লইয়া রাইচরণ উপস্থিত হইল।

অনুকূলের স্ত্রী কোনো প্রশ্ন কোনো বিচার না করিয়া তাহাকে কোলে বসাইয়া, তাহাকে স্পর্শ করিয়া, তাহার আঘ্রাণ লইয়া অতৃপ্ত নয়নে মুখ নিরীক্ষণ করিয়া, কাঁদিয়া হাসিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। বাস্তবিক ছেলেটি দেখিতে বেশ—বেশভূষা আকার-প্রকারে দারিদ্র্যের কোন লক্ষণ নাই। মুখে অত্যন্ত প্রিয়দর্শন বিনীত সলজ্জ ভাব দেখিয়া অনুকূলের হৃদয়েও সহসা স্নেহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

তথাপি তিনি অবিচলিত ভাব ধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোনো প্রমাণ আছে?"

রাইচরণ কহিল—"এমন কাজের প্রমাণ কী করিয়া থাকিবে? আমি যে তোমার ছেলে চুরি করিয়াছিলাম সে কেবল ভগবান জানেন, পৃথিবীতে আর কেহ জানে না।"

অনুকূল ভাবিয়া স্থির করিলেন যে, ছেলেটিকে পাইবামাত্র তাঁহার স্ত্রী যেরূপ আগ্রহের সহিত তাহাকে আগলাইয়া ধরিয়াছেন এখন প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা করা সুযুক্তি নহে; যেমনি হউক, বিশ্বাস করাই ভালো। তা ছাড়া, রাইচরণ এমন ছেলেই বা কোথায় পাইবে? এবং বৃদ্ধ ভৃত্য তাঁহাকে অকারণে প্রতারণাই বা কেন করিবে?—

ছেলেটির সহিতও কথোপকথন করিয়া জানিলেন যে, সে শিশুকাল হইতে রাইচরণের সহিত আছে এবং রাইচরণকে সে পিতা বলিয়া জানিত, কিন্তু রাইচরণ কখনো তাহার প্রতি পিতার ন্যায় ব্যবহার করে নাই, অনেকটা ভৃত্যের ভাব ছিল।

অনুকূল মন হইতে সন্দেহ দূর করিয়া বলিলেন—"কিন্তু রাইচরণ, তুই আর আমাদের ছায়া মাড়াইতে পাইবি না।"

রাইচরণ করজোড়ে গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিল, "প্রভু, বৃদ্ধবয়সে কোথায় যাইব।"

কর্ত্রী বলিলেন, "আহা থাক্। আমার বাছার কল্যাণ হউক। ওকে আমি মাপ করিলাম।"

ন্যায়পরায়ণ অনুকূল কহিলেন, "যে কাজ করিয়াছে উহাকে মাপ করা যায় না।"

রাইচরণ অনুকূলের পা জড়াইয়া কহিল, "আমি করি নাই, ঈশ্বর করিয়াছেন।"

নিজের পাপ ঈশ্বরের স্কন্ধে চাপাইবার চেষ্টা দেখিয়া অনুকূল

আরও বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "যে এমন বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করিয়াছে তাহাকে আর বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নয়।"

রাইচরণ প্রভুর পা ছাড়িয়া কহিল, "সে আমি নয় প্রভু!"

"তবে কে?"

"আমার অদৃষ্ট!"

কিন্তু এরূপ কৈফিয়তে কোনো শিক্ষিত লোকের সন্তোষ হইতে পারে না।

রাইচরণ বলিল, "পৃথিবীতে আমার আর কেহ নাই।"

ফেল্‌না যখন দেখিল সে মুন্সেফের সন্তান, রাইচরণ তাহাকে এতদিন চুরি করিয়া নিজের ছেলে বলিয়া অপমানিত করিয়াছে তখন তাহার মনে মনে কিছু রাগ হইল। কিন্তু তথাপি উদারভাবে পিতাকে বলিল, "বাবা উহাকে মাপ করো। বাড়িতে থাকিতে না দাও, উহার মাসিক কিছু টাকা বরাদ্দ করিয়া দাও।"

ইহার পর রাইচরণ কোনো কথা না বলিয়া একবার পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করিল, সকলকে প্রণাম করিল; তাহার পর দ্বারের বাহির হইয়া পৃথিবীর অগণ্য লোকের মধ্যে মিশিয়া গেল। মাসান্তে অনুকূল যখন তাহার দেশের ঠিকানায় কিঞ্চিৎ বৃত্তি পাঠাইলেন তখন সে টাকা ফিরিয়া আসিল। সেখানে ও নামে কোনো লোক নাই।

———

আলিনগরের সন্ধি

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

[নদীয়া জেলার সিমলা গ্রামে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে অক্ষয়কুমার জন্মগ্রহণ করেন। ইনি রাজসাহীর প্রসিদ্ধ উকিল ও বিশিষ্ট বাগ্মী ছিলেন। 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি'র প্রতিষ্ঠাতৃগণের মধ্যে ইনি অন্যতম। 'সিরাজদ্দৌলা' নামক প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থ ইঁহাকে অমরত্ব দিয়াছে; এই গ্রন্থে এবং 'মীরকাশিম' ও 'গৌড় লেখমালা'র ইঁহার অনুসন্ধিৎসা ও অসাধারণ দেশপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়।]

মুসলমান ইতিহাস-লেখক সাইয়েদ গোলাম হোসেন লিখিয়া গিয়াছেন, "ইংরাজেরা যখন হুগলী-লুণ্ঠনে অবসরশূন্য, ঠিক সেই সময়ে বিলাত হইতে সংবাদ পাইলেন যে, এদেশে ফরাসীদিগের সঙ্গে আবার সমরকলহ উপস্থিত হইয়াছে। ইংরাজ এবং ফরাসী শান্তভাবে জীবনধারণ করিতে শিখিল না। ইহাদের মধ্যে পাঁচ ছয় শত বৎসর কেবল যুদ্ধকলহ চলিয়া আসিতেছে। কখন কখন রণশ্রান্ত হইলে, পরামর্শ করিয়া হাঁফ ছাড়িবার জন্য উভয়েই কিছুদিনের মত সন্ধি-সংস্থাপন করে;—কিন্তু কিছুদিন বিশ্রামলাভ করিয়াই পুনরায় সমর-পিপাসায় উন্মত্ত হইয়া উঠে!"

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন ইংরাজদিগের মত ফরাসীরাও ভারতবর্ষে ধীরে ধীরে বাহুবল সুবিস্তৃত করিতেছিলেন। তাঁহারা বাণিজ্যোপলক্ষে বাঙ্গালাদেশে তিনশত গোরা এবং অনেকগুলি সুশিক্ষিত গোলন্দাজ রাখিতেন। এদেশের লোকের নিকট ইংরাজ অপেক্ষা ফরাসীরাই বীরকীর্ত্তির জন্য সমধিক

সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। স্বদেশে ফরাসীজাতির সহিত সমর-কোলাহল উপস্থিত হওয়ায়, ইংরাজদিগের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। চিরশত্রু ফরাসীসেনার সঙ্গে নবাবের সেনাদল মিলিত হইলে, ইংরাজের সর্ব্বনাশ হইতে কতক্ষণ? ক্লাইভ তাহা বুঝিতেন। তিনি বিলাতের সংবাদ পাইবামাত্র শিহরিয়া উঠিলেন, এবং এই দুঃসময়ে সহসা সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে কলহের সূত্রপাত করিয়া যে সমূহ অমঙ্গল আহ্বান করিয়া আনিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তাড়াতাড়ি উমিচাঁদ এবং জগৎশেঠের শরণাগত হইয়া কিংকর্ত্তব্য অবধারণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এদিকে অকস্মাৎ হুগলী-লুণ্ঠনের সমাচার শুনিয়া সিরাজদ্দৌলা ক্রোধোন্মত্ত-হৃদয়ে কলিকাতাভিমুখে সসৈন্য অগ্রসর হইতেছেন; ইংরাজগণ সন্ধির জন্য ব্যাকুল হইলে কি হইবে? নবাব কি আর সন্ধির প্রস্তাবে কর্ণপাত করিবেন? কিন্তু সিরাজদ্দৌলা অগ্রপশ্চাৎ বিচার করিয়া শান্তি সংস্থাপনের জন্যই সমধিক আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। কর্ণেল ক্লাইব নিজেই স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, সন্ধির জন্য তাঁহাকে বিশেষ উদ্বেগ পাইতে হয় নাই;—স্বয়ং সিরাজদ্দৌলাই সর্ব্বাগ্রে সন্ধির প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া সকল আশঙ্কা নিবারণ করিয়াছিলেন।

সিরাজদ্দৌলা সন্ধির প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন কেন? ইংরাজের সঙ্গে সন্ধি! যদি সত্যসত্যই সন্ধি সংস্থাপিত হয়, তথাপি কয়দিন তাহার মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে? স্বদেশের নিকটতম প্রতিবাসীর সঙ্গে যাঁহাদিগের কলহ-বিবাদ ছয়শত বৎসরেও শান্তিলাভ করিল না, বিদেশে তাঁহাদিগের ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞা

কয়দিন প্রতিপালিত হইবে? তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস কি? এই ত সে দিন তাঁহারা বিপদে পড়িয়া সন্ধির প্রস্তাব তুলিয়াছিলেন, কিন্তু সেকথা পুরাতন না হইতেই লুণ্ঠন-লোভে হুগলীর কিরূপ সর্ব্বনাশ করিয়া আসিয়াছেন!

যদিও অনেকে এই সকল কথা উত্থাপিত করিয়া সন্ধির প্রস্তাবে বাধা দিবার আয়োজন করিতে ত্রুটি করিলেন না, তথাপি সিরাজদ্দৌলা সে সকল কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি কলিকাতায় শিবির-সংস্থাপন করিয়াই সন্ধিপত্র নির্দ্ধারণ করিবার জন্য ইংরাজদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। সিরাজদ্দৌলা কি ইংরাজ-ভয়ে ভীত হইয়াই সন্ধির জন্য এরূপ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন? কেহ কেহ বলেন যে, তাহাই একমাত্র কারণ। কিন্তু ইংরাজেরা তৎকালে যেরূপ বিপদ্‌বেষ্টিত, তাহাতে ভীত হইবার কারণ ছিল না;—তাঁহাদের সেনাবল অল্প; তাহারও কিয়দংশ বঙ্গোপসাগরে তরঙ্গতাড়িত হইয়া কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে; যাহারা বঙ্গদেশে পদার্পণ করিয়াছিল, তাহারাও সকলে জীবিত নাই; আর যাহারা জীবিত, বাঙ্গালার জলবায়ু অল্পদিনের মধ্যেই তাহাদিগকে জীবন্মৃত করিয়া ফেলিয়াছে। মহাবীর ক্লাইব সিরাজসেনার গতিরোধ করিতে গিয়া নিজেই পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সুতরাং ইহাদের ভয়ে ভীত হইবার কারণ ছিল না;—তথাপি সিরাজদ্দৌলা সন্ধির জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন কেন?

সিরাজদ্দৌলা ইংরাজদিগকে ভালমানুষ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না; তাঁহার বাল্যসংস্কারের সহিত যৌবনের অভিজ্ঞতা মিলিত হইয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিল যে, ইংরাজদমন করিতে না

পারিলে সিংহাসন নিষ্কণ্টক হইবে না। নবাব আলিবর্দ্দীও অন্তিম সময়ে তাহাই বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। সিরাজদ্দৌলা সে কথার ক্রমশঃ পরিচয় পাইতে লাগিলেন, এবং দিব্যনেত্রে ইংরাজের কীর্ত্তিকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আতঙ্কযুক্ত হইলেন। আজ হুগলী বিপর্য্যস্ত হইল, কাল হয় ত অন্য কোন স্থান বিধ্বস্ত হইবে। সিরাজ দেখিলেন যে, ইংরাজেরা দ্বিতীয় বর্গীর হাঙ্গামার সূত্রপাত করিবে, এবং একদিনের জন্য শান্তিসুখ উপভোগ করিবার অবসর ঘটিবে না! ইংরাজদিগকে বশীভূত করিবার দুইটিমাত্র সদুপায় ;—হয় শত্রুতাসাধনে, না হয় মিত্রতাবন্ধনে ; হয় করাল কৃপাণমুখে, না হয় লেখনীসাহায্যে। আলিবর্দ্দীর অন্তিম উপদেশ স্মরণ করিয়া শত্রুতাসাধন করিয়া দেখিলেন ;—তাহাতে হিতে বিপরীত হইল। ইংরাজ দমন হইল না ; বরং চিরশত্রুতার সূত্রপাত হইল। সুতরাং মিত্রতা-বন্ধনে ইংরাজদিগকে বশীভূত করিবার জন্যই সিরাজদ্দৌলা ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। ইহাতে তাঁহার প্রজাহিতৈষণা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া কুচক্রী মন্ত্রিদল তাঁহার প্রস্তাবে নানাপ্রকারে বাধা প্রদানের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

নওয়াজেস মোহম্মদ এবং শওকতজঙ্গের পরলোকগমনে কুচক্রিদলের সকল আশাই নির্ম্মূল হইয়াছিল। ইংরাজ একমাত্র শেষ সম্বল। তাঁহারা যদি সিরাজের সঙ্গে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইবার অবসর প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে সিরাজ নিশ্চিন্ত হইবেন। তাহাতে দেশের কল্যাণ, কিন্তু দুষ্টদলের সর্ব্বনাশ। নবাব এত দিন বিপদ্‌বেষ্টিত বলিয়াই তাঁহারা বাঁচিয়া রহিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাকে নিশ্চিন্ত হইবার অবসর প্রদান করিতে কাহরাও সাহস

হইল না। ইংরাজের সঙ্গে চির-শত্রুতা সঞ্জীবিত রাখিয়া সিরাজদ্দৌলাকে সর্ব্বদা সশঙ্কিত রাখিবার জন্যই সন্ধির প্রস্তাবের প্রতিবাদ আরম্ভ হইল। কিন্তু সিরাজদ্দৌলা আর কাহারও কথায় কর্ণপাত করিতে সম্মত হইলেন না।

ইংরাজেরা সন্ধির জন্য ব্যাকুল; সিরাজদ্দৌলাও সন্ধির জন্য লালায়িত। এ সন্ধির গতিরোধ করিবে কে? তখন কুচক্রিদলের কুমন্ত্রণা আরম্ভ হইল। প্রকাশ্য প্রতিবাদে পরাজিত হইয়া, অপ্রকাশ্য কৌশলবলে সিরাজদ্দৌলার শান্তি-পিপাসার গতিরোধ করিবার আয়োজন হইল।

সেকালের কলিকাতা সহরে বণিক্‌রাজ উমিচাঁদের রাজবাটীই সর্ব্বাপেক্ষা পরম রমণীয় স্থান বলিয়া সুপরিচিত ছিল। সুতরাং তাঁহার দীপালোক-বিভূষিত সুসজ্জিত পুষ্পোদ্যানেই সিরাজদ্দৌলার দরবার বসিল। চারিদিকে গর্ব্বোন্নতমস্তকে সশস্ত্র সেনাপতিগণ দণ্ডায়মান,—যথাযোগ্য রাজ-পরিচ্ছদে সুশোভিত হইয়া অমাত্যদল যথাস্থানে করজোড়ে উপবেশন করিয়াছেন;—মধ্যস্থলে সিংহাসন, তাহার উপর সুবিস্তৃত মস্‌নদ, কনকদণ্ডের উপর বিবিধ রত্নরাজি-বিজড়িত বিচিত্র চন্দ্রাতপ;—সেই স্বর্ণসিংহাসন উজ্জ্বল করিয়া সিরাজদ্দৌলার যৌবনোন্নত সুকুমার দেহকান্তি সদ্যোজাত প্রফুল্ল চম্পকের ন্যায় ফুটিয়া উঠিয়াছে;—ইংরাজ-প্রতিনিধি ওয়াল্‌স্‌ এবং ক্রাফ্‌টন্‌ দরবারে পদার্পণ করিয়া সিরাজদ্দৌলার সৌভাগ্যগর্ব্বের কলিতজ্যোতিতে স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। এই রত্ন-সিংহাসন যাঁহার পাদপীঠ, এই সুশিক্ষিত দৃঢ়োন্নত বীরমণ্ডলী যাঁহার সেনানায়ক, এই বিবিধ-বিদ্যাবিশারদ মন্ত্রিদল যাঁহার মন্ত্রণাসহায়, এই বিভবচ্ছটা যাঁহার রত্নমুকুট সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে,—

সর্ব্বনাশ। ইংরাজবণিক্ কোন্ সাহসে তাঁহার সহিত শক্তিপরীক্ষা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন? কিন্তু কিছুক্ষণ পরই তাঁহাদিগের মনে হইল,—এ সকল বুঝি ইন্দ্রজাল! এ সকল বুঝি ইংরাজ-দিগকে ভয় দেখাইবার বাহ্যাড়ম্বর! তখন তাঁহারা সাহসে বুক বাঁধিয়া ধীরে ধীরে সিংহাসনের দিকে অগ্রসর হইয়া সসম্ভ্রমে 'কুর্ণিশ' করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

সিরাজদ্দৌলা তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সাদরসম্ভাষণে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, সন্ধিসংস্থাপন করিবার জন্যই তিনি সশরীরে এতদূর অগ্রসর হইয়াছেন। ইংরাজেরা বলিলেন যে, তাঁহারাও সন্ধির জন্য লালায়িত হইয়াছেন; যুদ্ধকলহে তাঁহাদিগের বাণিজ্যবিস্তারে বিঘ্ন ঘটিতেছে। সিরাজদ্দৌলা তখন ইংরাজদিগকে সন্ধিপত্র নির্দ্ধারণ করিবার জন্য দেওয়ানের পটমণ্ডপে পাঠাইয়া দিয়া স্বয়ং বিশ্রামভবনে গমন করিলেন।

ইংরাজদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। তাঁহারা সহাস্যবদনে অভিবাদন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু কুচক্রী মন্ত্রিদলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল না। তাঁহারা সুকৌশলে সন্ধির প্রস্তাব চূর্ণ করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

যে দুইজন ইংরাজ রাজপুরুষ প্রতিনিধি সাজিয়া, হাতিয়ার বাঁধিয়া নবাব-দরবারে উপনীত হইয়াছিলেন, তাঁহারা কুঠিয়াল সিবিলিয়ান;—সিরাজদ্দৌলার নামে তাঁহাদের অন্তরাত্মা সহজেই কাঁপিয়া উঠিত। মন্ত্রিদল অনন্যোপায় হইয়া, এই ইংরাজযুগলের মনে সহসা ভয়ের সঞ্চার করিয়া কার্য্যোদ্ধারের আয়োজন করিলেন।

ইংরাজেরা দরবার হইতে বাহির হইবামাত্র সুচতুর উমিচাঁদ আসিয়া ধীরে ধীরে তাঁহাদের কাণে কাণে নিতান্ত পরমাত্মীয়ের

স্যায় বলিতে লাগিলেন,—"দেখিতেছ কি? প্রাণ বাঁচাইতে চাহ ত এখনই পলায়ন কর। সন্ধির প্রস্তাবে নিশ্চিন্ত হইয়াছ? এ সন্ধি নহে;—ইহা কেবল কালহরণের কুটিল কৌশল। নবাবের সেনাদল আসিয়াছে, কিন্তু কামানগুলি এখনও পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে; সেইজন্য তোমাদিগকে সন্ধির কথা উঠাইয়া প্রতারিত করিতেছে। কামান আসিলে আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব হইবে না। তোমরা কয়জন? সিরাজদ্দৌলার সেনাতরঙ্গের সম্মুখে কতক্ষণ দাঁড়াইতে পারিবে?" ইংরাজদ্বয়ের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। কি সর্ব্বনাশ! এই সাদর সম্ভাষণ, এই সন্ধির শান্তি সূচনা,—এ সকলই কেবল কালহরণের কুটিল কৌশল? এখন উপায় কি? মুখের ভাব দেখিয়া উমিচাঁদ বুঝিলেন যে,—ঔষধ ধরিয়াছে! তিনি অবসর পাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আর উপায় কি? দেওয়ানের পটমণ্ডপে গমন করিলেই বন্দী হইতে হইবে। এখনও সাবধান হও। মশাল নিভাইয়া দিয়া আঁধারে আঁধারে দুর্গমধ্যে পলায়ন কর।" যে কথা সেই কাজ;—ইংরাজেরা আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করিলেন না। কিন্তু কেহই ভাবিয়া দেখিলেন না যে, সিরাজদ্দৌলা কি কামান না লইয়া রিক্তহস্তে এতদূর অগ্রসর হইয়াছেন?

সিরাজদ্দৌলা এই কুটিল চক্রান্তের বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিলেন না; কিন্তু সে রজনীতে ইংরাজ-শিবিরে একজনও ঘুমাইবার অবসর পাইল না। ক্লাইব ভগ্নাঙ্গারের ন্যায় প্রদীপ্ত প্রতাপে ওয়াট্‌সনের নিকট ছুটিয়া চলিলেন। তাঁহার নিকট হইতে ছয়শত জাহাজী গোরা চাহিয়া লইয়া আপন পদাতিক সেনার সহিত সম্মিলিত করিলেন; এবং রজনী তিন ঘটিকাৰ

সময়ে নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে সসৈন্য নবাব-শিবির আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। নবাব-শিবিরে ৬০,০০০ সিপাহী এবং ১৮,০০০ অশ্বারোহী ৪০টি কামান লইয়া নিরুদ্বেগে নিদ্রামগ্ন;—তাহারা জাগিয়া উঠিলে যে ইংরাজের কি সর্ব্বনাশ ঘটিবে, ক্লাইব তাহা চিন্তা করিবার অবসর পাইলেন না।

একে নিশাকাল, তাহাতে নিদারুণ শীত। সকলেই নিঃশব্দ নিস্তব্ধ। সেই নৈশ নীরবতা আলোড়ন করিয়া ইংরাজের কামানগুলি ভীম কলরবে গর্জ্জন করিয়া উঠিল! গুড়ুম্—গুড়ুম্—গুম্; গুড়ুম্—গুড়ুম্—গুম্, গুড়ুম্—গুড়ুম্—গুম্;—ইংরাজের কামান ঘন ঘন ডাকিতে লাগিল, গুড়ুম্—গুড়ুম্—গুম্। সহসা সুপ্তোত্থিত হইয়া সিপাহী সেনা কামান গর্জ্জনের কারণ বুঝিতে পারিল না। তাহারা তুমুল কোলাহলে নবাব-শিবির আকুল করিয়া তুলিল; এবং যে যেখানে ছিল, হাতিয়ার বাঁধিয়া, মশাল জ্বালাইয়া কামানের নিকটে দাঁড়াইতে লাগিল। তখন নবাব-শিবিরের কামানগুলিও প্রচণ্ড বিক্রমে অনলবর্ষণ করিতে ত্রুটি করিল না।

সিরাজদ্দৌলা গাত্রোত্থান করিলেন। প্রভাত হইলেও ভাল করিয়া দৃষ্টিসঞ্চালনের উপায় হইল না;—ঘন-ঘনাকারে ধূমপুঞ্জ দিঙ্মণ্ডল আবরণ করিয়া ফেলিয়াছে, তাহার উপর কুজ্ঝটিকায় চারিদিক সমাচ্ছন্ন; নিকটে কি দূরে, কোনদিকেই নয়নসঞ্চালনের সুবিধা নাই। কেবল থাকিয়া থাকিয়া উভয় পক্ষের কামানগুলি কড়্ কড়্ করিয়া উঠিতেছে; আর মধ্যে মধ্যে আহতের আর্ত্তনাদ চারিদিক্ আকুল করিয়া তুলিতেছে! সকলেই বুঝিল যে, লড়াই বাধিয়াছে;—কিন্তু সহসা লড়াই বাধিবার কারণ কি, সে কথা কেহইবুঝাইতে পারিল না।

৭টা বাজিয়া গেল; তথাপি সেই ধূমপুঞ্জ, তথাপি সেই কামান-গর্জ্জন। কে কোথায় ছিটাইয়া পড়িয়াছে;—শত্রু নিকটে কি দূরে, কিছুই বুঝা যাইতেছে না; কেবল শব্দ লক্ষ্য করিয়া মুসলমানেরা কামানে অগ্নিসংযোগ করিতেছে, আর প্রদীপ্ত লৌহপিণ্ডরাশি তীব্রতেজে ছুটিয়া বাহির হইতেছে; যখন দিবালোক প্রস্ফুট হইয়া উঠিল, তখন সকলেই সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন যে, ক্লাইবের সমর-পিপাসা শান্ত হইয়াছে, তাঁহার গর্ব্বোন্নত গোরাসৈন্য দূরপথে হেঁটমুণ্ডে দুর্গাভিমুখে পলায়ন করিতেছে; আর মুসলমান-অশ্বসেনা তাহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে ঘোড়া ছুটাইয়া ধাবিত হইতেছে। ইংরাজদিগের দুইটি কামান মুসলমানেরা কাড়িয়া লইয়াছে; এখানে, ওখানে, সেখানে, চারিদিকে ইংরাজসেনার বীরমুণ্ড রুধিরকর্দ্দমে ধরাবিলুণ্ঠিত হইতেছে।

ইংরাজের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। একে সামান্য সেনাবল লইয়া ক্লাইব এবং ওয়াট্‌সন্ বঙ্গদেশে শুভাগমন করিয়াছিলেন; তাহাতে ক্লাইবের অবিমৃষ্যকারিতায় একদিনেই ১২০ জন ইংরাজ ধরাশায়ী হইয়াছে, এবং শতাধিক সিপাহীসেনা কালকবলে নিপতিত হইয়াছে। নবাব-শিবিরেও হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে; কত হতভাগা আর নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া বসিবার অবসর পায় নাই; কত সিপাহী শত্রুমিত্রের যুগপৎ অনলবর্ষণে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে।

সহসা এই যুদ্ধকোলাহল উপস্থিত হইল কেন? সিরাজদ্দৌলা তাহার কারণানুসন্ধান করিতে বসিয়া মন্ত্রিদলের মন্ত্রণার বাহাদুরি বুঝিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। মীরজাফরের ব্যবহার দেখিয়া স্পষ্টই

বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত নহেন। এই সেনাপতি, এই প্রভুভক্ত মন্ত্রিদল লইয়া ইংরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে সাহস হইল না; সিরাজদ্দৌলা নিরাপদ স্থানে সরিয়া গিয়া শিবির-সন্নিবেশ করিলেন, এবং তাড়াতাড়ি সন্ধিসংস্থাপনের জন্য ইংরাজ-দিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

যে সিরাজদ্দৌলা আবাল্য ইংরাজদলনে কৃতসংকল্প, তিনিই যে আবার সন্ধির জন্য সরলভাবে লালায়িত হইয়াছেন, ইংরাজেরা সে কথায় সহসা বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারিলেন না। ক্লাইব রণভীত হইয়া সন্ধির জন্য ব্যাকুল; কিন্তু ওয়াট্‌সন্ তাঁহাকে সাবধান করিবার জন্য পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন।

ক্লাইব কিন্তু ওয়াট্‌সনের পরামর্শে কর্ণপাত করিলেন না। মন্ত্রিদলের কুমন্ত্রণার সন্ধান পাইয়া সিরাজদ্দৌলা সন্ধির জন্য এতদূর ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, ক্লাইব যাহা চাহিলেন, তিনি তাহাতেই সম্মত হইয়া ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ৭ই ফেব্রুয়ারী সন্ধিপত্র সুস্থির করিয়া ফেলিলেন। ইংরাজদিগের অনুরোধ রক্ষার জন্য মীরজাফর এবং রায়দুর্লভকেও এই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে হইল। ইতিহাসে ইহারই নাম 'আলিনগরের সন্ধিপত্র'।

এই সন্ধিসূত্রে ইংরাজবণিক্ বাদশাহী ফরমানের লিখিত সমুদয় বাণিজ্যাধিকার পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। কলিকাতার দুর্গ-সংস্কারের অনুমতি প্রদত্ত হইল; কলিকাতায় টাঁকশাল বসাইয়া বাদসাহের নামে সিক্কা টাকা মুদ্রিত করিবার অধিকার প্রদত্ত হইল; এবং কলিকাতা লুণ্ঠন সময়ে ইংরাজদিগের যাহা কিছু ক্ষতি হইয়া থাকে, সিরাজদ্দৌলা তাহা পূরণ করিবার জন্য সম্মতিদান করিলেন।

সুয়েজ খালে

স্বামী বিবেকানন্দ

[ইঁহার নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত—'বিবেকানন্দ' ইঁহার সন্ন্যাসাশ্রমের নাম। ইনি ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার শিমুলিয়ার প্রসিদ্ধ দত্ত-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম বিশ্বনাথ দত্ত। নরেন্দ্রনাথ ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বি.এ. পাস করিয়া আইন অধ্যয়ন করিতেছিলেন, এমন সময়ে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের প্রভাবে সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। পরমহংসদেবের দেহত্যাগের পর, ছয় বৎসর কাল ইনি হিমালয়ে সাধনায় অতিবাহিত করেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার শিকাগো নগরে "পার্লামেণ্ট অব্ রিলিজনস্" নামক মহতী সভায় ইনি হিন্দুধর্ম্ম-সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া অসামান্য প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। আমেরিকার নানা স্থানে ইনি বক্তৃতা করিয়া তদ্দেশবাসীকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীদেশে পারী নগরে "কংগ্রেস অব্ রিলিজনস্" নামক সভায় ইঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভায় সকলে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ইঁহার য়ুরোপীয় শিষ্যগণের মধ্যে মিস্ মার্গারেট্ নোব্‌ল্ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন; ইনি 'ভগিনী নিবেদিতা' নামে পরিচিতা। স্বদেশে স্বামীজি 'রামকৃষ্ণ মিশন,' 'রামকৃষ্ণ হোম,' ব্রহ্মচর্য্য-বিদ্যালয়' প্রভৃতি বহু লোক-হিতকর প্রতিষ্ঠান ও সেবাশ্রম স্থাপন করেন। ইঁহার রচিত 'জ্ঞানযোগ,' 'কর্ম্মযোগ,' 'রাজযোগ,' 'শিকাগো বক্তৃতা,' 'ভক্তি-রহস্য' প্রভৃতি পুস্তকে ইঁহার জ্বলন্ত ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও স্বদেশ-প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ৪১ বৎসর বয়সে বিবেকানন্দ পরলোক-গমন করেন।]

এ সুয়েজ খাল খাতস্থাপত্যের এক অদ্ভুত নিদর্শন। ফর্ডিনেণ্ড লেসেপ্স নামক এক ফরাসী স্থপতি এই খাল খনন করেন।

ভূমধ্য সাগর আর লোহিতসাগরের সংযোগ হ'য়ে, ইউরোপ আর ভারতবর্ষের মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্যের অত্যন্ত সুবিধা হ'য়েছে।

সুয়েজ খাল।

মানবজাতির উন্নতির বর্ত্তমান অবস্থার জন্ম যতগুলি কারণ প্রাচীন কাল থেকে কাজ ক'র্‌ছে, তার মধ্যে বোধ হয়, ভারতের বাণিজ্য সর্ব্বপ্রধান।

ভারতের বাণিজ্যই সকল জাতির উন্নতির কারণ।

অনাদি কাল হ'তে উর্ব্বরতায় আর বাণিজ্যে, শিল্পে, ভারতের মত দেশ কি আর আছে? দুনিয়ার যত সুতি কাপড়, তুলা, পাট, নীল, লাক্ষা, চাল, হীরে, মোতি ইত্যাদির ব্যবহার ১০০ বৎসর আগে পর্য্যন্ত ছিল, তা সমস্তই ভারতবর্ষ হ'তে যেত। তা ছাড়া উৎকৃষ্ট রেশমী, পশমিনা, কিংখাব ইত্যাদি এ দেশের মত কোথাও হ'ত না। কাজেই অতি প্রাচীন কাল হ'তেই, যে দেশ যখন সভ্য হ'ত তখনই ঐ সকল জিনিষের জন্ম ভারতের উপর নির্ভর। এই বাণিজ্য দু'টি প্রধান ধারায়

ভারতের পথ।

চল্‌ত: একটি ডাঙ্গাপথে আফগানি ইরানী দেশ হ'য়ে, আর একটি জলপথে রেড্ সি হ'য়ে। সিকন্দার সা, ইরান-বিজয়ের পর, নিয়ার্কস নামক সেনাপতিকে জলপথে সিন্ধুনদের মুখ হ'য়ে সমুদ্র পার হ'য়ে লোহিত-সমুদ্র দিয়ে, রাস্তা দেখ্‌তে পাঠান। বাবিলন, ইরান, গ্রীস, রোম প্রভৃতি প্রাচীন দেশের ঐশ্বর্য্য যে কত পরিমাণে ভারতের বাণিজ্যের উপর নির্ভর কর্‌ত, তা অনেকে জানে না। রোম-ধ্বংসের পর মুসলমানি বোগ্দাদ ও ইতালীর ভিনিস ও জেনোয়া, ভারতীয় বাণিজ্যের প্রধান পাশ্চাত্য কেন্দ্র হ'য়েছিল। যখন তুর্কেরা রোম সাম্রাজ্য দখল ক'রে ইতালীয়দের ভারতবাণিজ্যের রাস্তা বন্ধ

ক'রে দিলে, তখন জেনোয়া-নিবাসী কলম্বস (ক্রিষ্টোফোরো কলম্বো) আটলাণ্টিক পার হ'য়ে ভারতে আসবার নূতন রাস্তা বার করবার চেষ্টা করেন, ফল—আমেরিকা মহাদ্বীপের আবিষ্ক্রিয়া। আমেরিকায় পৌঁছেও কলম্বসের ভ্রম যায়নি যে, এ ভারতবর্ষ নয়। সেই জন্যই আমেরিকার আদিম-নিবাসীরা এখনও ইণ্ডিয়ান নামে অভিহিত। বেদে সিন্ধু নদের "সিন্ধু," "ইন্দু" দুই নামই পাওয়া যায়; ইরানীরা তাকে "হিন্দু," গ্রীকরা "ইণ্ডুস" কোরে তুললে; তাই থেকে ইণ্ডিয়া—ইণ্ডিয়ান। মুসলমানি ধর্মের অভ্যুদয়ে হিন্দু দাঁড়াল—কালা (খারাপ), যেমন এখন—নেটিভ্।

এ দিকে পোর্ত্তুগীসরা ভারতের নূতন পথ, আফ্রিকা বেড়ে আবিষ্কার করলে। ভারতের লক্ষ্মী পোর্ত্তুগালের উপর সদয়া হ'লেন; পরে ফরাসী, ওলন্দাজ, দিনেমার, ইংরেজ। ইংরেজের ঘরে ভারতের বাণিজ্য রাজস্ব সমস্তই; তাই ইংরেজ এখন সকলের উপর বড় জাত্। তবে এখন আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ভারতের জিনিসপত্র অনেক স্থলে ভারত অপেক্ষাও উত্তম উৎপন্ন হচ্ছে, তাই ভারতের আর তত কদর নাই। একথা ইউরোপীয়েরা স্বীকার ক'রতে চায় না। ভারত—নেটিভ্পূর্ণ, ভারত যে তাদের ধন, সভ্যতার প্রধান সহায় সম্বল, সে কথা মানতে চায় না, বুঝতেও চায় না। আমরাও বোঝাতে কি ছাড়্ব?

ইউরোপ ভারতের সভ্যতার নিকট সম্পূর্ণ ঋণী।

ভেবে দেখ, কথাটা কি। ঐ যারা চাষাভূষা তাঁতিজোলা ভারতের নগণ্য মনুষ্য, বিজাতিবিজিত স্বজাতিনিন্দিত ছোট জাত্, তারাই আবহমানকাল নীরবে কাজ ক'রে যাচ্ছে, তাদের পরিশ্রমফলও তারা পাচ্ছে না! কিন্তু ধীরে ধীরে প্রাকৃতিক

নিয়মে দুনিয়াময় কত পরিবর্ত্তন হ'য়ে যাচ্ছে। দেশ, সভ্যতা, প্রাধান্য—ওলট-পালট হ'য়ে যাচ্ছে। হে ভারতের শ্রমজীবি! তোমার নীরব, অনবরত নিন্দিত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ বাবিলন, ইরান, আলকসান্দ্রিয়া, গ্রীস, রোম, ভিনিস, জেনোয়া, বোগদাদ, সমরকন্দ, স্পেন, পোর্ত্তুগাল, ফরাসী, দিনেমার, ওলন্দাজ ও ইংরেজের ক্রমান্বয়ে আধিপত্য ও ঐশ্বর্য্য। আর তুমি?—কে ভাবে এ কথা! তোমাদের পিতৃপুরুষ দু'খানা দর্শন লিখেছেন, দশখানা কাব্য বানিয়েছেন, দশটা মন্দির ক'রেছেন—তোমাদের ডাকের চোটে গগন ফাটছে; আর যাদের রুধিরস্রাবে মনুষ্যজাতির যা-কিছু উন্নতি—তাদের গুণগান কে করে? লোকজয়ী ধর্ম্মবীর, রণবীর, কাব্যবীর সকলের চ'খের উপর, সকলের পূজ্য; কিন্তু কেউ যেখানে দেখে না, কেউ যেখানে একটা বাহবা দেয় না, যেখানে সকলে ঘৃণা করে, সেখানে বাস করে অপার সহিষ্ণুতা, অনন্ত প্রীতি ও নির্ভীক কার্য্যকারিতা;—আমাদের গরীবেরা ঘর-দুয়ারে দিনরাত যে মুখ বুজে কর্ত্তব্য ক'রে যাচ্ছে তাতে কি বীরত্ব নাই? বড় কাজ হাতে এলে অনেকেই বীর হয়, দশ হাজার লোকের বাহবার সামনে কাপুরুষও অক্লেশে প্রাণ দেয়, ঘোর স্বার্থপরও নিষ্কাম হয়;—কিন্তু অতি ক্ষুদ্র কার্য্যে সকলের অজান্তেও যিনি সেই নিঃস্বার্থতা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা দেখান, তিনিই ধন্য,—সে তোমরা ভারতের চিরপদদলিত শ্রমজীবী!—তোমাদের প্রণাম করি।

ভারতের ছোট জাত্ পূজার্হ।

প্রতাপাদিত্য

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

[১২৭০ সালে (১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে) ক্ষীরোদপ্রসাদের জন্ম হয়। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ইনি এম্.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এবং তিন বৎসর 'পরে 'জেনারেল এসেম্ব্লীজ্ ইনষ্টিটিউশনে'র রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপনায় ব্রতী হন। কিন্তু সাহিত্য-সাধনার পথ প্রতিকূল বোধ হওয়ায় অধ্যাপকের কার্য্য ইনি ত্যাগ করেন। বহু নাট্য-গ্রন্থ ও উপন্যাস ইনি লিখিয়া গিয়াছেন। ইনি তত্ত্ববিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। ইঁহার সম্পাদিত 'অলৌকিক রহস্য' নামক মাসিক পত্র অনেকের নিকট সমাদর লাভ করিয়াছিল। 'আলিবাবা,' 'প্রমোদরঞ্জন,' 'সাবিত্রী,' 'রঞ্জাবতী,' 'পদ্মিনী,' 'প্রতাপাদিত্য,' 'চাঁদবিবি,' 'কিন্নরী,' 'উলুপী,' 'আলমগীর,' 'ভীষ্ম,' 'নরনারায়ণ,' 'নিবেদিতা,' 'গুহামুখে,' 'গুহামধ্যে,' 'নারায়ণী' প্রভৃতি গ্রন্থ ইঁহার সাহিত্য-সাধনার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। ১৩৩৪ সালে ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে।]

যশোহর—গোবিন্দদেবের মন্দির-প্রাঙ্গণ

বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায়

বিক্রমাদিত্য। হাঁহে ভায়া, মালখাজনা সমস্ত আগ্রায় রওনা ক'রে দিয়েছ ত ?

বসন্তরায়। তা না ক'রে কি আপনার সঙ্গে নিশ্চিন্ত হ'য়ে কথা কইতে পাচ্ছি! সে সমস্ত—পাই কড়া ক্রান্তি পর্য্যন্ত দিয়েছি।

বিক্রম। বেশ করেছ ভাই! ওইটেই হ'চ্ছে আসল কাজ। সদর মালগুজারী খাজাঞ্চীখানায় আগে আন্জাম ক'রে, তা'র পরে যা' খুসী তাই কর। সখের কাজই বল, আর দেবতা-অর্চ্চনাই বল,—দোল-দুর্গোৎসব, শ্রাদ্ধশান্তি, ক্রিয়াকলাপ এ সব পরের কথা। জমিদারী বজায় থাকলে ত' এ সব।

বসন্ত। তা' আর ব'ল্‌তে। তা'র উপর চারিধারে শত্রু।

বিক্রম। চারিধারে শত্রু! এই সোনার রাজ্যটি প্রতিষ্ঠা ক'রেছ, বন কেটে নগর ব'সিয়েছ। এ পাকা আমটির ওপর অনেক কাঠবিড়ালীর নজর আছে।

বসন্ত। তবে আমরা খাড়া থাক্‌লে কা'রে ভয়?

বিক্রম। বস্, বস্! খাড়া থাক্‌লে কা'রে ভয়? তুমি বুদ্ধিমান্, তোমাকে আর বুঝাব কি? দায়ূদ খাঁর সঙ্গে বহুলোকের সর্ব্বনাশ হ'য়েছে। আমাদের বাপ-পিতামহের পুণ্যবলে ক্ষতি না হ'য়ে উল্‌টে লাভ হ'য়ে গেছে। আজ আমরা বারো ভুঁইয়ার এক ভুঁইয়া। এখন এমন রাজ্যটি যা'তে বজায় রাখ্‌তে পার, কেবল সেই চেষ্টা কর। মাটী ত' নয়, যেন সোনা। ভাল রকম আবাদ ক'র্‌তে পার্‌লে সোনা ফলান যায়। কিন্তু হ'লে কি হবে ভাই! তুমি আমি যত দিন আছি, তত দিন বিপদের কোন ভয় দেখি না। একটু নরম মেজাজে নবাবদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ক'রে চলা— সেটা তুমি আমি যত দিন আছি, তত দিন। ছেলেপিলেগুলো ক তেমন মিলে মিশে চ'ল্‌তে পার্‌বে? আমার বাপধন যেরূপ উদ্ধতপ্রকৃতি, তা'কে ত' একটুও বিশ্বাস করা যায় না।

বসন্ত। সে কি, মহারাজ! প্রতাপকে উদ্ধতপ্রকৃতি দেখ্‌লেন কখন?

বিক্রম। না, না—তা এখনও দেখিনি বটে! তবে কি জান, কিছু চঞ্চল।

বসন্ত। চঞ্চল, না শান্ত?

বিক্রম। হাঁ। হাঁ—এখনও শান্ত আছে বটে—এখনও চঞ্চলটা নয় বটে।

বসন্ত। চঞ্চল বটে আমার ছেলেরা বিশ্বাস নেই বরং তা'দের। প্রতাপ চঞ্চল! প্রতাপের মত ছেলে কি আর দেখ্‌তে পাওয়া যায়!

বিক্রম। হ্যাঁ হ্যাঁ—এখনও দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে না বটে—তবে কি না—তবে কি না—যতটা ব'ল্‌ছ,—ততটা যে ঠিক—বুঝেছ বসন্ত! একেবারে বাবাজীকে তুমি যে—বুঝেছ, ভাই—

বসন্ত। আপনি কি প্রতাপকে সন্দেহ করেন নাকি?

বিক্রম। হ্যা-হ্যা! একেবারে যে সন্দেহ—হ্যা-হ্যা। তবে কি না,—

বসন্ত। কেন প্রতাপের ওপর আপনি অন্যায় সন্দেহ ক'র্‌লেন? এ রাজ্যের যদি কেউ মর্য্যাদা রাখ্‌তে পারে ত' সে এক প্রতাপ।

বিক্রম। যাক্—যাক্—ও কথা ছাড়ান দাও—ও কথা ছাড়ান দাও। দুর্গা দুর্গমহরে—দুর্গা দুঃখহরে। যাক্—যাক্—বিক্রমপুর বাক্‌লা থেকে তুমি যে ব্রাহ্মণ কায়স্থ সব আন্‌বে বলেছিলে, তা'র ক'র্‌লে কি?

বসন্ত। আন্‌তে লোক ত' পাঠিয়েছি।

বিক্রম। বেশ, বেশ। গোবিন্দদেব-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে যশোরে ব্রাহ্মণ কায়স্থেরও প্রতিষ্ঠা কর। বস্—তা হ'লেই ঠিক হবে। দেবতা ব্রাহ্মণ—কুটুম্ব নারায়ণ আনাও, প্রতিষ্ঠা করাও, তা হ'লেই মঙ্গল হবে। দুর্গা দুর্গমহরে!—তা হ'লে যাও ভাই—প্রাতঃকৃত্য সার গে'।

বসন্ত। আপনি কেবল তাঁদের বাসস্থান নির্দ্দেশ ক'রে দেবেন।

বিক্রম। বেশ, বেশ—ছ'জনে পরামর্শ ক'রে যা কর্ত্তব্য হয় করা যাবে।

বসন্ত। যথা আজ্ঞা।

[প্রস্থান

বিক্রম। এমন ভাই পেলে, বাদশাগিরি পেয়েও তার হাতে মাথা রেখে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমুতে পারি। কিন্তু ছেলেকেই আমার বিষম ভয়। প্রতাপের কোষ্ঠীর যে রকম ফল শুনেছি, তাতে পুত্রলাভ ক'রেও আমার হর্ষে বিষাদ। ঠিকুজীতে যখন ব'লেছে—প্রতাপ পিতৃদ্রোহী হবে, তখন কি সে কথা আর মিথ্যে হবার যো আছে? যাক্, আর ভেবেই বা কি ক'র্‌ব? ছ'দিনের দিন বিধাতা সূতিকা-ঘরে ব'সে কপালে যা আঁক কেটে গেছে, সে ত ঝামা দিয়ে ঘষ্‌লেও আর উঠবে না। দুর্গা দুর্গহরে—দুর্গা দুঃখহরে! তবে কি না—তবে কি না—পিতৃদ্রোহী সন্তান—জেনে শুনে ঘরে রাখা—দুধ-কলা দিয়ে কালসর্প পোষা। দুর্গ্যা—বসন্তকে যে ছাই এ কথা ব'ল্‌তেই পার্‌ছি না! আর ব'ল্‌লেই বা কি হবে, বসন্ত ত' বুঝ্‌বে না। যাক্—তারা শিবসুন্দরী! ভেবে আর কি ক'র্‌ব? কালী কালভয়বারিণী মা!—তবে একটা সুবিধে হ'য়েছে! বসন্ত পরম বৈষ্ণব। স্বয়ং বৈষ্ণব-চূড়ামণি গোবিন্দদাস তা'র সহায়। ছেলেটাকেও কৌশল ক'রে তার দলে ভিড়িয়ে দিয়েছি। ভায়া আমার তাকে নিরামিষ ধরিয়েছে,—গলায় তুলসীর মালা পরিয়েছে। কাজটা অনেকটা এগিয়েছি। এখন মা কালীর ইচ্ছায়, ছেলেটাকে একেবারে নিরেট বৈষ্ণব ক'র্‌তে পার্‌লেই আমি নিশ্চিন্ত।—ভবানন্দ!

(ভবানন্দের প্রবেশ)

ভবানন্দ। মহারাজ!

বিক্রম। দেখে এস ত' প্রতাপ কোথায়!

ভবা। আজ্ঞে মহারাজ, তিনি তুলসীমঞ্চে ব'সে মালা জপ ক'র্‌ছেন।

বিক্রম। বেশ, বেশ! আচ্ছা ভবানন্দ, প্রতাপের ভক্তিটে কেমন দেখ্‌ছ বল দেখি?

ভবা। ওঃ! কি ভক্তি! তা আর আপনাকে পাপমুখে কি ব'ল্‌ব মহারাজ! হাতের মালা ঘুর্‌তে না ঘুর্‌তেই দু'চক্ষু দিয়ে দর দর ক'রে জল! যেন ইচ্ছামতী নদীতে বান ডেকে গেল!

বিক্রম। বেশ, বেশ।

ভবা। হয়ত' ব'ল্‌লে বিশ্বাস ক'র্‌বেন না, গোবিন্দদাস বাবাজীরও বুঝি এত ভক্তি দেখিনি।

বিক্রম। বেশ, বেশ।—আচ্ছা, তুমি এক কাজ কর দেখি, গোবিন্দদাস বাবাজীকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দাও দেখি।

[ভবানন্দের প্রস্থান

বেশ হ'য়েছে। বসন্ত প্রতাপকে ঠিক বাগিয়ে এনেছে। তুলসীতলায় যখন ব'সিয়েছে, তখন আর ভাবনা কি! তুলসীর গন্ধ দু'দিন নাকে ঢুক্‌লে, বাপধনের পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত একেবারে নিরিমিষ হ'য়ে যাবে। বস্‌—বস্‌—আর ভয় কি! দুর্গা দুর্গমহরে—দুর্গা দুঃখহরে! তবু রঙের ওপর একটু রসান চড়িয়ে দিই। প্রতাপকে আনিয়ে গোবিন্দদাস বাবাজীর দু'টো গান শুনিয়ে দিই।—ওরে!—

(ভৃত্যের প্রবেশ)

যা ত', রাজকুমারকে একবার আমার কাছে আস্‌তে বল্‌ ত'।

[ভৃত্যের প্রস্থান

(গোবিন্দদাসের প্রবেশ)

গোবিন্দদাস। শ্রীগোবিন্দ! অধীনকে স্মরণ করেছেন কেন মহারাজ?

বিক্রম। এস বাবাজী, এস—এই অনেক দিন তোমার মুখে মধুর হরিনাম শুনি নি—তাই—বুঝেছো বাবাজী! সংসারচক্র—ঘুরে ঘুরেই ম'র্‌ছি। কাছে সুধার সাগর থাক্‌তেও একটু যে চাক্‌ব', তাও পার্‌ছিনি। বাবাজী, ক্ষণেকের জন্য একটু কৃষ্ণনাম শুনিয়ে দাও।

গোবিন্দ। শ্রীগোবিন্দ! মহারাজ, নরাধম আমি। আজও পর্য্যন্ত অভিমান নিয়ে ঘুরে ম'র্‌ছি। আমি যে মহারাজকে আনন্দ দিতে পারি, সে ভরসা আমার কই? তবে দয়া ক'রে অধীনের মুখে কৃষ্ণনাম শুন্‌তে চেয়েছেন, এই আমার বহু ভাগ্য।

বিক্রম। বাবাজী! যে ব্যক্তি সাধু, তার কি আর অহঙ্কার থাকে? যাক্‌—বাবাজী, একটী গেয়ে ফেল।

গোবিন্দ। কি গাইব, অনুমতি করুন।

বিক্রম। যা হ'ক একটা—ভাল কথা, সেই যে সে দিন বিদ্যাপতির আত্মনিবেদন গেয়েছিলে, সেটা আমার কানে বড়ই মধুর লেগেছিল।

গোবিন্দ। যে আজ্ঞে—

(গীত)

তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম
সুত-মিত-রমণী-সমাজে।
তোঁহে বিসরি মন তাহে সমর্পিনু
অব মঝু হব কোন কাজে॥
মাধব! হাম পরিণাম নিরাশা!
তুঁহু জগতারণ দীন-দয়াময়
অতয়ে তোঁহারি বিশোয়াসা॥

বিক্রম। বা! বা! কি মধুর! কি ভাব!—তাতল সৈকতে—তাতে আবার বারিবিন্দু সম—যেন তপ্তখোলার বালি—প'ড়্‌লুম মটর—হ'লুম ফুটকড়াই—বা! বা! কি সুন্দর উপমা! তার ওপর আবার বারিবিন্দুটি প'ড়েছে কি—অমনি চড়াং—খোলা একেবারে চৌচাক্‌লা। মহাজন না হ'লে এ কথা বলে কে? সুতো—মিতো—রমণী-সমাজে! বা! বা! কি চমৎকার!—তবে রমণী-সমাজে যত জ্বালা হ'ক্ আর না হ'ক্ বাবাজী! মাঝখান থেকে এক সুতোর জ্বালায় অস্থির হ'য়ে পড়েছি। বাবাজী! সুতো এখন কাছি হ'য়ে কোন্ দিন গলায় ফাঁস না লাগায়—ওরে! প্রতাপকে ডেকে আন্‌তে বল্‌লুম, তা'র ক'র্‌লি কি?—

গোবিন্দ। তবে কি না তিনি দয়াময়!

বিক্রম। ওই!—যা' ব'লেছো বাবাজী! তবে কি না তিনি দয়াময়!—সেই সাহসেই বেঁচে আছি!—ওরে! দেরী ক'র্‌ছিস্ কেন? প্রতাপকে আন্‌তে দেরী ক'র্‌ছিস্ কেন?

(সম্মুখে বাণবিদ্ধ পক্ষীর পতন)

গোবিন্দ। হা গোবিন্দ! হা গোবিন্দ!—কি ক'র্‌লে!

বিক্রম। ওরে! এ কি রে! ওরে! এ কাজ কে ক'র্‌লে রে? ওরে! এ জীবহত্যা কে ক'র্‌লে রে? দোহাই বাবাজী—যেয়ো না।

গোবিন্দ। ক্ষমা করুন মহারাজ! অধীন আর এখানে থাক্‌তে পার্‌বে না। যে স্থানে জীবহত্যা হয়, বৈষ্ণবের সে স্থানে থাকা উচিত নয়। হা গোবিন্দ! কি ক'র্‌লে!

[প্রস্থান

বিক্রম। ওরে! এ জীবহত্যা কে ক'র্‌লে রে!—

(প্রতাপের প্রবেশ)

প্রতাপ! এ কি প্রতাপ! এ অকারণ প্রাণিহত্যা কে কর্‌লে? নিশ্চিন্ত হ'য়ে নির্জ্জনে ব'সে ভগবানের নাম শুন্‌ছিলুম—তাতে বাধা দিলে কে, প্রতাপ?

প্রতাপ। ক্ষমা করুন মহারাজ, আমি ক'রেছি।

বিক্রম। না—না। তুমি কেন এ কাজ ক'র্‌বে? এই শুন্‌লুম, তুমি তুলসীমঞ্চে ব'সে হরিনাম জপ ক'র্‌ছিলে! এ নিষ্ঠুর কার্য্য তুমি ক'র্‌বে কেন!

প্রতাপ। কিছুক্ষণ জপে নিযুক্ত হ'য়ে বুঝ্‌লুম—আমি হরি-নাম-জপের যোগ্য নই। অসংখ্য প্রজাশাসনের জন্য দু'দিন পরে যা'কে রাজদণ্ড হাতে ক'র্‌তে হবে, আশ্রয়-ভিখারী দুর্ব্বলকে রক্ষা কর্‌তে কথায় কথায় যা'কে অস্ত্র ধ'র্‌তে হবে, অহিংসাময় বৈষ্ণবধর্ম্ম তার নয়। শক্তি-অভিমানী যশোর-রাজকুমারের একমাত্র অবলম্বন মহাশক্তির আশ্রয়। তাঁর কাছে কর্ত্তব্যানুরোধে

জীবহিংসা, তাঁ'র মনস্তুষ্টির জন্য অঞ্জলিপূর্ণ শক্রশোণিতে মহাকালীর তর্পণ। পিতা! তাই আমি এই শোণিতপিপাসু বাজপক্ষীকে শরাঘাতে সংহার করেছি।

(শঙ্করের প্রবেশ।)

শঙ্কর। মিথ্যা কথা, এ কার্য্য আমি ক'রেছি।

বিক্রম। তাই ত' বলি—তাও কি কখন হয়? ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা রাখ্‌তে প্রতাপ আমার পিতৃসম্মুখে মিথ্যা কথা ক'য়েছে। এই শুন্‌লুম তুমি পরম বৈষ্ণব হ'য়েছো। তুমি এমন কাজ ক'র্‌বে কেন!

প্রতাপ। না পিতা, মিথ্যা নয়। এ ব্রাহ্মণকে এর পূর্ব্বে আমি আর কখন দেখিনি। আমারই শরাঘাতে এই পক্ষী নিহত হ'য়েছে।

শঙ্কর। না মহারাজ! মিথ্যা কথা। এই উড্ডীয়মান্ বাজপক্ষী আমার শরাঘাতেই নিহত হয়েছে।

প্রতাপ। সাবধান ব্রাহ্মণ! রাজার সম্মুখে মিথ্যা কথা ক'য়ো না।

শঙ্কর। সাবধান রাজকুমার! বৈষ্ণবধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে মহাশক্তির আশ্রয় গ্রহণ ক'রতে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ ক'রো না। এ কার্য্য আমি ক'রেছি।

প্রতাপ। মিথ্যা কথা, আমি ক'রেছি।

শঙ্কর। ভাল, বাগ্‌বিতণ্ডায় প্রয়োজন কি? সম্মুখেই পাখী প'ড়ে আছে। পরীক্ষা কর। কা'র শরাঘাতে এ পক্ষী নিহত হ'য়েছে এখনি বুঝ্‌তে পারা যাবে।

প্রতাপ। বেশ, তা'তে আর আপত্তি কি!

শঙ্কর। ধর্ম্মাবতার যশোরেশ্বর সম্মুখে—তাঁ'র সম্মুখে পরীক্ষা—সুবিচারের প্রত্যাশা করি। কিন্তু রাজকুমার, পরীক্ষার আগে একটা প্রতিজ্ঞা কর। যদি তোমার বাণে এ পক্ষী বিদ্ধ হয়, তা হ'লে ব্রাহ্মণ হ'য়েও আমি কায়স্থ-কুলতিলক বিক্রমাদিত্য-নন্দনের দাসত্ব স্বীকার ক'র্‌বো। আর আমা হ'তে যদি এ কার্য্য সাধিত হয়, তা' হ'লে প্রতিশ্রুত হও রাজকুমার, তুমি অবনতমস্তকে এই ভিখারী ব্রাহ্মণের দাসত্ব স্বীকার ক'র্‌বে।

প্রতাপ। বেশ, প্রতিজ্ঞা ক'র্‌লুম।—কিন্তু ব্রাহ্মণ! পরীক্ষায় মীমাংসা হবে কি ক'রে?

শঙ্কর। তুমি কোন্ স্থান লক্ষ্যে শরসন্ধান ক'রেছ?

প্রতাপ। আমি পাখীর পক্ষভেদ ক'রেছি।

শঙ্কর। আর আমি মস্তক চূর্ণ ক'রেছি।

(বিজয়ার প্রবেশ)

বিজয়া। আর আমি হৃদয় বিদ্ধ ক'রেছি।

বিক্রম। এ কি! এ কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! এ কি হেঁয়ালি! কে তুমি? এ সমস্ত কি, প্রতাপ!

প্রতাপ। তাই ত'! এ কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! কিছু ত' জানি না মহারাজ! এ প্রদীপ্ত অনলোল্লাস, এ মত্তমাতঙ্গলাঞ্ছন পাদক্ষেপ, এ অপূর্ব্ব রণোন্মাদন বেশ আর কখন ত' দেখিনি মহারাজ! কে তুমি মা? কোথা থেকে এলে? কেন এলে?

শঙ্কর। যথার্থই কি এলি মা! দুর্ব্বল-পীড়ন-দর্শন-কাতর, সহস্রধা-ভিন্ন-অন্তর এ দরিদ্র ব্রাহ্মণের কাতরকণ্ঠ তবে কি তোর কর্ণে পৌঁছেছে মা!

বিজয়া। এই দেখ শঙ্কর, হতভাগ্য পক্ষীর মস্তক ভিন্ন। এই দেখ প্রতাপ, পক্ষ ছিন্ন। আর এই দেখ মহারাজ, পক্ষিহৃদয়ে কি গভীর শরাঘাত! কিন্তু জান্‌তে পারি কি ব্রাহ্মণ! কেন তুমি এই শ্যেনপক্ষীর উপর অস্ত্র নিক্ষেপ ক'রেছিলে?

শঙ্কর। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের চিরদুর্ব্বল করে লক্ষ্য-ভেদের শক্তি আছে কি না পরীক্ষা ক'রেছিলুম।

প্রতাপ। আর আমি দেখ্‌লুম, মা!—হিন্দুস্থানের এ সীমান্ত-প্রদেশের বনভূমির একটা ক্ষুদ্র নগর হ'তে নিক্ষিপ্ত বাণ কখনও কোনও কালে আগ্রার সিংহাসনে পৌঁছোতে পারে কি না।

বিজয়া। আর আমি দেখলুম, মহারাজ!—মহারাজের প্রাসাদশিখরে অগণ্য শ্বেত পারাবত মনের সাধে বিচরণ ক'র্‌ছে। তা'দের সেই আনন্দের সংসার ছারখার কর্‌বার জন্য একটা ভীষণ মাংসাশী পক্ষী অলক্ষ্যে আকাশপথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মহারাজ! বিশ বৎসর পূর্ব্বে এমনি একটি সুখের সংসার ছারখার হ'য়েছিল। তা'র ফলে একটি ব্রাহ্মণ-কন্যা শিশুকাল হ'তে ভীষণ অরণ্যবাসিনী কুমারী—কপালিনী। কল্পনায় সে স্মৃতি জেগে উঠ্‌লো। প্রতিশোধ-বাসনায় কম্পিত কর হ'তে আপনা-আপনি শর ছুটে গেল, পাখীর হৃদয় বিদ্ধ হ'ল।—এই নাও প্রতাপ, পক্ষী নাও। এই দ্বিধা-বিভিন্ন বিহঙ্গম তোমার বিজয়পতাকার চিহ্ন হ'ক।

[প্রস্থান

শঙ্কর। এ কি মা! দেখা দিয়ে যাস্ কোথায়! সর্ব্বনাশী! আশ্রয় দিয়ে আবার আমাদের আশ্রয়হীন করিস্ কেন?

প্রতাপ। এ কি মা বিজয়লক্ষ্মি! হতভাগ্য সন্তানের চক্ষে

একটা নূতন জীবনের আভাস দিয়ে আবার তাকে অন্ধকারে ফেলে যাস্ কোথা ?

শঙ্কর। রাজকুমার ! প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ব্রাহ্মণ আজ থেকে তোমার ভৃত্য।

প্রতাপ। ব্রাহ্মণ ! প্রতিজ্ঞাবদ্ধ প্রতাপ আজ থেকে তোমার দাসানুদাস।

[পরস্পরের আলিঙ্গন ও প্রস্থান

বিক্রম। ওরে—ওরে—কে কোথা রে ! ও বসন্ত—বসন্ত—কোথা রে ! কি হ'ল রে !

নিয়মের রাজত্ব

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

[মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমায় রামেন্দ্রসুন্দর ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা রিপন কলেজে বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন এবং উত্তরকালে ঐ কলেজের অধ্যক্ষ হন। বিজ্ঞানবিৎ হইলেও ইনি সর্ব্বশাস্ত্রেই অসাধারণ পারদর্শী ছিলেন। বঙ্গসাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখকগণের মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দর অন্যতম—ইঁহার 'জিজ্ঞাসা,' 'যজ্ঞকথা' প্রভৃতি পুস্তক বঙ্গভাষার অলঙ্কারস্বরূপ। ইনি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম প্রধান কর্ম্মী ছিলেন এবং দেশীয় শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নতিকল্পে বহুবিধ হিতকর কার্য্য করিয়াছিলেন। মানুষ-হিসাবেও ইঁহার তুলনা দুর্লভ।]

বিশ্বজগৎ নিয়মের রাজ্য, এইরূপ একটা বাক্য আজকাল সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞানসম্পর্কে যে-কোন গ্রন্থ হাতে করিলেই দেখা যাইবে যে, লেখা রহিয়াছে, প্রকৃতির রাজ্যে অনিয়মের অস্তিত্ব নাই—সর্ব্বত্রই নিয়ম, সর্ব্বত্রই শৃঙ্খলা। মানুষের রাজ্যে আইন আছে বটে, এবং সেই আইন ভঙ্গ করিলে শাস্তিরও ব্যবস্থা আছে; কিন্তু অনেকেই আইনকে ফাঁকি দিয়া অব্যাহতি লাভ করে। কিন্তু বিশ্বজগতে, অর্থাৎ প্রকৃতির রাজ্যে যে সকল আইনের বিধান বর্ত্তমান, তাহার একটাকেও ফাঁকি দিবার যো নাই। কোথাও ব্যভিচার নাই; কোথাও ফাঁকি দিয়া অব্যাহতি লাভের উপায় নাই। কাজেই

প্রাকৃতিক নিয়মের জয়গান করিতে গিয়া অনেকে পুলকিত হন, ভাবাবেশে গদ্‌গদকণ্ঠ হইয়া থাকেন, তাঁহাদের দেহে বিবিধ সাত্ত্বিক ভাবের আবির্ভাব হয়।

যাঁহারা 'মিরাক্‌ল্‌' বা অতিপ্রাকৃত মানেন, তাঁহারা সকল সময়ে এই নিয়মের অব্যভিচারিতা স্বীকার করেন না, অথবা প্রকৃতিতে নিয়মের রাজত্ব স্বীকার করিলেও, অতিপ্রাকৃত শক্তি সময়ে সময়ে সেই নিয়ম লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয়, এইরূপ স্বীকার করেন। যাঁহারা মিরাক্‌ল্‌ মানিতে চাহেন না, তাঁহারা প্রতিপক্ষকে মিথ্যাবাদী, নির্ব্বোধ, পাগল ইত্যাদি মধুর সম্বোধনে আপ্যায়িত করেন।

বর্ত্তমান অবস্থায় প্রাকৃতিক নিয়ম-সম্বন্ধে নূতন করিয়া গম্ভীরভাবে একটা সন্দর্ভ লিখিবার সময় গিয়াছে, এরূপ মনে না করিলেও চলিতে পারে।

প্রাকৃতিক নিয়ম কাহাকে বলে? দুই-একটা দৃষ্টান্ত-দ্বারা স্পষ্ট করা যাইতে পারে। গাছ হইতে ফল চিরকালই ভূমি-পৃষ্ঠে পতিত হয়। এ পর্য্যন্ত যত গাছ দেখা গিয়াছে ও যত ফল দেখা গিয়াছে, সর্ব্বত্রই এই নিয়ম। যে দিন লোষ্ট্রপাতিত আম্র ভূপৃষ্ঠ অন্বেষণ না করিয়া আকাশমার্গে ধাবিত হইবে, সে ভয়াবহ দিন মনুষ্যের ইতিহাসে বিলম্বিত হউক!

ফলে—আম বল, জাম বল, নারিকেল বল, সকলেই অধোমুখে ভূমিতে পড়ে, কেহই উর্দ্ধমুখে আকাশপথে চলে না। কেবল আম, জাম, নারিকেল কেন, যে-কোন দ্রব্য উর্দ্ধে উৎক্ষেপ কর না, তাহাই কিছুক্ষণ পরে ভূমিতে নামিয়া আসে। এই সাধারণ নিয়মের কোনও ব্যতিক্রম এ পর্য্যন্ত দেখা যায় না।

অতএব ইহা একটি প্রাকৃতিক নিয়ম। পার্থিব দ্রব্যমাত্রই ভূকেন্দ্রাভিমুখে গমন করিতে চাহে। এই নিয়মের নাম ভৌম আকর্ষণ বা মাধ্যাকর্ষণ।

প্রকৃতির রাজ্যে নিয়মভঙ্গ হয় না; কাজেই যদি কেহ আসিয়া বলে, দেখিয়া আসিলাম, অমুকের গাছের নারিকেল আজ বৃন্তচ্যুত হইবামাত্র ক্রমেই বেলুনের মত উপরে উঠিতে লাগিল, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সেই হতভাগ্য ব্যক্তির উপর বিবিধ নিন্দাবাদ বর্ষিত হইতে থাকিবে। কেহ বলিবে, লোকটা মিথ্যাবাদী; কেহ বলিবে লোকটা পাগল; কেহ বলিবে, লোকটা গুলি খায়; এবং যিনি সম্প্রতি রসায়ন-নামক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিজ্ঞ হইয়াছেন, তিনি হয়ত' বলিবেন, হ'তেও-বা পারে, বুঝি ঐ নারিকেলটার ভিতর জলের পরিবর্ত্তে 'হাইড্রোজেন' গ্যাস ছিল। কেন-না তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস যে, নারিকেল,—খাঁটি নারিকেল, যাহার ভিতরে জল আছে, হাইড্রোজেন নাই, এ হেন নারিকেল—কখনই প্রাকৃতিক নিয়মভঙ্গে অপরাধী হইতে পারে না।

খাঁটি নারিকেল নিয়মভঙ্গ করে না বটে, তবে হাইড্রোজেন-পূর্ণ বোম্বাই নারিকেল নিয়মভঙ্গ করিতে পারে। বৃষ্টি ভূমিতে পড়ে, কিন্তু মেঘ বায়ুতে ভাসে; 'প্যারাসুট'-বিলম্বিত আরোহী নীচে নামে বটে, কিন্তু বেলুনটা উপরে উঠে।

তবে এইখানে বুঝি নিয়মভঙ্গ হইল! পূর্ব্বে এক নিঃশ্বাসে নিয়ম বলিয়া ফেলিয়াছিলাম, পার্থিব দ্রব্যমাত্রই নিম্নগামী হয়; কিন্তু এখানে দেখিতেছি, নিয়মের ব্যভিচার আছে, যথা— মেঘ, বেলুন ও হাইড্রোজেন-পোরা বোম্বাই নারিকেল। লোহা

জলে ডোবে, কিন্তু শোলা ভাসে। কাজেই প্রকৃতির নিয়মে এইখানে ব্যভিচার।

অপর পক্ষ হটিবার নহেন; তাঁহারা বলিবেন,—তা কেন, নিয়ম ঠিক আছে, পার্থিব দ্রব্যমাত্রই নীচে নামে, এরূপ নিয়ম নহে। দ্রব্যমধ্যে জাতিভেদ আছে। গুরু দ্রব্য নীচে নামে, লঘু দ্রব্য উপরে উঠে, ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। লোহা গুরু দ্রব্য, তাই জলে ডোবে; শোলা লঘু দ্রব্য, তাই জলে ভাসে; ডুবাইয়া দিলেও উপরে উঠে। নারিকেল গুরু দ্রব্য; উহা নামে। কিন্তু বেলুন লঘু দ্রব্য; উহা উঠে।

এই নিয়মের ব্যতিক্রম খুঁজিয়া বাহির করা বস্তুতঃই কঠিন। কার সাধ্য ঠকায়? ঐ জিনিষটা উপরে উঠিতেছে কেন? উত্তর, এটা যে লঘু। ঐ জিনিষটা নামিতেছে কেন? উত্তর, ওটা যে গুরু। যাহা লঘু, তাহা ত উঠিবেই; যাহা গুরু, তাহা ত নামিবেই; ইহাই ত প্রকৃতির নিয়ম।

সোজা পথে আর উত্তর দিতে পারা যায় না; বাঁকা পথে যাইতে হয়। লোহা গুরু দ্রব্য; কিন্তু খানিকটা পারার মধ্যে ফেলিলে, লোহা ডোবে না, ভাসিতে থাকে। শোলা লঘু দ্রব্য; কিন্তু জল হইতে তুলিয়া ঊর্দ্ধমুখে নিক্ষেপ করিলে ভূতলগামী হয়। তবেই ত প্রাকৃতিক নিয়মের ভেদ হইল।

উত্তর—আরে মূর্খ, গুরু-লঘু শব্দের অর্থ বুঝিলে না। গুরু মানে এখানে পাঠশালার গুরুমহাশয় নহে, বা মন্ত্রদাতা গুরুও নহে; গুরু অর্থে অমুক পদার্থ অপেক্ষা গুরু অর্থাৎ ভারী। লোহা গুরু, তাহার অর্থ এই যে, লোহা বায়ু অপেক্ষা গুরু, জল অপেক্ষা গুরু, কাজেই বায়ুমধ্যে কি জলমধ্যে রাখিলে লোহা না ভাসিয়া ডুবিয়া

যায়। আর লোহা পারা অপেক্ষা লঘু; সমান আয়তনের লোহা ও পারা নিক্তিতে ওজন করিলে দেখিবে, কে লঘু, কে গুরু। পারা অপেক্ষা লোহা লঘু, সে জন্য লোহা পারায় ভাসে। প্রাকৃতিক নিয়মটার অর্থই বুঝিলে না, কেবল তর্ক করিতে আসিতেছ।

এ পক্ষ বলিতে পারেন, আপনার বাক্যের অর্থ যদি বুঝিতে না পারি, সে ত আমার বুদ্ধির দোষ নহে, আপনার ভাষার দোষ। গুরু দ্রব্য নামে, লঘু দ্রব্য উঠে, বলিবার পূর্ব্বে গুরু-লঘু কাহাকে বলে, আমাকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত ছিল। আপনার আইনের ভাষাযোজনার দোষ ঘটিয়াছে; উহার সংশোধন আবশ্যক।

ভাষা-সংশোধনের পর, প্রাকৃতিক আইনের সংশোধিত ধারাটা দাঁড়াইবে এই রকম:

ধারা:—কোন দ্রব্য অপর তরল বা বায়বীয় দ্রব্যমধ্যে রাখিলে প্রথম দ্রব্য যদি দ্বিতীয় দ্রব্য অপেক্ষা গুরু হয়, তাহা হইলে নিম্নগামী হইবে, আর যদি লঘু হয়, তাহা হইলে ঊর্দ্ধগামী হইবে।

ব্যাখ্যা:—এক দ্রব্য অন্য দ্রব্য অপেক্ষা গুরু কি লঘু, তাহা উভয়ের সমান আয়তন লইয়া নিক্তিতে ওজন করিয়া দেখিতে হইবে।

উদাহরণ:—রাম প্রথম দ্রব্য, শ্যাম দ্বিতীয় দ্রব্য। রামকে শ্যামের আয়তন মত ছাঁটিয়া লইয়া তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া দেখ, রাম যদি শ্যাম অপেক্ষা গুরু হয়, তাহা হইলে শ্যামের মধ্যে রামকে রাখিলে রাম নিম্নগামী হইবে। শ্যামকে তরল পদার্থ মনে করিতে আপত্তি করিও না।

সংশোধনের পর আইনের ভাষা অত্যন্ত সুবোধ্য হইয়া দাঁড়াইল, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। এখন দেখা যাউক, কতদূর দাঁড়াইল।

পার্থিব দ্রব্যমাত্রই ভূমি স্পর্শ করিতে চাহে, নিম্নগামী হয়; ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম নহে। সুতরাং উহার ব্যভিচার দেখিলে, বিস্মিত হইবার হেতু নাই; পার্থিব দ্রব্য অবস্থাবিশেষে, অর্থাৎ অন্য পার্থিব বস্তুর সন্নিধানে, কখন-বা উপরে উঠে, কখন-বা নীচে নামে। যখন অন্য কোন বস্তুর সন্নিধানে থাকে না, তখন সকল পার্থিব দ্রব্য নীচে নামে। যেমন শূন্যপ্রদেশে, 'পাম্প্'যোগে কোন প্রদেশকে জলশূন্য ও বায়ুশূন্য করিয়া সেখানে যে-কোন দ্রব্য রাখিবে, তাহাই নিম্নগামী হইবে। আর বায়ুমধ্যে, জলমধ্যে, তেলের মধ্যে, পারদমধ্যে কোন জিনিস রাখিলে, তখন লঘু-গুরু বিচার করিতে হইবে। ফলে, ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম; ইহার ব্যভিচার নাই। এই অর্থে প্রকৃতির নিয়ম অলঙ্ঘ্য।

তবে, যত দোষ এই জলের আর তেলের, পারার আর বাতাসের। উহাদের সন্নিধি এই বিষম সংশয়-উৎপাদনের হেতু হইয়াছিল। ভাগ্যে মনুষ্য বুদ্ধিজীবী, তাই প্রকৃত দোষীর সন্ধান করিতে পারিয়াছে; নতুবা প্রকৃতিতে নিয়মের প্রভুত্বটা গিয়াছিল আর কি!

বাস্তবিকই দোষ এই তরল পদার্থের ও বায়বীয় পদার্থের। বেলুন উপরে উঠে, বায়ু আছে বলিয়া; শোলা জলে ভাসে, জল আছে বলিয়া; লোহা পারায় ভাসে, পারা আছে বলিয়া; —নতুবা সকলেই ডুবিত, কেহই ভাসিত না; সকলেই নামিত, কেহই উঠিত না।

অর্থাৎ কিনা—পৃথিবী যেমন সকল দ্রব্যকেই কেন্দ্রমুখে আনিতে চায়, তরল ও বায়বীয় পদার্থমাত্রই তেমনি মগ্ন দ্রব্য-মাত্রকেই উপরে তুলিতে চায়। প্রথম ব্যাপারকে নাম দিয়াছি

মাধ্যাকর্ষণ; দ্বিতীয় ব্যাপারের নাম দাও চাপ। মাধ্যাকর্ষণে নামায়; চাপে ঠেলিয়া উঠায়। যেখানে উভয় বর্ত্তমান, সেখানে উভয়ই কার্য্য করে। যাহার যত জোর। যেখানে আকর্ষণ চাপ অপেক্ষা প্রবল, সেখানে মোটের উপর নামিতে হয়; যেখানে চাপ আকর্ষণ অপেক্ষা প্রবল, সেখানে মোটের উপর উঠিতে হয়। যেখানে উভয়ই সমান, সেখানে "ন যযৌ ন তস্থৌ"।

এখন, এ পক্ষ স্পর্দ্ধা করিয়া বলিবেন,—দেখিলে, প্রাকৃতিক নিয়মে আর ব্যতিক্রম আছে কি? আমাদের প্রকৃতির রাজ্যে কি কেবল একটা নিয়ম;—কেবলই কি একটা আইন? অনেক নিয়ম ও অনেক আইন, অথবা একই আইনের ধারা। যথা,—

১ নং ধারা—পার্থিব আকর্ষণে বস্তুমাত্রই নিম্নগামী হয়।

২ নং ধারা—তরল বা বায়বীয় পদার্থের চাপে বস্তুমাত্রই ঊর্দ্ধগামী হয়।

৩ নং ধারা—আকর্ষণ ও চাপ উভয়ই যুগপৎ কাজ করে। আকর্ষণ প্রবল হইলে, নামায়,—চাপ প্রবল হইলে, উঠায়।

কাহার সাধ্য, এখন বলে যে, প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যভিচার আছে? (উঠিলেও নিয়ম, নামিলেও নিয়ম, স্থির থাকিলেও নিয়ম; নিয়ম কাটাইবার যো নাই। প্রকৃতির রাজ্য বস্তুতঃই নিয়মের রাজ্য।) নারিকেল ফল যে নিয়ম লঙ্ঘন করে না, তাহা যে দিন হইতে নারিকেল ফল মনুষ্যের ভক্ষ্য হইয়াছে, তদবধি সকলেই জানে। বেলুন যে ঊর্দ্ধগামী হইয়াও নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারিল না, তাহাও দেখা গেল। কেন-না, পৃথিবীর আকর্ষণ উভয় স্থলেই বিদ্যমান।

বেহুলার বাসর

দীনেশচন্দ্র সেন

[১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা জেলার বগজুরী গ্রামে দীনেশচন্দ্র সেন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা কলেজে অধ্যয়ন করিয়া বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর "কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া" স্কুলের হেড মাষ্টারের পদে নিযুক্ত হন। এই সময় হইতে তিনি তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' লিখিতে আরম্ভ করেন। এই পুস্তক লেখায় গুরুতর শ্রমে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলে, তিনি উক্ত পদ ত্যাগ করিয়া কলিকাতা আসিতে বাধ্য হন। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' ছাড়া তিনি 'ওপারের আলো,' 'রামায়ণী কথা,' 'নীলমাণিক,' 'বেহুলা,' 'ফুল্লরা,' 'মুক্তাচুরি,' 'জড়ভরত,' 'বাঙ্গালার পুরনারী' প্রভৃতি বিবিধ পুস্তক রচনা করেন। ইঁহার ইংরেজীতে রচিত 'History of Bengali Language and Literature,' 'Chaitanya and his Age,' 'Folk Literature of Bengal' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ য়ুরোপে আদর লাভ করিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় ইঁহাকে অধ্যাপকের পদ এবং সম্মানাত্মক (Honorary) "ডি. লিট্." উপাধি দিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন এবং গভর্নমেণ্ট ইঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধি দিয়াছিলেন। ইঁহার প্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সুবৃহৎ গ্রন্থ 'বৃহৎ বঙ্গ' বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইনি ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

চাঁদ-সদাগর, পুত্র ও পুত্রবধূকে লইয়া সাঁতালী-পর্ব্বতে লৌহ-গৃহে রাখিলেন। স্বয়ং উন্মত্তের ন্যায় যষ্টিহস্তে সেই গৃহের শাস্ত্রী-দিগের তত্ত্বাবধান করিয়া অনিদ্রভাবে রাত্রি কাটাইতে লাগিলেন।

সেই লৌহ-গৃহে প্রবেশ করিতে সহসা বেহুলার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, সহসা অসাবধান হস্তক্ষেপে বেহুলা নিজের সীঁথির সিন্দুর মুছিয়া ফেলিল,—আশঙ্কায় অশ্রুমুখী বেহুলা, জলভরা একখানি

রৌদ্রদীপ্ত মেঘের ন্যায় রূপচ্ছটায় গৃহ আলোকিত করিয়া স্বামীর শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্টা হইল। গৃহে আসিয়া কৌটা খুলিয়া নিজেই আবার সিন্দুর পরিল।

বেহুলা দৈবজ্ঞের গণনার কথা শুনিয়াছিল। সে স্বামীকে চক্ষু ভরিয়া দেখিতে লাগিল। লক্ষ্মীন্দর গৃহে প্রবেশ করিয়াই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল; রঙ্গন-ফুলের মালাটি তাহার বক্ষের নিকট লুটাইয়া পড়িয়া চন্দনদীপ্ত মূর্ত্তিকে বনদেবতার ন্যায় সুদৃশ্য করিয়া তুলিয়াছিল। লক্ষ্মীন্দরের ঘুম ভাঙ্গিল; সে চাহিয়া দেখিল, একখানি স্বর্ণপ্রতিমার ন্যায় বেহুলা বসিয়া আছে। লক্ষ্মীন্দর বলিল, "দেখ, আমার বড় ক্ষুধাবোধ হইতেছে, আমায় যদি চারিটি ভাত রাঁধিয়া দিতে পার।"

এই বলিয়া লক্ষ্মীন্দর আবার ঘুমাইয়া পড়িল। বেহুলা এত রাত্রে সেই গৃহে কেমন করিয়া ভাত রাঁধিবে। বরণডালায় শুভঘট ছিল, তিনটা নারিকেল দিয়া উনন প্রস্তুত করিল; সেই শুভঘট নারিকেলের জলে পূর্ণ করিয়া বরণডালার তণ্ডুল লইয়া তাহাতে পূরিল, স্বীয় স্বর্ণখচিত পট্টবস্ত্রের আঁচল ছিঁড়িয়া, উননে অগ্নি জ্বালিয়া বেহুলা ভাত রাঁধিতে লাগিল।

এদিকে আকাশে এক নিবিড় মেঘ-গৃহে মনসাদেবী উপবিষ্ট হইয়া সর্পগণকে স্মরণ করিলেন। সেই গৃহের শীর্ষে একটা প্রকাণ্ড উল্কা-শিখা পতাকার ন্যায় ঊর্দ্ধে দুলিতেছিল; সর্পের অমূল্য মণিগুলি গৃহের সর্ব্বত্র ধক্‌ধক্ করিয়া জ্বলিতেছিল। মনসার আহ্বানে দিগ্‌দিগন্তর হইতে সর্পসমূহ তথায় ছুটিয়া আসিল,—তাহারা কেহ একশীর্ষ, কেহ বহুশীর্ষ, কাহারও দেহ চক্রাকৃতি, বিচিত্র বর্ণে সুশোভিত, কাহারও শরীর শুধু স্বর্ণরেখাময়

বিড়ঙ্গিনী, তক্ষক, বঙ্গদাড়া, শঙ্খর, তালভঙ্গ প্রভৃতি অসংখ্য সর্প তথায় উপস্থিত হইল, তাহাদের গতিতে মরুৎ মন্থর প্রতিপন্ন হইল, সাংহারিক শক্তি ও চাঞ্চল্যে বিদ্যুৎ পরাস্ত হইল।

লক্ষীন্দরকে দংশন করিতে কে যাইবে, দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন। সর্পকুল মাথা হেঁট করিল। একটা কোপনস্বভাব রক্তচক্ষু সর্প বলিল, "সাঁতালী-পর্ব্বতে যে সকল তরুমূল সঞ্চিত হইয়াছে, তাহার গন্ধ দূর হইতে পাইয়া আমার হাঁপানী রোগ জন্মিয়াছে।" বিষদন্ত বিকাশ করিয়া ত্রিশীর্ষ মহিজঙ্গ বলিল, "ময়ূর ও নকুলের হস্ত হইতে রক্ষা করিবে কে? তাহাদের ভয়ে আমার মামাতো ভাইয়েরা বহুপুরুষের বাসস্থান সাঁতালী ছাড়িয়া নীলগিরিতে আশ্রয় লইয়াছে।" দংশক সর্প রোষাবিষ্ট চক্ষু আবর্ত্তন করিয়া বলিল, "চাঁদ-সদাগর জগতের যত রোঝা সাঁতালী-পর্ব্বতে জড় করিয়াছে, তাহারা যেখানে গর্ত্ত পায়, সেইখানেই মন্ত্র পড়ে ও তরুমূল নিক্ষেপ করে; অহিকুল গর্ত্তের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। লৌহ-গৃহে একটা ছিদ্র আছে, কিন্তু যে সকল শাস্ত্রী পাহারা দিতেছে, তাহারা এক এক জন চণ্ডু ও আফিম এক এক ভরি এক এক বারে খাইয়া চক্ষু এমন রক্তবর্ণ করিয়া রাখিয়াছে যে তাহাদিগকে দেখিলে আমাদেরই ভয় হয়; তাহাদের দাঁতে যে বিষ জন্মিয়াছে, তাহাতে আমাদেরই মৃত্যু হইতে পারে, অন্ততঃ আমাদের বিষে তাহাদের কিছু হইবার নয়। তাহারা মাথা নীচু করিয়া না কামড়াইলেও তাহাদের সঙ্গিনের খোঁচা খাইলে আমরা বাঁচিব না।"

মনসাদেবী পুনর্ব্বার বলিলেন,—"আমি এ সকল ভীরুর বাক্য-কৌশল শুনিতে চাহি না, অহিকুলে কি এমন কেহ নাই যে, সমস্ত

বিপদ্ অগ্রাহ্য করিয়া লক্ষ্মীন্দরের বাসরগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক তাহাকে দংশন করে? যে সকল বিপদ্ পথে আছে, তাহা সকলেই অবগত, অশক্তগণের মুখে তাহা আমি শুনিতে চাহি না। যে বিপদে নির্ভীক, সে-ই অগ্রসর হউক।"

তখন ভীষণ ফণা বিস্তার করিয়া বঙ্করাজ সর্প অগ্রসর হইল এবং নীরবে দেবীর প্রসাদ-চিহ্ন-পানে মাথা ঠেকাইয়া সাঁতালী-পর্ব্বতের দিকে যাত্রা করিল।

তখন বেহুলা-সতী অন্ন রন্ধন করিতেছিল, সেই কাল-রাত্রিতে চারি দিক্ হইতে কি একটা শব্দ শুনা যাইতেছিল; চাঁদবেণে গৃহের চারি দিক্ ঘুরিয়া মাঝে মাঝে যে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছিলেন, একি তাহারই প্রতিধ্বনি? সহসা বেহুলা দেখিল লৌহের দেয়ালের একটা স্থানের লৌহপিণ্ড টুটিয়া যাইতেছে, তাহা হইতে লৌহচূর্ণ খসিয়া পড়িতেছে; বলা বাহুল্য সেগুলি কয়লার গুঁড়া। সেই ছিদ্র-পথে ফণা বিস্তার করিয়া বঙ্করাজ প্রবেশ করিল। বেহুলা সোণার বাটিতে কাঁচা দুগ্ধ ও রামরম্ভা রাখিয়া সেই সর্পের সম্মুখে ধারণ করিল, আহারের লোভে বঙ্করাজ মাথা হেঁট করিয়া বাটিতে মুখ প্রবেশ করাইল—বেহুলা সোনার সাঁড়াশি দিয়া তদবস্থায় সর্পকে বন্দী করিয়া ফেলিল। দ্বিপ্রহর রাত্রে কালদন্ত সর্প এবং তৃতীয় প্রহর রাত্রে উদয়কাল সর্প সেই ভাবেই বন্দী হইল,—শেষরাত্রে বেহুলা লক্ষ্মীন্দরকে ভাত খাইতে ডাকিতে লাগিল, কিন্তু লক্ষ্মীন্দর গভীর নিদ্রাভিভূত, কোন সাড়া দিল না।

সমস্ত রাত্রির দুশ্চিন্তা ও শ্রমে উপবাসী বেহুলা ক্লান্ত হইয়াছিল। বন্দী সর্পত্রয়কে একটা বৃহৎ পাত্র-দ্বারা চাপা

দিয়া রাখিয়া, বেহুলা স্বামীর পদপ্রান্তে আসিয়া বসিল, তাহার চক্ষু দু'টি ঘুমে ভাঙ্গিয়া আসিতে লাগিল, এক এক বার চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সে সেই রন্ধ্র-পথের দিকে লক্ষ্য রাখিতেছে, এবং ঘুমে হেলিয়া পড়িতেছে;—এমন সময়ে বায়ুগতি কালনাগিনী মনসাদেবীর তাড়া খাইয়া রন্ধ্র-পথে প্রবেশ করিল,—সেই গৃহ-প্রবেশকালে হঠাৎ "কে ও" স্বরে কালনাগিনীর অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল—ক্ষণকাল সে নড়িল না। কে জানে—কেন বিনিদ্র চাঁদ সেই সময়ে কোন্ গূঢ় অনিষ্টের আশঙ্কায় "কে ও" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল!

কিছুকাল নিশ্চল থাকিয়া কালনাগিনী আবার চলিল, তখন বেহুলা ক্ষণকালের জন্য নিদ্রিত হইয়া স্বামীর পদপার্শ্বে শুইয়া পড়িয়াছে; তাহার নিদ্রিত ললাটে একটা দুশ্চিন্তার রেখা জাগিয়া আছে।

দ্রুত গতিতে কালনাগিনী লক্ষ্মীন্দরের পদের সন্নিহিত হইল। এই সময়ে নিদ্রাবেশে পাশ ফিরিতে যাওয়ায়, লক্ষ্মীন্দরের পদ সর্পের দেহে আঘাত করিল; অমনি কালনাগিনী উন্নত-ফণা তুলিয়া তাহাকে দংশন করিল; লক্ষ্মীন্দর চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—

"জাগ ওহে বেহুলা, সায়বেণের ঝি।
তোরে পাইল কালনিদ্রা, মোরে খাইল কি?"

বেহুলা শশব্যস্তে জাগিয়া দেখিতে পাইল, কালনাগিনী দ্রুত গতিতে রন্ধ্র-পথে নিষ্ক্রান্ত হইতেছে—অমনি কাটারি দিয়া তাহার অষ্টাঙ্গুলি-প্রমাণ পুচ্ছ বেহুলা কাটিয়া ফেলিল,—পুচ্ছহীনা কাল-নাগিনী তড়িদ্গতিতে পলাইয়া গেল।

৬

তখন পূর্ব্বাকাশে সূর্য্যোদয় হইয়াছে; সনকা পুত্র ও পুত্রবধূর মুখ দেখিবার জন্য সাঁতালী-পর্ব্বতে হৈমবতীর ন্যায় আশিস্‌হস্তে দণ্ডায়মানা; ত্রিশূলধারী মহাদেবের ন্যায় সেই দ্বারদেশে হিন্তালের যষ্টিহস্তে ভানুকিরণোজ্জ্বল উন্নত-কায় চন্দ্রধর চিত্রপটের ন্যায় স্থির। রাত্রি পোহাইয়া গিয়াছে;—চন্দ্রধর ভাবিতেছেন, বিপদ্ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে;—তথাপি তাঁহার বক্ষ কেন ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে, নেত্রদ্বয় কেন ব্যস্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে।

বাঙ্গালীর বিশিষ্টতা

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

[১২৭৪ সালে (১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে) পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩৩০ সালের কার্ত্তিক মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার জীবনের প্রথমাংশ গভর্মেন্ট অফিসে ও অধ্যাপনা-কার্য্যে অতিবাহিত হয়। পরে সংবাদপত্রের সম্পাদন-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া তিনি প্রভূত প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। "বঙ্গবাসী," "বসুমতী," "হিতবাদী," "নায়ক" প্রভৃতি সংবাদপত্রের তিনি সম্পাদক ছিলেন। 'সাহিত্য,' 'বিজয়া,' 'সারথি,' 'বঙ্গবাণী' প্রভৃতি অধুনা-লুপ্ত মাসিক পত্রে তাঁহার লিখিত নানাবিষয়ক উৎকৃষ্ট সন্দর্ভ আছে। 'আইন-ই-আক্‌বরী'র তিনি অনুবাদ করিয়াছিলেন। 'উমা' ও 'রূপ-লহরী' তাঁহারই লিখিত উপন্যাস।]

বাঙ্গালী ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের জাতি-সকল হইতে পৃথক্ এবং স্বতন্ত্র। বাঙ্গালার স্বাতন্ত্র্য, বাঙ্গালার বিশিষ্টতার মূল উপাদান। বাঙ্গালার উপাসনা-পদ্ধতি, কর্ম্ম-পদ্ধতি, সাহিত্য, ভাষা এবং জাতিও কুল-পরিচয় প্রভৃতি বিষয় ইংরেজী যুগে ইংরেজী-নবীশ পণ্ডিতগণের দ্বারা যথারীতি আলোচিত হয় নাই, তাই ইংরেজী-নবীশ বাঙ্গালী স্বদেশের ও স্বজাতির প্রকৃত পরিচয় রাখেন না।

বৌদ্ধযুগে ধর্ম্ম, কর্ম্ম, শীল ও আচার লইয়া বাঙ্গালী নালন্দার পদ্ধতি হইতে স্বতন্ত্র হইয়াছিল। বাঙ্গালীর আগমনী বাঙ্গালীর নিজস্ব ; আগমনী-গান ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশে নাই, আর কোন জাতি এমন গান করে নাই, গান করিতে জানেও না।

বাংলা ভাষা বাঙ্গালীকে অপূর্ব্ব বিশিষ্টতা দিয়াছে। সে পরিচয় পাইতে হইলে, প্রায় সহস্র বৎসরের বাংলা ভাষার উন্মেষ-পদ্ধতি বুঝিতে হয়; সিদ্ধাচার্য্যগণের গীত ও দোঁহাবলী হইতে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি পর্য্যন্ত সমগ্র বাংলা সাহিত্যের মন্থন প্রয়োজন। এই বাংলা সাহিত্যের মধ্যে বাঙ্গালী জাতির ইতিহাস লুকান আছে। কবির গান, পাঁচালীর গান, শ্যামাবিষয়ক গান, কীর্ত্তন, গাথা প্রভৃতি কত রকমের সঙ্গীতসাহিত্য ছিল বা আছে, তাহাদের শ্রেণী-বিভাগ, বিশ্লেষণ এবং সে-সকল হইতে ইতিহাসের উপাদান-সংগ্রহ এখনও কেহ করে নাই, ঘটেও নাই। অথচ বাঙ্গালীর সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সকল ঘটনার উল্লেখ এই সকল গানে ও ছড়ায় নিবদ্ধ আছে।

বাঙ্গালীর বিশিষ্টতা এবং ব্যক্তিত্ব সমাজ-শরীরের সর্ব্ব বিষয়ে,—শিল্প-কলায়, গানে-নাচে, চিকিৎসা-শাস্ত্রে, চিকিৎসা-পদ্ধতিতে, ঔষধ-নির্ম্মাণে, লাঠি-খেলায়, নৌ-শিল্পে, কথকতায়, বয়ন-শিল্পে, তসর-গরদের বসন-প্রস্তুতিতে, গজদন্তের কারুকার্য্যে, স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কারে—সভ্য জাতির সকল ব্যসন-বিলাসে যেন সদাই স্পষ্টীকৃত হইয়া আছে। মনীষী অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, বাঙ্গালার ভূগর্ভ হইতে যত প্রতিমা বাহির হইতেছে, যত বৌদ্ধমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহাদের গঠন-ভঙ্গিমা ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ও স্বতন্ত্র। বাঙ্গালীর ভাস্কর্য্য অপূর্ব্ব ও স্বতন্ত্র। বাঙ্গালার বাস্তভাণ্ডের মধ্যে খুব বিশিষ্টতা প্রকট হইয়া আছে; বাঙ্গালার কবিওয়ালাদের ঢোল-বাজান অপূর্ব্ব ও অনন্যসাধারণ। এমন ভাবে ঢোল বাজাইতে ভারতবর্ষের আর কোন জাতি পারে না। বাঙ্গালীর

গৃহ-নির্ম্মাণ-পদ্ধতিও স্বতন্ত্র। এমন ঘর ছাইতে ভারতবর্ষের, বুঝি বা পৃথিবীর, আর কোন জাতিতে পারে না। বাঙ্গালার আটচালা ও চণ্ডীমণ্ডপ সকল সত্যই বিদেশীয়ের বিস্ময় উৎপাদন করিত; এমনটি পৃথিবীর আর কোথাও ছিল না—নাই-ও। এমন কি বাঙ্গালার জনার্দ্দন, বিশ্বম্ভর, জনমেজয় প্রভৃতি কর্ম্মকারগণ যেমন তোপ, কামান তৈয়ার করিতে পারিত, দিল্লীর কারিকরে তেমনটি পারিত না; জাহান-কোষা, দল-মাদল, কালে-খাঁ প্রভৃতি কামান এখনও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। বাঙ্গালীর নৌ-শিল্প সত্যই অপরাজেয় ছিল। এমন নৌকা চালাইতে, জাল বুনিতে ভারতের আর কোন জাতি পারিত না। বাঙ্গালার "ষাট বৈঠা"র ছিপে চড়িয়া মীরকাশেম এক রাত্রেই গোদাগিরি হইতে মুঙ্গেরে গিয়াছিলেন। বাঙ্গালার আর একটা শিল্প ছিল—কুসুম-শিল্প। নানা পুষ্পের আভরণ ও অলঙ্কার বাঙ্গালী যেমন তৈয়ার করিতে পারিত, এমন আর কোন জাতি পারিত না। আরঙ্গজেব-পুত্র যুবরাজ মহম্মদ পিতাকে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন,—"কি আর মণিমুক্তা চুনিপান্নার লোভ দেখাও পিতা, বাঙ্গালার কুসুমাভরণ দিল্লীর জড়োয়া অলঙ্কার-সকলকে হেলায় পরাজয় করে,—এমনটি তুমি দেখ নাই।" সে শিল্প লোপ পাইয়াছে।

আসল কথাটি কি জান, বাঙ্গালী আর্য্যাবর্ত্তের আর্য্যগণ হইতে একটা সম্পূর্ণ পৃথক্ জাতি। বৈদিক যুগের সময় হইতে বাঙ্গালায় এক স্বতন্ত্র সভ্যতা ও মনুষ্য-সমাজ বিদ্যমান ছিল। প্রাচ্যের সে সভ্যতা বৈদিক সভ্যতার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। বাঙ্গালায় বৈদিক ধর্ম্ম, সভ্যতা, আচার-ব্যবহার কিছুই শিকড় গাড়িয়া বসিতে পারে নাই। যুগে যুগে বারে বারে পশ্চিম দেশ হইতে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি

আমদানী করিয়াও বাঙ্গালায় যাগযজ্ঞাদির তেমন প্রচলন হয় নাই। এত আক্রমণেও বঙ্গদেশ ও বাঙ্গালী জাতি স্বীয় বিশিষ্টতা রক্ষা করিতে পারিয়াছিল, উপরন্তু আগন্তুকগণকে বাঙ্গালার বিশিষ্টতায় মণ্ডিত করিতে পারিয়াছিল। স্বীকার করি বটে যে, বাঙ্গালী আর্য্যাবর্ত্ত হইতে, আর্য্যগণের নিকট হইতে অনেক তথ্য, অনেক সিদ্ধান্ত, অনেক বিদ্যা সংগ্রহ করিয়াছিল; কিন্তু সে-সকলকে বাঙ্গালীর মনীষা যেন বাঙ্গালার কোমল পেলব পলিমাটির আবরণ দিয়া এতই মধুর, এতই স্নিগ্ধ, এমনই রসাল করিয়াছিল যে, পরে উহা আর্য্যাবর্ত্ত হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছিল।

চিনিতে জানি না, চিনিতে পারি না, চিনিতে ভুলিয়াছি বলিয়া—বাঙ্গালীর ধর্ম্ম-কর্ম্ম, সাধন-তন্ত্র, ভাবের ভাষা, রসের ভাষা প্রভৃতি সব ভুলিয়াছি। আমরা বাঙ্গালী হইয়াও বাঙ্গালার শ্লাঘায় আর শ্লাঘা বোধ করি না। একবার তাকাও—মালঞ্চ-বেষ্টনী-পরিবৃত বাঙ্গালীর নিজ নিকেতনের প্রতি সস্নেহে একবার তাকাও,—জাতির অতীত ইতিহাসের মুকুরে স্বদেহের, স্বীয় সমাজ-শরীরের প্রতিবিম্ব দেখিয়া অধঃপতনের গভীরতা একবার বুঝিয়া লও; তাহা হইলে আবার যেমন ছিলে, তেমনই হইবে,—হারানিধি ফিরাইয়া পাইবে, তোমাদের শ্যামা জন্মভূমি তোমাদেরই হইবে।

মন্ত্রশক্তি

প্রমথ চৌধুরী

[প্রমথ চৌধুরী বা 'বীরবল' বঙ্গসাহিত্যের একজন অতিপ্রসিদ্ধ লেখক। পাবনা জেলায় হরিপুরের প্রসিদ্ধ চৌধুরীবংশে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র। 'সবুজ পত্র' নামক প্রসিদ্ধ পত্রিকার সম্পাদকরূপে ইনি কথাভাষায় নানা-বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে নব-রীতির প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ইঁহার রচিত পুস্তকগুলির মধ্যে 'বীরবলের খাতা,' 'চার ইয়ারী কথা,' 'সনেট্-পঞ্চাশৎ,' 'নীললোহিত' প্রভৃতি সবিশেষ প্রসিদ্ধ। ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার।]

মন্ত্রশক্তিতে তোমরা বিশ্বাস কর না, কারণ আজকাল কেউ করে না;—কিন্তু আমি করি। এ বিশ্বাস আমার জন্মেছে, শাস্ত্র প'ড়ে নয়, মন্ত্রের শক্তি চোখে দেখে'।

চোখে কি দেখেছি, বলছি।

দাঁড়িয়ে ছিলুম চণ্ডীমণ্ডপের বারাণ্ডায়। জন দশ-বারো লেঠেল জমায়েত হয়েছিল পূব দিকে, ভোগের দালানের ভগ্নাবশেষের সুমুখে; পশ্চিমে শিবের মন্দির, যার পাশে বেলগাছে একটি ব্রহ্মদৈত্য বাস করতেন, যাঁর সাক্ষাৎ বাড়ীর দাসী-চাকরানীরা কখনো কখনো রাত দুপুরে পেতেন,—ধোঁয়ার মত যাঁর ধড়, আর কুয়াসার মত যাঁর জটা। আর দক্ষিণে পুজোর আঙিনা—যে আঙিনায় লক্ষ বলি হয়েছিল বলে' একটি কবন্ধ জন্মেছিল। এঁকে কেউ দেখেননি, কিন্তু সকলেই ভয় করতেন।

লেঠেলদের খেলা দেখবার জন্ম লোক জুটেছিল কম নয়। মনিরুদ্দি সর্দ্দার, তার সৈন্ত-সামন্ত কে কোথায় দাঁড়াবে, তারই ব্যবস্থা করছিল। কি চেহারা তার। গৌরবর্ণ, মাথায় ছ-ফুটের উপর লম্বা, গালে লম্বা পাকা দাড়ি, গোঁপ-ছাঁটা। সে ছিল ওদিগের সব সেরা লকড়িওয়ালা।

এমন সময় নায়েববাবু আমাকে কানে কানে বললেন, "ঈশ্বর পাটনিকে এক হাত খেলা দেখাতে হুকুম করুন না। ঈশ্বর লেঠেল নয়, কিন্তু শুনেছি, কি লাঠি, কি লকড়ি, কি সড়কি— ও হাতে নিলে, কোন লেঠেলই ওর সুমুখে দাঁড়াতে পারে না। আপনি হুকুম করলে, ও না বলতে পারবে না, কারণ ও আপনাদের বিশেষ অনুগত প্রজা।"

এর পর নায়েববাবু ঈশ্বরকে ডাকলেন। ভিড়ের ভিতর থেকে একটি লম্বা ছিপছিপে লোক বেরিয়ে এল। তার শরীরে আছে শুধু হাড় আর মাস,—চর্ব্বি এক বিন্দুও নেই। রঙ তার কালো অথচ দেখতে সুপুরুষ।

আমি তাকে বললুম, "আজ তোমাকে এক হাত খেলা দেখাতে হবে।"

লোকটা অতি ধীরভাবে উত্তর করলে, "হুজুর, লেঠেলি আমার জাত্-ব্যবসা নয়। বাপ-ঠাকুরদার মত—আমিও খেয়ার নৌকো পারাপার করেই দু'-পয়সা কামাই। আমার কাজ লাঠি খেলা নয়, লগি ঠেলা। তাই বলছি হুজুর, এ আদেশ আমাকে করবেন না।"

আমি জিজ্ঞেস করলুম, "তা হ'লে, তুমি লাঠি খেলতে জানো না?"

সে উত্তর করলে, "হুজুর, জানতুম ছোকরা বয়সে—তার পর আজ বিশ-পঁচিশ বছর, লাঠিও ধরিনি, লকড়িও ধরিনি, সড়কিও ধরিনি ;—তা ছাড়া—আর একটা কথা আছে। এদের কাছে আমি ঠাকুরের স্বমুখে দিব্যি করেছি যে, আমি আর লাঠি, সড়কি ছোঁব না। সে কথা ভাঙি কি করে'? হুজুরের হুকুম হ'লে, আমি না বলতে পারিনে, তবে—হুজুর যদি আমার কথাটা শোনেন, তবে হুজুর আমাকে আর এ আদেশ করবেন না।"

আমি জিজ্ঞেস করলুম, "কেন এ রকম দিব্যি করেছিলে?"

ঈশ্বর বললে, "ছেলেবেলায় এরা সব খেলা শিখতো। আমিও খেলার লোভে এদের দলে জুটে গিয়েছিলুম। আমার বয়েস যখন বছর কুড়িক, তখন কি লাঠি, কি লকড়ি, কি সড়কিতে—আমিই হয়ে উঠলুম সকলের সেরা। এরা ভাবলে যে, আমি কোনও মন্তর-তন্তর শিখেছি—তারি গুণে আমি সকলকে হঠিয়ে দিই। হুজুর, আমি তন্তর-মন্তর কিছুই জানিনে, তবে আমার যা ছিল, তা এদের কারও ছিল না। সে জিনিষ হচ্ছে চোখ। আমি অন্যের চোখের ঘোরাফেরা দেখেই বুঝতুম যে, তার হাতের লাঠি, সড়কির মার কোন্ দিক্ থেকে আসবে। কিন্তু আমার চোখ দেখে এরা কিছুই বুঝতে পারতো না, আর শুধু মার খেতো। শেষটা এরা সকলে মিলে যুক্তি করলে যে, আমাকে কালীবাড়ী নিয়ে গিয়ে হাড়কাঠে ফেলে' বলি দেবে। তার পর, একদিন এরা রাত দুপুরে আমার বাড়ী চড়াও হয়ে', আমাকে বিছানা থেকে তুলে', আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে' আমাকে কালীবাড়ী নিয়ে গিয়ে হাড়কাঠে ফেলে' বলি দেবার উদ্যোগ করলে। খাঁড়া ছিল ঐ গুলিখোর মিছু সর্দ্দারের হাতে।

আমি প্রাণভয়ে অনেক কান্নাকাটি করবার পর এরা বললে, 'তুমি ঠাকুরের সুমুখে দিব্যি কর যে, আর কখনো লাঠি ছোঁবে না, তা হ'লে তোমাকে ছেড়ে দেব।' হুজুর, নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে এই দিব্যি করেছি; আর তার পর থেকে একদিনও লাঠি, সড়কি ছুঁইনি। কথা সত্যি কি মিথ্যে —ঐ গুলিখোর মিছুকে জিজ্ঞেস করলেই টের পাবেন।"

মিছু আমাদের বাড়ীর লেঠেলের সর্দ্দার।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলুম, "ঈশ্বরের কথা সত্যি না মিথ্যে?" সে 'হাঁ' 'না'—কিছুই উত্তর করলে না।

ঈশ্বর এর পর বলে' উঠল, "হুজুর, আমি মিথ্যে কথা জীবনে বলিনি—আর, কখনো বলবও না।"

তার পর, আমি তাকে জিজ্ঞেস করলুম, "মিছু যদি গুলিখোর হয়, ত এমন পাকা লেঠেল হ'ল কি করে'?"

ঈশ্বর বললে, "হুজুর, নেশায় শরীরের শক্তি যায়, কিন্তু গুরুর কাছে শেখা বিদ্যে ত যায় না। বিদ্যে হচ্ছে আসল শক্তি। সেদিন দেখলেন না? ঠাকুরদাস কামার অত বড় মোষটার মাথা এককোপে বেমালুম কাটলে, আর ঠাকুরদাস দিনে-দুপুরে গুলি খায়। আমি নেশা করিনে বটে, কিন্তু বয়সে আমার শরীরের জোর এখন কমে' এসেছে—যেমন সকলেরই হয়। যদি এরা অনুমতি দেয়—তা হ'লে দেখতে পাবেন যে, বুড়ো হাড়েও বিদ্যে সমান আছে।"

এর পর আমি লেঠেলদের জিজ্ঞেস করলুম—তারা ঈশ্বরকে খেলবার অনুমতি দেবে কি না। তারা পরস্পর পরামর্শ

করে' বললে, "আমরা ওকে হুজুরের কথায় আজকের দিনের মত অনুমতি দিচ্চি। দেখা যাক, ও কি ছেলে-খেলা করে।"

লেঠেলদের অনুমতি পাবার পর, ঈশ্বর কোমরের কাপড় তুলে' বুকে বাঁধলে; আর তার ঝাঁকড়া চুল, একমুঠো ধুলো দিয়ে. ঘসে' ফুলিয়ে তুললে, তারপর মাটিতে ঘোড়াসন হয়ে বসে', পাঁচ মিনিট ধরে' বিড় বিড় করে' কি বকতে লাগল। অমনি লেঠেলরা সব এই বলে' চীৎকার করে' উঠল, "দেখছেন, বেটা মন্তর আওড়াচ্ছে—আমাদের নজরবন্দী করবার জন্যে।" ঈশ্বর এসব চেঁচামেচিতে কর্ণপাতও করলে না। তার পর, যখন সে উঠে' দাঁড়াল, তখন দেখি, সে আলাদা মানুষ। তার চোখে আগুন জ্বলছে ও শরীরটে হয়েছে ইস্পাতের মত।

ঈশ্বর বললে, "প্রথম এক হাত লকড়ি নিয়েই ছেলে-খেলা করা যাক। এদের ভিতর কে বাপের বেটা আছে, লকড়ি ধরুক।"

মনিরুদ্দি সর্দ্দার বললে, "আমার ছেলে কামালের সঙ্গেই এক হাত খেলে', তাকে যদি হারাতে পার, তা হ'লে আমি তোমাকে লকড়ি খেলা কা'কে বলে, তা দেখাব।" তার পরে একটি বছর-কুড়িকের ছোকরা এগিয়ে এল। সে তার বাপের মতই সুপুরুষ, গৌরবর্ণ ও দীর্ঘাকৃতি; বাঁ হাতে ছোট্ট একটি বেতের ঢাল আর ডান হাতে পাকা বাঁশের লাল টুকটুকে একখানি লকড়ি। খেলা সুরু হ'ল; তার পর, এক মিনিটের মধ্যেই দেখি—কামালের লকড়ি ঈশ্বরের বাঁ হাতে,

আর কামাল নিরস্ত্র হয়ে বোকার মত দাঁড়িয়ে আছে। তখন ঈশ্বর বললে, "যে লকড়ি হাতে ধরে' রাখতে পারে না, সে আবার খেলবে কি?" একথা শুনে'—মনিরুদ্দি রেগে আগুন হয়ে লকড়ি-হাতে এগিয়ে এল। ঈশ্বর বললে, "তোমার হাতের লকড়ি কেড়ে নেব না, কিন্তু তোমার গায়ে আমার লকড়ির দাগ বসিয়ে দেব।" এর পরে পাঁচ মিনিট ধরে' দু'জনের লকড়ি বিদ্যুৎবেগে চলাফেরা করতে লাগল। শেষটা মনিরুদ্দির লকড়ি উড়ে শিবের মন্দিরের গায়ে গিয়ে পড়ল। আর দেখি—মনিরুদ্দির সর্ব্বাঙ্গে লাল লাল দাগ হয়ে গিয়েছে, যেন কেউ সিঁদুর দিয়ে তার গায়ে ডোরা-কেটে দিয়েছে।

মনিরুদ্দি মার খেয়েছে দেখে' হেদাৎউল্লা লাফিয়ে উঠে' বললে, "ধর বেটা সড়কি।" ঈশ্বর বললে, "ধরছি। কিন্তু সড়কি যেন আমার পেটে বসিয়ে দিও না। জানি তুমি খুনে। কিন্তু এ ত কাজিয়া নয়—আপোশে খেলা। আর এই কথা মনে রেখ, রক্ত যেমন আমার গায়ে আছে, তোমার গায়েও আছে।" এর পর সড়কির খেলা সুরু হ'ল। সড়কির সাপের জিভের মত ছোট ছোট ইস্পাতের ফলাগুলো অতি ধীরে ধীরে একবার এগোয় আবার পিছোয়। এ খেলা দেখতে গা কি রকম করে, কারণ সড়কির ফলা ত সাপের জিভ নয়, দাঁত। সে যাই হোক, হেদাৎউল্লা হঠাৎ 'বাপ রে' বলে' চীৎকার করে' উঠল।

তখন তাকিয়ে দেখি, তার কব্জি থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে, আর তার সড়কিখানি রয়েছে মাটিতে পড়ে'। ঈশ্বর বললে, "হুজুর, নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে ওর কব্জি জখম

করেছি, নইলে ও আমার পেটের নাড়ীভুঁড়ি বার করে' দিত। আমি যদি সড়কি ওর হাত থেকে খসিয়ে না দিতুম, তা'হলে তা আমার পেটে ঠিক ঢুকে যেত। এ খেলার আইন-কানুন ও বেটা মানে না, ও চায়—হয় জখম করতে, নয় খুন করতে।"

হেদাৎউল্লার রক্ত দেখে' লেঠেলদের মাথায় খুন চড়ে গেল, আর সমস্বরে—'মার বেটাকে' বলে' চীৎকার করে' তারা বড় বড় লাঠি নিয়ে ঈশ্বরকে আক্রমণ করলে। ঈশ্বর একখানা বড় লাঠি দু'হাতে ধরে' আত্মরক্ষা করতে চেষ্টা করতে লাগল। তখন আমি ও নায়েববাবু দু'জনে গিয়ে লেঠেলদের থামাতে চেষ্টা করতে লাগলুম। হুজুরের হুকুমে তারা সব তাদের রাগ সামলে নিলে, আর তা ছাড়া লাঠির ঘায়ে অনেকেই কাবু হয়েছিল। কারও কারও মাথাও ফেটে গেছল। শুধু ঈশ্বর এদের মধ্যে থেকে অক্ষত শরীরে বেরিয়ে এসে আমাকে বললে, "আমি শুধু এদের মার ঠেকিয়েছি। কাউকেও এক ঘা মারিনি। ওদের গায়ে-মাথায় যে দাগ দেখছেন—সে সব ওদের লাঠিরি দাগ। এলোমেলো লাঠি চালাতে গিয়ে—এর লাঠি ওর মাথায় পড়েছে, ওর লাঠি এর মাথায়। আমি যে এদের লাঠিবৃষ্টির মধ্যে থেকে মাথা বাঁচিয়ে এসেছি, সে শুধু হুজুরের—ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে।"

মিছু সর্দ্দার বললে, "হুজুর, আগেই বলেছিলুম, ও বেটা যাদু জানে, এখন ত দেখলেন যে, আমাদের কথা ঠিক। মন্তরের সঙ্গে কে লড়তে পারবে?"

ঈশ্বর হাতযোড় করে' বললে, "হুজুর, আমি মন্তর-তন্তর কিছুই জানিনে। তবে লাঠি-সড়কি ধরামাত্র আমার শরীরে কি যেন

ভর করে। শক্তি আমার কিছুই নেই; যিনি আমার দেহে ভর করেন, সব শক্তি তাঁরই।"

আমি বুঝলুম—লেঠেলদের কথা ঠিক। ঈশ্বরের গায়ে যিনি ভর করেন, তাঁরই নাম মন্ত্রশক্তি অর্থাৎ দেবতা। শুধু লাঠি-খেলাতে নয়, পৃথিবীর সব খেলাতেই—যথা সাহিত্যের খেলাতে, পলিটিক্সের খেলাতে—তিনিই দিগ্বিজয়ী হন, যাঁর শরীরে এই দৈবশক্তি ভর করে। এ শক্তি যে কি, যাঁদের শরীরে তা নেই, তাঁরা তা জানেন না, আর যাঁদের শরীরে আছে, তাঁরাও জানেন না।

কৌতূহল

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

[খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাঙ্গালার প্রধান প্রধান মাসিক পত্রিকায় বহু গল্প ও প্রবন্ধ লিখিয়া প্রভূত যশ অর্জ্জন করিয়াছেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে ইঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য। ইঁহার 'নীলাম্বরী,' 'বিবি বউ,' 'পদামৃত-মাধুরী', 'মুদ্রাদোষ' প্রভৃতি কয়েকখানি সুলিখিত গ্রন্থ আছে। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গসাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক।]

কৌতূহলের সীমা নাই। মানবের মস্তিষ্ক এই কৌতূহলের এক বিশ্রামহীন কারখানা। সমস্ত বিশ্ব হইতে ছুটি লইয়া যখন কুটীর-ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করি, নিদ্রার যাদুস্পর্শে যখন অলস চক্ষু নিমীলিত হইয়া আসে, তখনও আমার অতৃপ্তি-সার-সর্ব্বস্ব কৌতূহল, হয় একটি টিক্‌টিকির পশ্চাতে, না হয় কোনও দূরাগত শব্দের অনুসরণে ছুটিয়া যাইতে চাহে। টিক্‌টিকিটি কেমন করিয়া মাধ্যাকর্ষণের জড়জগজ্জয়ী নিয়মকে হেলায় উল্লঙ্ঘন করিয়া প্রাচীরে ও কড়িকাঠ বহিয়া ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়? ঐ শব্দটি কোথা হইতে হঠাৎ ভাসিয়া আসিতেছে? বায়ুর তরঙ্গ কর্ণপটহে আঘাত করিলে তবে ত আমরা শব্দ পাই; কিন্তু জলের একটি তরঙ্গ যেমন অপর তরঙ্গের সঙ্গে মিশিয়া যায়, সেটি আবার অন্যটির সঙ্গে, এইরূপে তরঙ্গে তরঙ্গে মেশামিশি হইয়া জলাশয়ের বক্ষ কম্পিত, তরাঙ্গত, উদ্বেলিত হইয়া উঠে; মূল তরঙ্গ বা কোন তরঙ্গ-বিশেষের

পৃথক্ সত্তা তখন আর বুঝা যায় না। বায়ুর তরঙ্গে কি তেমন হয় না? যদি তাহাই হয়, তবে আমরা কেমন করিয়া শব্দ শুনি? কানের ভিতর তরঙ্গ-বিশ্লেষণকারী স্নায়ু আছে নাকি? কিন্তু সে স্নায়ু ত সুরকে পৃথক্ করিয়া দেয়, শব্দকেও কি পৃথক্ করে? দূরে চক্রবালের নিম্ন হইতে মেঘের গুরুগুরু গর্জ্জন আসিতেছে, অদূরে ঝোপের ভিতর ঝিঁঝিঁর মহোৎসব পড়িয়া গিয়াছে, পথের শেষ সীমায় কুকুর থাকিয়া থাকিয়া ডাকিতেছে, নদীবক্ষে সুপ্ত আরোহী লইয়া যে নৌকাখানি স্রোতের সঙ্গে ভাসিয়া চলিয়াছে, তাহার মাঝি গলা কাঁপাইয়া ক্ষেপণীর তালে তালে গান ধরিয়াছে —সবই ত আমার কানে সুস্পষ্ট ভাবে আসিতেছে। প্রত্যেক শব্দটি যে বায়ুতরঙ্গ-পরম্পরা সৃষ্টি করিতেছে, তাহা কি অপরটির সহিত মিশে না? যদি মিশে, তবে কর্ণ তাহাকে কি করিয়া পৃথক্‌ভাবে প্রাপ্ত হয়? এমনই আরও কত সঙ্গত অসঙ্গত প্রশ্ন মস্তিষ্ক আলোড়িত করিয়া নিশীথের বিশ্রামচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দেয়।

কৌতূহল চিরপনের। শিশু তাহার প্রথম বাক্যস্ফূর্ত্তির সঙ্গেই এই কৌতূহলের পরিচয় দিয়া থাকে। যে শিশু যত চতুর বা বুদ্ধিমান্, সে তত জিনিসের "কেন" জানিতে চাহিয়া তাহার বয়োজ্যেষ্ঠকে বিপন্ন করিয়া তুলে।—সাপ জঙ্গলে থাকে কেন? জল ঠাণ্ডা কেন? দীপ জ্বালিলে ঘর আলো হয় কেন? নদীর জল কখনও এক দিকে, কখনও আর এক দিকে বহিয়া যায় কেন? খুকী কাঁদিলে তাহার চোখে জল আসে কেন? এইরূপ শত প্রশ্নে সে তাহার প্রস্ফুরিত জ্ঞানাঙ্কুরের পরিচয় দিয়া থাকে। তাহার পিতা বা শিক্ষক এই সকল "কেন"র উত্তর দিয়া উঠিতে পারেন না; কারণ তাঁহারা নিজেরাই এমন অনেক "কেন"র

মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহাদেরও কৌতূহল আছে, প্রশ্ন আছে, "কেন" আছে, কিন্তু সে কৌতূহল এমন সর্ব্বব্যাপী নহে। সে কৌতূহল কালাকাল, পাত্রাপাত্র বিবেচনা করিয়া থাকে। শিশুর কৌতূহল কালাকাল, পাত্রাপাত্র বিবেচনা করে না; তাহার পক্ষে কোন্ কথা জিজ্ঞাসা করিতে নাই, কোন্ কথা জিজ্ঞাসা করিতে আছে, সে তাহার বড়-একটা খোঁজ রাখে না। কোন্ প্রশ্নের উত্তর নাই, কোন্ প্রশ্নেরই বা আছে, সে বিষয়ে সে সম্পূর্ণ উদাসীন। কোন্ বিষয় তাহার পক্ষে সুগম, কোন্ বিষয় দুর্গম বা একেবারেই অগম্য, তাহা সে জানে না। সে জানে তাহার আপনার অতি ক্ষুদ্র জগৎটিকে, আর আছে তাহার দুরন্ত কৌতূহল। সে যখন যাহাকে খুসী, যে কোনও প্রশ্ন, যেমন ইচ্ছা তেমনই ভাবে, করিয়া ফেলে। এইখানেই তাহার কল্পনা ও কৌতূহলের মৌলিকতা, সরলতা ও পবিত্রতা।

শিশু যখন বড় হয়, তখন তাহার সঙ্কীর্ণ জগৎ পরিসর প্রাপ্ত হইতে থাকে; ক্রমে সে বহির্জ্জগতের সঙ্গে আপনাকে মানাইয়া লইয়া চলিতে চেষ্টা করে। জগতের সহিত তাহার পরিচয় কর্ম্মে। বস্তুতঃ কর্ম্মই জগতের সহিত মানবের ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের মুখ্য উপায়। একটি সুস্থ, সবল বালকের কার্য্যকলাপ দেখিলে বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, সে কেমন করিয়া আপনার সহিত জগতের অসংখ্য বন্ধন বাঁধিয়া তুলিতেছে। শিশুর ক্রীড়া—কর্ম্মেরই অভিনয় মাত্র। শিশুরা যে শুধু পরিণতবয়স্ক মানবের অনেক কর্ম্মই তাহাদের খেলার ছাঁচে ঢালিয়া আনন্দের সামগ্রী করিয়া তুলে, তাহাই নহে; তাহাদের খেলায় যে অঙ্গচালনার দরকার হয়, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাই ভবিষ্যতের কর্ম্ম-শক্তিকে অধিকতর ফলপ্রসূ করিয়া তুলে।

বালকের অসংযত চাপল্য যতদিন কর্ম্মে বা কর্ম্মের পূর্ব্বাভাস-স্বরূপ ক্রীড়াবৈচিত্র্যে আত্মপ্রকাশ না করে, ততদিন তাহার অবাধ কৌতূহল সকল দিকে, সকল বিষয়ে ক্রীড়া করিতে থাকে। শিশুর জীবনের এই যে সময়, ইহা তাহার জ্ঞানার্জ্জনের অতি প্রকৃষ্ট সময়। একজন ইংরেজ মনস্তত্ত্ববিদ্ বলিয়াছেন যে, শিশু তাহার জীবনের প্রথম তিন বৎসরে যতটা শিখে, কৈশোরে তিন বৎসর কলেজে পড়িয়া ততটা শিখিতে পারে না। প্রথম তিন বৎসরে শিশু যে সকল বিষয় অধিগত করিয়া ফেলে, তাহা ধীরভাবে পর্য্যালোচনা করিলে বাস্তবিকই বিস্মিত হইতে হয়। সে হাসিতে শিখে, বসিতে শিখে, দাঁড়াইতে শিখে, হাঁটিতে শিখে, দৌড়াইতেও শিখে; প্রয়োজনীয় প্রায় সকল রকম অঙ্গচালনাই সে এই অত্যল্প কালে শিখিয়া ফেলে। যাঁহারা বেহালা কিংবা হারমোনিয়ম শিখিবার স্বল্লায়াসে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়েন এবং চক্ষু, অঙ্গুলি, বাহু এবং মস্তকের পৃথক্ পৃথক্ সঞ্চালনগুলিকে একত্র, সমঞ্জসীভূত করিয়া একখানি গৎ অভ্যাস করিতে গিয়া "উঃ, কি ভয়ঙ্কর কঠিন" বলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, শৈশবে ইহা অপেক্ষা আরও কত "ভয়ঙ্কর কঠিন" অঙ্গভঙ্গী আয়ত্ত করিতে হইয়াছিল।

এই ত গেল অঙ্গ-সঞ্চালনের "বড় যন্ত্র"। শিশু তাহার প্রথম জীবনে যেমন করিয়া একটি ভাষা শিক্ষা করে, অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই পরজীবনে সেরূপ ভাবে একটি ভাষাকে আয়ত্ত করা সম্ভব হয়। তারপর বস্তু-জ্ঞান। সে সম্বন্ধেও শিশু সাধারণতঃ অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া থাকে। অনেক পিতামাতা ইহার উপর আবার বর্ণপরিচয়ের গুরুতর

তার তিনবর্ষ-বয়স্ক শিশুর স্কন্ধে চাপাইতে ছাড়েন না। ইহা যে বড়ই গর্হিত, সে কথা বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। শিশু আপনি যাহা শিখে,—চলিতে বলিতে এমন কি অনুকরণ করিতে যে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়, তাহাই অদ্ভুত। এই অদ্ভুত ব্যাপারের মূলে অবশ্য শিশুর সহজাত সংস্কার বিদ্যমান আছে। সংস্কার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত অথবা পিতৃপিতামহসঞ্চিত জ্ঞান। সংস্কারের প্রভাবে শিশুর ব্যক্তিগত চেষ্টা অনেক কমিয়া যায়; যাহা বস্তুতঃ কঠিন এবং বহু আয়াসসাধ্য, তাহা সহজ ও সংক্ষিপ্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

মানবের কৌতূহল বাধা পাইলেই উপকথার রাজপুত্রের ন্যায় বেশী অধীরতা প্রকাশ করে। সন্ন্যাসী রাজপুত্রকে বলিল, উত্তরে যাইও, পূর্ব্বে যাইও, পশ্চিমে যাইও, কিন্তু কিছুতেই দক্ষিণে যাইও না। রাজপুত্র উত্তরেও গেলেন না, পূর্ব্বেও গেলেন না, পশ্চিমেও গেলেন না; তিনি ঐ দক্ষিণে যাইবার জন্যই জিদ্ করিলেন—খায় রাক্ষসী খাইবে, তবুও দক্ষিণে যাইতে হইবে। শাস্ত্রের দৃষ্টান্ত কতকটা সেই রকমের বলিয়া মনে হয়। যে দিকে যে দিকে মানবের চিন্তা ব্যর্থ হইয়াছে, যে তত্ত্ব উদ্ভাবন করিতে গিয়া সে বিফল-প্রযত্ন হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, সেই দিকে যাইবার জন্যই তাহার যেন জিদ্, সেই তত্ত্ব জানিবার জন্যই তাহার মন সর্ব্বাগ্রে ব্যাকুল।

কিন্তু কর্ম্মকে ছাড়িয়া চিন্তা কি সফলতা লাভ করিতে পারে? মানব কর্ম্মশীল জীব। কর্ম্মই তাহার অবলম্বন। তাহার জীবনীশক্তি কর্ম্মে অভিব্যক্তি লাভ করে। কৌতূহল যখন কর্ম্মকে বর্জ্জন করিয়া অন্য ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে চাহে, তখন আমরা

আশানুরূপ ফললাভ করিতে পারি না। এই স্থানে একটি গল্প বলিয়া উপসংহার করিব।

এক ব্যক্তির পিতা মৃত্যুকালে তাহাকে একটি প্রদীপ দিয়া গিয়াছিলেন। বংশপরম্পরানুক্রমে সে প্রদীপ তাহাদের গৃহে বিরাজ করিতেছিল। প্রদীপের এই আশ্চর্য্য গুণ ছিল যে, সে প্রদীপ জ্বালিলেই তাহাদের সমস্ত অভাব মোচন হইত,—প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছুই সে প্রদীপের নিকট চাহিলে পাওয়া যাইত না। প্রদীপের বারটি ডাল ছিল, সেগুলিতে বাতি জ্বালিলে বার জন দরবেশ তাহার ভিতর হইতে বাহির হইয়া নানা প্রকার নৃত্য করিতেন; পরে অভাব-মোচনোপযোগী সমস্ত দ্রব্য প্রদান করিয়া দরবেশগণ অন্তর্হিত হইতেন। কিছু দিন এইরূপ ভাবে অতিবাহিত হইলে, যুবকের মনে অসন্তোষ এবং কৌতূহলের আবির্ভাব হইল। সে ভাবিল, এই প্রদীপে যখন আশ্চর্য্য উপায়ে আমাদের দৈনন্দিন অভাব দূর হয়, তখন ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হইতে পারিলে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইতে পারিব। এই ভাব কিছুকাল হৃদয়ে পোষণ করিয়া সে বড়ই অধীর হইয়া পড়িল, এবং এক জন বৃদ্ধ ফকীরের নিকট প্রদীপটি লইয়া তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতে গেল। ফকীর যাদুবিদ্যা জানিতেন; তিনি তাহাকে বলিলেন, "বৎস, যাহা পাইয়াছ, তাহাতেই সন্তুষ্ট হও, তাহার অধিক আকাঙ্ক্ষা করিও না।" কিন্তু যুবক বুঝিল না; তখন তিনি তাহাকে প্রদীপের অলৌকিক শক্তি দেখাইয়া দিলেন। ফকীরের স্পর্শে বারটি দরবেশ প্রদীপের বারটি শাখা হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, এবং অদ্ভুত নৃত্যাদির পরে বহু মূল্যবান্ মণিরত্নাদি প্রদান করিয়া অদৃশ্য হইলেন। যুবক বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল,

সে প্রদীপটি গৃহে লইয়া গিয়া ঐশ্বর্য্যলাভের জন্ত ব্যগ্র হইল। কিন্তু ফকীর যেমন বামহস্ত-দ্বারা আঘাত করিয়াছিলেন, সে তাহা ভুলিয়া গিয়া দক্ষিণহস্ত-দ্বারা আঘাত করিল। কাজেই ফল এক হইল না। ধনরত্নের পরিবর্ত্তে রাক্ষসগণ দেখা দিল এবং তাহাকে অশেষরূপে নির্য্যাতন করিয়া অদৃশ্য হইল।

এই প্রদীপেরই মত আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি। কর্ম্ম ও চিন্তার সামঞ্জস্যেই আমাদের জীবন। কৌতূহল যখন এই সামঞ্জস্যের সমভূমি পরিত্যাগ করিয়া যায়, তখন আমাদের চিন্তা ও সাধনা সুফলপ্রসূ হয় না, বরং তাহাতে মানবের অকল্যাণ হয়। মানুষের কৌতূহল নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক উদ্ভাবন করিয়া মানুষেরই বিনাশের পথ প্রশস্ত করে।

জন্মভূমি

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১২৭৭ সালে (১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে) বলেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। ইনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র। 'বালক,' 'ভারতী,' 'সাহিত্য,' 'সাধনা' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় ইনি বহু প্রবন্ধ ও কবিতা লিখিয়াছিলেন। ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে, ১৩০৬ সালে ইঁহার মৃত্যু হয়।]

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

অভাগিনী জন্মভূমির মুখের পানে চাহিয়া জড়-হৃদয় পাষাণও কাঁদিয়া ফেলে, কিন্তু সেই শ্যামল স্নেহে চির-বর্দ্ধিত সন্তানের কোমল হৃদয় ত কাঁদে না। শ্যামলা জননীর প্রস্ফুটিত হাসিমুখ আমরা আর দেখিব না, জননীর হৃদয় শোষণ করিয়া মৃত্যু চলিয়া গিয়াছে। সে বিকশিত প্রাণ ম্লান হইয়া পড়িয়াছে; তাহার চারিপার্শ্বে আজ রোগ শোক জরা, অন্ধকার পিশাচের রুধিরোন্মত্ত চীৎকার, বেদনা-কাতর মুমূর্ষুর হাহাকার বিলাপ। নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, দুর্ব্বলের বল, শান্তিনিকেতন মাতৃক্রোড়ে অরণ্যের পশু ঘর বাঁধিয়াছে; রৌদ্রপীড়িত ক্ষুধাকাতর সন্তানেরা প্রবৃত্তির ছলনায় পরস্পরকে বঞ্চিত করিয়া অসীম সুখলাভ করিতেছে—দরিদ্রা মায়ের কথা হৃদয়ে আর ঠাঁই পায় না। আজি একবার আত্মবিচ্ছেদ ভুলিয়া, উচ্চনীচ অহঙ্কার অভিমান ভুলিয়া, এক হৃদয়ে যদি আমরা মায়ের পূজা করিতে পারি, কাল প্রভাত-কিরণে হাসিমুখে অন্নপূর্ণা অন্ন

ঢালিয়া দিবেন—ক্ষুধার যন্ত্রণা আর সহিতে হইবে না। জননী জন্মভূমির শুষ্ক হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে; সে হৃদয়োচ্ছ্বাসে যে অমৃত ঝরিবে, পান করিয়া তাহা কেহ নিঃশেষ করিতে পারিবে না। এ রক্তের নদী বহিবে না, এ কঙ্কালের স্তূপ জমিবে না; হিমাচল-নিঃসৃতা শান্তিবারি পান করিয়া পৃথিবী শীতল হইবে।

আমাদের জন্ম দিয়া পুণ্যভূমি চির-দুঃখিনী। ভিখারীর মত আমরা পদে পদে পরের দুয়ারে মান ভিক্ষা করিতে যাই—স্বজাতিকে পদ-দলিত করিয়া, সহোদরের মস্তক অবনত করিয়া, মাতার নাম কলঙ্কিত করিয়া, আমরা মনে করি মান বাড়িল। পরে দেখিয়া হাসে, আমরা ভাবে গদ্‌গদ হই। দরিদ্রা জননীর কাছে শতবার প্রার্থনা করিয়া বিফল হইলে অপমান নাই, কিন্তু পরের নিকট ভিক্ষা পূর্ণ হইলেও অপমান ঘুচে না। সেখানে স্নেহের বন্ধন নাই, প্রেমের টান নাই, আদুরে ছেলের মত কথায় কথায় আবদার করিতে গেলে শুনিবে কে? দুই একবার ভিক্ষা মিলিবে, তাহার পর উপহাস-বিদ্রূপ, অবশেষে সম্মার্জ্জনী। ভিক্ষা জীবনের মূলভিত্তি হইয়া উঠিলে এ জীর্ণ কঙ্কাল প্রতিদিন শীর্ণ হইবে বৈ উন্নতি করিবে না। ক্ষণিক সুখমোহে জীবনের উন্নতিস্রোত রুদ্ধ হইয়া যাইবে। ক্রন্দন থামিয়া আসিবে, কিন্তু হাসি ফুটিবে না—বাক্য শুদ্ধ হইবে, কিন্তু নয়নে আনন্দজ্যোতি প্রকাশ পাইবে না—ধীরে ধীরে অবসান ঘনাইয়া আসিবে। এ ভারতভূমিতে তাহা হইলে চিতা আর নিভিবে না; চারিদিকে শ্মশান শবদাহ, শৃগাল-কুকুরের যুদ্ধ, শকুনি-গৃধিনীর পাল বিরাজ করিবে।

অভাগিনীর কপালে কি আছে কে জানে? যেখানে মাতার শীর্ণ দেহ, ম্লান মুখ দেখিয়া সন্তানের হৃদয়ে শোক উথলে না, অত্যাচার

প্রপীড়িত ভ্রাতার কাতর ক্রন্দনে হাই উঠিয়া থাকে, পরের মনস্তুষ্টি-সাধনের জন্য সন্তানেরা পরস্পরের বিপক্ষে দাঁড়াইতে সম্মত হয়, সেখানে মঙ্গলের আশা কোথায়? মাতার দারিদ্র্য দেখিয়া যেখানে সন্তান আপনাকে ধনী মানী বিবেচনা করিতে পারে, যেখানে তুচ্ছ স্বার্থের জন্য দুই বেলা মিথ্যা সম্মানিত হয়, সামান্য পৃষ্ঠ-থাবড়ানিতে সমস্ত অপমান-জ্বালা ঘুচিয়া যায়, সেখানে মঙ্গল আসিতে চায় না। জন্মভূমি জননীর সম্মানেই আমাদের সম্মান, জন্মভূমির শ্রীবৃদ্ধিতেই আমাদের শ্রীবৃদ্ধি। আমরা যখন জননীকে ভক্তি করিতে শিখিব, অপরে তখন তাঁহাকে তাচ্ছিল্য করিতে সাহস করিবে না। সেদিন প্রভাতে জগৎ স্তম্ভিত হইয়া শুনিবে, ভারতবর্ষের বুকের মধ্য হইতে একস্বরে মায়ের নাম উঠিতেছে—সন্তানেরা মা বৈ আর জানে না, মায়ের নামে সকলই এক। সেদিন কলহ বিবাদ থাকিবে না, সমস্ত পৃথিবীকে আমরা ভায়ের মত আলিঙ্গন করিতে পারিব—পৃথিবী আমাদের নিকট সরিয়া আসিবে।

আজ একবার মায়ের মুখের পানে চাহিয়া দেখ, আপনাদের দারিদ্র্য হৃদয়ঙ্গম হইবে। মায়ের করুণ আঁখির পানে একবার চাহিয়া দেখ, হৃদয় পুলকে পূরিয়া উঠিবে। ঐ স্নেহ-মধুর অধরে আজ কেন বিষাদের রেখা ফুটিয়াছে?—ঐ পবিত্র সৌন্দর্য্যে শোকের ছায়া পড়িয়াছে? সে শুভ্র উষার মত কান্তি ম্লান, সে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীমূর্ত্তি বিষণ্ণা। অন্নপূর্ণার অন্ন সন্তানেরা আর দেখিতে পায় না। অবনতমুখে জননী সন্তানের দুর্দ্দশা দেখিয়া চোখের জল মুছিতেছেন। দুর্ব্বল সন্তানের দুর্দ্দশা দেখিয়া জননীর চোখের জল ভিন্ন দিবার আর আছে কি? সন্তানেরা আপনার মধ্যেই কলহ করিতেছে; ভাইকে বঞ্চিত করিয়া ভাই বড় হইতে চায়। ভায়ের

পথে না চলিলে এখন আর উপায় নাই—সমূলে বিনষ্ট হইতে হইবে। জন্মভূমি! ভারতের অধিষ্ঠাত্রী-দেবি ভারতি! দুর্ব্বল সন্তানের হৃদয় তোমার পবিত্র ভাবে পূর্ণ কর। সেখানে মহত্বের বীজ অর্পণ কর মা, অনেকতা একতায় পরিণত হোক্। মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে সন্তান যেন পশ্চাৎপদ না হয়।

অতীত স্মৃতির স্বপ্নে ভোর হইয়া ঘরের কোণে কানাকানি করিলে চলিবে না, মায়ের পূজা করিতে হইবে। ভীষ্মদ্রোণের নাম লইলে হইবে না, হৃদয়ের মধ্যে তাঁহাদের প্রভাব অনুভব করা চাই। ভগবানের নামে বাধাবিপত্তি কাটিয়া যাইবে। ভারতবর্ষের শূন্য মন্দিরে আমরা পুনরায় মায়ের প্রতিষ্ঠা করিব। চারিদিক্ হইতে এখানে লোকে মাতৃভক্তি শিখিতে আসিবে। এখানে আসিয়া সকলে স্বাধীনতা শিক্ষা করিবে—নরহত্যা শিখিবে না। শিখিবে, মায়ের সেবা করিতে; শিখিবে, সত্যের সম্মান রাখিতে। ভারতীর বীণাধ্বনি জগতে ব্যাপ্ত হইবে। পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের নামে শত শত উন্নত শির নত হইয়া থাকিবে। আমাদের গৃহে সেদিন মায়ের প্রতিষ্ঠা।

আদরিণী

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

[১২৭৯ সালে (১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বর্দ্ধমান জেলার ধাত্রীগ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ব্যারিষ্টারী পড়ার জন্য বিলাত যাত্রা করেন। দার্জ্জিলিং, রঙ্গপুর ও গয়াতে কয়েক বৎসর প্র্যাক্‌টিস করিয়া ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় আসিয়া 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' পত্রিকার অন্যতর সম্পাদকরূপে বাঙ্গালা ভাষার সেবায় আত্ম-নিয়োগ করেন। তাঁহার প্রণীত গল্পগুলির মধ্যে 'ষোড়শী,' 'দেশী ও বিলাতী,' 'নবকথা,' 'পত্রপুষ্প' এবং উপন্যাসের মধ্যে 'রত্নদীপ,' 'রমাসুন্দরী,' 'সিন্দুর-কৌটা' প্রভৃতি সাহিত্য-সমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। গল্প-রচনায় বঙ্গসাহিত্যে তিনি প্রভূত যশের অধিকারী হইয়াছিলেন। ১৩৩৮ সালের ২২এ চৈত্র তিনি পরলোক-গমন করিয়াছেন।]

পাড়ার নগেন ডাক্তার ও জুনিয়ার উকীল কুঞ্জবিহারী বাবু বিকালে পান চিবাইতে চিবাইতে, হাতের ছড়ি দুলাইতে দুলাইতে জয়রাম মোক্তারের নিকট আসিয়া বলিলেন,—"মুখুয্যে মশায়, পীরগঞ্জের বাবুদের বাড়ী থেকে আমরা নিমন্ত্রণ পেয়েছি, এই সোমবার দিন মেজ বাবুর মেয়ের বিয়ে। শুনছি নাকি ভারি ধুমধাম হবে। আপনি নিমন্ত্রণ পেয়েছেন কি ?

মোক্তার মহাশয় তাঁহার বৈঠকখানার বারান্দায় বেঞ্চিতে বসিয়া হুঁকা হাতে করিয়া তামাক খাইতেছিলেন। আগন্তুকগণের এই প্রশ্ন শুনিয়া, হুঁকাটি নামাইয়া ধরিয়া, একটু উত্তেজিত স্বরে

বলিলেন, "কি রকম? আমি নিমন্ত্রণ পাব না কি রকম? জান, আমি আজ বিশ বচ্ছর ধ'রে তাদের এষ্টেটের বাঁধা মোক্তার?—আমাকে বাদ দিয়ে তারা তোমাদের নিমন্ত্রণ করবে, এইটে কি সম্ভব মনে কর?"

জয়রাম মুখোপাধ্যায়কে ইহারা বেশ চিনিতেন—সকলেই চিনে। অতি অল্প কারণে তাঁহার তীব্র অভিমান উপস্থিত হয়—অথচ হৃদয়খানি স্নেহে বন্ধুবাৎসল্যে কুসুমের মত কোমল; ইহা, যে তাঁহার সঙ্গে কিছু দিনও ব্যবহার করিয়াছে, সে-ই জানিয়াছে। উকীল বাবু তাড়াতাড়ি বলিলেন,—"না—না—সে কথা নয়—সে কথা নয়। আপনি রাগ করলেন মুখুয্যে মশায়? আমরা কি সে ভাবে বলছি?—জেলার মধ্যে এমন কে বিষয়ী লোক আছে, যে আপনার কাছে উপকৃত নয়—আপনার খাতির না করে? আমাদের জিজ্ঞাসা করবার তাৎপর্য্য এই ছিল যে, আপনি সে দিন পীরগঞ্জ যাবেন কি?"

মুখোপাধ্যায় নরম হইলেন, বলিলেন,—"ভায়ারা ব'স।"—বলিয়া সম্মুখস্থ আর একখানি বেঞ্চ দেখাইয়া দিলেন।—উভয়ে উপবেশন করিলে বলিলেন,—"পীরগঞ্জে গিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করা আমার পক্ষে একটু কঠিন বটে। সোম মঙ্গল দুটো দিন কাছারী কামাই হয়। অথচ না গেলে তারা ভারি মনে দুঃখিত হবে। তোমরা যাচ্ছ?"

নগেন্দ্র বাবু বলিলেন,—"যাবার ত খুবই ইচ্ছে—কিন্তু অতদূর যাওয়া ত সোজা নয়। ঘোড়ার গাড়ীর পথ নেই। গোরুর গাড়ী ক'রে যেতে হ'লে যেতে দু'দিন, আসতে দু'দিন। পাল্কী ক'রে যাওয়া—সে-ও যোগাড় হওয়া মুস্কিল। আমরা দু'জনে তাই পরামর্শ

করলাম, যাই, মুখুয্যে মহাশয়কে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি, তিনি যদি যান, নিশ্চয়ই রাজবাড়ী থেকে একটা হাতীটাতী আনিয়ে নেবেন এখন, আমরা দু'জনেও তাঁর সঙ্গে সেই হাতীতে দিব্যি আরামে যেতে পারব।”

মোক্তার মহাশয় স্মিতমুখে বলিলেন,—“এই কথা? তার জন্যে আর ভাবনা কি ভাই?—মহারাজ নরেশচন্দ্র ত আমার আজকের মক্কেল নয়—ওঁর বাপের আমল থেকে আমি ওঁদের মোক্তার। আমি কাল সকালেই রাজবাড়ীতে চিঠি লিখে পাঠাচ্ছি—সন্ধ্যে নাগাদ হাতী এসে যাবে এখন।”

পরদিন রবিবার। এ দিন প্রভাতে আহ্নিক পূজাটা মুখুয্যে মহাশয় একটু ঘটা করিয়াই করিতেন। বেলা ৯টার সময় পূজা সমাপন করিয়া, জলযোগান্তে বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন। অনেকগুলি মক্কেল উপস্থিত ছিল, তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। হঠাৎ সেই হাতীর কথা মনে পড়িয়া গেল। তখন কাগজ-কলম লইয়া, চশমাটি পরিয়া, “প্রবল প্রতাপান্বিত শ্রীল শ্রীমন্মহারাজ শ্রীনরেশচন্দ্র রায়চৌধুরী বাহাদুর আশ্রিতজন-প্রতিপালকেষু” পাঠ লিখিয়া, দুই তিন দিনের জন্য একটি সুশীল ও সুবোধ হস্তী প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিলেন। পূর্ব্বেও আবশ্যক হইলে তিনি কতবার এইরূপে মহারাজের হস্তী আনাইয়া লইয়াছেন। একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া পত্রখানি লইয়া যাইতে আজ্ঞা দিয়া, মোক্তার মহাশয় আবার মক্কেলগণের সহিত কথোপ-কথনে প্রবৃত্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত জয়রাম মুখোপাধ্যায়ের বয়স্ এখন পঞ্চাশৎ পার হইয়াছে। ইঁহার হৃদয়খানি অত্যন্ত কোমল ও স্নেহপ্রবণ হইলেও,

মেজাজটা কিছু রুক্ষ। যৌবনকালে ইনি রীতিমত বদরাগী ছিলেন —এখন রক্ত অনেকটা ঠাণ্ডা হইয়া আসিয়াছে। মুখোপাধ্যায় যেমন অনেক টাকা উপার্জ্জন করিতেন, তেমনি তাঁহার ব্যয়ও যথেষ্ট ছিল। তিনি অকাতরে অন্নদান করিতেন। অত্যাচারিত, উৎপীড়িত, গরীবলোকের মোকর্দ্দমা তিনি কত সময় বিনা 'ফিস্'-এ, এমন কি, নিজে অর্থব্যয় পর্য্যন্ত করিয়া চালাইয়া দিয়াছেন।

প্রতি রবিবার অপরাহ্ণকালে পাড়ার যুবক-বৃদ্ধগণ মোক্তার মহাশয়ের বৈঠকখানায় সমবেত হইয়া থাকেন। অদ্যও সেইরূপ অনেকে আগমন করিয়াছে—পূর্ব্বোক্ত ডাক্তারবাবু ও উকিলবাবুও আছেন। হাতীকে বাঁধিবার জন্য বাগানে খানিকটা স্থান পরিষ্কৃত করা হইতেছে, হাতী রাত্রে খাইবে বলিয়া বড় বড় পাতাশুদ্ধ কয়েকটা কলাগাছ ও অন্যান্য বৃক্ষের ডাল কাটাইয়া রাখা হইতেছে—মোক্তার মহাশয় সেই সমস্ত তদারক করিতেছেন।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে সেই পত্রবাহক ভৃত্য ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "হাতী পাওয়া গেল না।" কুঞ্জবাবু নিরাশ হইয়া উঠিলেন, "অ্যাঁ!—পাওয়া গেল না?"

নগেন্দ্রবাবু বলিলেন—"তাই ত! সব মাটী!"

মোক্তার মহাশয় বলিলেন—"কেন রে, হাতী পাওয়া গেল না কেন? চিঠির জবাব এনেছিস্?"

ভৃত্য বলিল, "আজ্ঞে না। দেওয়ানজীকে গিয়ে চিঠি দিলাম। তিনি চিঠি নিয়ে মহারাজের কাছে গেলেন। খানিক বাদে ফিরে এসে বল্লেন, বিয়ের নেমন্তন্ন হয়েছে, তার জন্য হাতী কেন? গোরুর গাড়ীতে যেতে বোলো।"

এই কথা শুনিবামাত্র জয়রাম ক্ষোভে, লজ্জায়, রোষে যেন

একবারে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। তাঁহার হাত-পা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। দুই চক্ষু দিয়া রক্ত ছুটিয়া পড়িতে লাগিল। মুখমণ্ডলের শিরা উপশিরাগুলি স্ফীত হইয়া উঠিল। কম্পিতস্বরে ঘাড় বাঁকাইয়া বারংবার বলিতে লাগিলেন, "হাতী দিলে না! হাতী দিলে না।"

সমবেত ভদ্রলোকগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন, "তার আর কি করবেন মুখুয্যে-মশায়। পরের জিনিস, জোর ত নেই। একখানা ভাল দেখে গোরুর গাড়ী ভাড়া ক'রে নিয়ে, রাত্রি দশটা এগারটার সময় বেরিয়ে পড়ুন, ঠিক সময় পৌঁছে যাবেন।

জয়রাম বক্তার দিকে দৃষ্টিমাত্র না করিয়া বলিলেন, "না। গোরুর গাড়ীতে চড়ে আমি যাব না। যদি হাতী চ'ড়ে যেতে পারি, তবেই যাব, নৈলে এ বিবাহে আমার যাওয়াই হবে না।"

সহর হইতে দুই তিন ক্রোশের মধ্যে দুই তিন জন জমিদারের হস্তী ছিল। সেই রাত্রেই জয়রাম তত্তৎ স্থানে লোক পাঠাইয়া দিলেন, যদি কেহ হস্তী বিক্রয় করে, তবে কিনিবেন। রাত্রি দুই প্রহরের সময় একজন ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "বীরপুরের উমাচরণ লাহিড়ীর একটি মাদী হাতী আছে,—এখনও বাচ্ছা। বিক্রয় করবে কিন্তু বিস্তর দাম চায়।"

"কত?"

"দু' হাজার টাকা।"

"খুব বাচ্ছা?"

"না, সওয়ারি দিতে পারবে।"

"কুচ পরওয়া নেই। তাই কিনব। এখনই তুমি যাও। কাল সকালেই যেন হাতী আসে। লাহিড়ী-মশায়কে আমার

নমস্কার জানিয়ে বোলো, হাতীর সঙ্গে যেন কোন বিশ্বাসী কর্ম্মচারী পাঠিয়ে দেন, হাতী দিয়ে টাকা নিয়ে যাবে।”

পরদিন বেলা সাতটার সময় হস্তিনী আসিল। তাহার নাম—আদরিণী। লাহিড়ী মহাশয়ের কর্ম্মচারী রীতিমত ষ্ট্যাম্প-কাগজে রসিদ লিখিয়া দিয়া দুই হাজার টাকা লইয়া প্রস্থান করিল।

বাড়ীতে হাতী আসিবামাত্র পাড়ার তাবৎ বালক-বালিকা আসিয়া বৈঠকখানার উঠানে ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। দুই এক জন অশিষ্ট বালক সুর করিয়া বলিতে লাগিল—“হাতী, তোর গোদা পায়ে নাতি।” বাড়ীর বালকেরা ইহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং অপমান করিয়া তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দিল।

হস্তিনী গিয়া অন্তঃপুরদ্বারের নিকট দাঁড়াইল। মুখুয্যে মহাশয় বিপত্নীক—তাঁহার জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ একটি ঘটিতে জল লইয়া সভয়-পদক্ষেপে বাহির হইয়া আসিলেন। কম্পিতহস্তে তাহার পদচতুষ্টয়ে সেই জল একটু একটু ঢালিয়া দিলেন। মাহুতের ইঙ্গিতানুসারে আদরিণী তখন জানু পাতিয়া বসিল। বড়বধূ তৈল ও সিন্দুরে তাহার ললাট রঞ্জিত করিয়া দিলেন। ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল। আবার দাঁড়াইয়া উঠিলে, একটা ধামায় করিয়া আলো-চাল, কলা ও অন্যান্য মাঙ্গল্যদ্রব্য তাহার সম্মুখে রক্ষিত হইল—শুঁড় দিয়া তুলিয়া তুলিয়া কতক সে খাইল, অধিকাংশ ছিটাইয়া দিল। এইরূপে বরণ সম্পন্ন হইলে রাজহস্তীর জন্য সংগৃহীত সেই কদলীকাণ্ড ও বৃক্ষশাখা আদরিণী ভোজন করিতে লাগিল।

নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া পৌরগঞ্জ হইতে ফিরিবার পরদিন বিকালেই মহারাজ নরেশচন্দ্রের সহিত মুখোপাধ্যায় মহাশয় সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। বলা বাহুল্য, হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াই গেলেন।

মহারাজের দ্বিতল বৈঠকখানার নিম্নে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের অপর প্রান্তে প্রবেশের সিংহদ্বার। বৈঠকখানায় বসিয়া সমস্ত প্রাঙ্গণ ও সিংহদ্বারের বাহিরের অনেক দূর অবধি মহারাজের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

রাজসমীপে উপস্থিত হইলে মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। মোকদ্দমা ও বিষয়-সংক্রান্ত দুইচারি কথার পর মহারাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মুখুজ্যে মহাশয়, এ হাতীটি কার?"

মুখুজ্যে মহাশয় বিনীতভাবে বলিলেন, "আজ্ঞে, হুজুর বাহাদুরেরই হাতী।"

মহারাজ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "আমার হাতী! কৈ, ও হাতী ত কোনও দিন আমি দেখিনি। কোথা থেকে এল?"

"আজ্ঞে, বীরপুরের উমাচরণ লাহিড়ীর কাছ থেকে কিনেছি।"

অধিকতর বিস্মিত হইয়া রাজা বলিলেন,—"আপনি কিনেছেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তবে বল্লেন, আমার হাতী?"

বিনয় কিংবা স্নেহসূচক—ঠিক বোঝা গেল না—একটু মৃদু হাস্য করিয়া জয়রাম বলিলেন—"যখন হুজুর বাহাদুরের দ্বারাই প্রতিপালন হচ্ছি, আমিই যখন আপনার—তখন ও হাতী আপনার বৈ আর কার?"

সন্ধ্যার পর গৃহে ফিরিয়া, বৈঠকখানায় বসিয়া সমবেত বন্ধুমণ্ডলীর নিকট মুখোপাধ্যায় এই কাহিনী সবিস্তারে বিবৃত করিলেন। হৃদয় হইতে সমস্ত ক্ষোভ ও লজ্জা আজ তাঁহার মুছিয়া গেল। কয়েক দিন পরে আজ তাঁহার সুনিদ্রা হইল।

উল্লিখিত ঘটনার পর সুদীর্ঘ পাঁচটি বৎসর অতীত হইয়াছে। এই পাঁচ বৎসরে মোক্তার মহাশয়ের অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তিনি এখন আর কাছারী যান না। ব্যবসায় ছাড়িয়া কায়ক্লেশে মুখোপাধ্যায়ের সংসার চলিতে লাগিল। ব্যয় যে পরিমাণে সঙ্কোচ করিবেন ভাবিয়াছিলেন, তাহা শত চেষ্টাতেও হইয়া উঠে না। সুদে সঙ্কুলান হয় না, মূলধনে হাত পড়িতে লাগিল। কোম্পানীর কাগজের সংখ্যা কমিতে লাগিল।

এক দিন প্রভাতে মোক্তার মহাশয় বৈঠকখানায় বসিয়া নিজের অবস্থার বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় মাহুত আদরিণীকে লইয়া নদীতে স্নান করাইতে গেল। অনেক দিন হইতেই লোকে ইহাকে বলিতেছিল "হাতীটি আর কেন, ওকে বিক্রী ক'রে ফেলুন। মাসে ত্রিশ চল্লিশ টাকা বেঁচে যাবে।" কিন্তু মুখুয্যে মহাশয় উত্তর করিয়া থাকেন, "তার চেয়ে বল না, তোমার এই ছেলে পিলে নাতিপুতিদের খাওয়াতে অনেক টাকা ব্যয় হয়ে যাচ্ছে—ওদের একে একে বিক্রী ক'রে ফেল।"—এরূপ উক্তির পর আর কথা চলে না।

হাতীটিকে দেখিয়া মুখোপাধ্যায়ের মনে হইল, ইহাকে যদি মধ্যে মধ্যে ভাড়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ত কিঞ্চিৎ অর্থাগম

হইতে পারে। তখনই কাগজ কলম লইয়া নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি মুসাবিদা করিলেন :—

হস্তী ভাড়ার বিজ্ঞাপন

বিবাহের শোভাযাত্রা, দূরদূরান্তে গমনাগমন প্রভৃতি কার্য্যের জন্য নিম্ন স্বাক্ষরকারীর আদরিণী নাম্নী হস্তিনী ভাড়া দেওয়া হইবে। ভাড়া প্রতি রোজ ৩৲ মাত্র, হস্তিনীর খোরাকী ১৲ এবং মাহুতের খোরাকী ৷৷০, একুনে ৪৷৷০ ধার্য্য হইয়াছে। যাঁহার আবশ্যক হইবে, নিম্ন ঠিকানায় তত্ত্ব লইবেন।

শ্রীজয়রাম মুখোপাধ্যায় (মোক্তার)
চৌধুরীপাড়া।

এই বিজ্ঞাপনটি ছাপাইয়া, সহরের প্রত্যেক ল্যাম্পপোষ্টে পথিপার্শ্বস্থ বৃক্ষকাণ্ডে এবং অন্যান্য প্রকাশ্য স্থানে আঁটিয়া দেওয়া হইল। বিজ্ঞাপনের ফলে, মাঝে মাঝে লোকে হস্তী ভাড়া লইতে লাগিল বটে, কিন্তু তাহাতে ১৫।২০ টাকার বেশী আয় হইল না।

মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পৌত্রটি পীড়িত হইয়া পড়িল। তাহার জন্য ডাক্তার-খরচ, ঔষধ-পথ্যাদির খরচ প্রতিদিন ৫৲।৭৲ টাকার কমে নির্ব্বাহ হয় না। মাসখানেক পরে বালকটি কথঞ্চিৎ আরোগ্য লাভ করিল। এদিকে জ্যেষ্ঠা পৌত্রী কল্যাণী দ্বাদশবর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। দেখিতে দেখিতে যেরূপ ডাগর হইয়া উঠিতেছে, শীঘ্রই তাহার বিবাহ না দিলে নয়। যত দায় এই ষাট বৎসরের বুড়ারই ঘাড়ে। অবশেষে এক স্থানে বিবাহ স্থির হইল। আড়াই হাজার টাকা হইলেই বিবাহটি হয়। কোম্পানীর কাগজের বাণ্ডিল দিন দিন ক্ষীণ হইতেছে— তাহা হইতে আড়াই হাজার বাহির করা বড়ই কষ্টকর হইয়া

দাঁড়াইল। আর, শুধু ত একটি নহে—আরও নাতিনীরা রহিয়াছে। তাহাদের বেলায় কি উপায় হইবে? এই সকল ভাবনা-চিন্তার মধ্যে পড়িয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের শরীর ক্রমে ভগ্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। এক দিন সংবাদ আসিল, কনিষ্ঠ পুত্রটি বি.এ. পরীক্ষা দিয়াছিল, সে-ও ফেল হইয়াছে।

চৈত্র সংক্রান্তিতে বামুন-হাটে একটি বড় মেলা হয়। সেখানে বিস্তর গোরু, বাছুর, ঘোড়া, হাতী, উট বিক্রয়ার্থ আসে। বন্ধুগণ বলিলেন, "হাতীটিকে মেলায় পাঠিয়ে দিন, বিক্রী হয়ে যাবে এখন। দু'হাজারে কিনেছিলেন, এখন হাতী বড় হয়েছে—তিন হাজার টাকা অনায়াসে পেতে পারবেন।"

কোঁচার খুঁটে চক্ষু মুছিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "কি করে তোমরা এমন কথা বল্‌ছ?"

বন্ধুরা বুঝাইলেন—"আপনি বলেন, ও আমার মেয়ের মত। তা মেয়েকেই কি চিরদিন ঘরে রাখা যায়? মেয়ের বিয়ে দিতে হয়, মেয়ে শ্বশুরবাড়ী চ'লে যায়, তার আর উপায় কি? তবে পোষা জানোয়ার, অনেক দিন ঘরে রয়েছে, মায়া হয়ে গেছে, একটু দেখে শুনে কোনও ভাল লোকের হাতে বিক্রী করলেই হয়। যে বেশ আদর যত্নে রাখবে, কোনও কষ্ট দেবে না—এমন লোককে বিক্রী করবেন।"

ভাবিয়া চিন্তিয়া জয়রাম বলিলেন, "তোমরা সবাই যখন বলছ, তখন তাই হোক। দাও, মেলায় পাঠিয়ে দাও। একজন ভাল খদ্দের ঠিক কর—তাতে দামে যদি দু-পাঁচশো টাকা কমও হয়, সেও স্বীকার।"

মেলাটি চৈত্র-সংক্রান্তির প্রায় পনের দিন পূর্ব্বে আরম্ভ হয়।

তবে শেষের চারি পাঁচ দিনই জমজমাট বেশী। সংক্রান্তির এক সপ্তাহ পূর্ব্বে যাত্রা স্থির হইয়াছে। মাহুত ত যাইবেই—মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মধ্যম পুত্রটিও সঙ্গে যাইবে।

যাত্রার দিন অতি প্রত্যুষে মুখোপাধ্যায় গাত্রোত্থান করিলেন। যাইবার পূর্ব্বে হস্তিনী ভোজন করিতেছে। বাটীর মেয়েরা বালক-বালিকাগণ সজল-নেত্রে বাগানে হাতীর কাছে দাঁড়াইল। খড়ম পায়ে দিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও সেখানে গিয়া দাঁড়াইলেন। পূর্ব্বদিন দুই টাকার রসগোল্লা আনাইয়া রাখিয়াছিলেন, ভৃত্য সেই হাঁড়ী হাতে করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। ডালপালা প্রভৃতি মামুলি খাদ্য শেষ হইলে, মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বহস্তে মুঠা মুঠা করিয়া সেই রসগোল্লা হস্তিনীকে খাওয়াইলেন। শেষে তাহার গলার নিম্নে হাত বুলাইতে বুলাইতে ভগ্নকণ্ঠে বলিলেন, "আদর, যাও মা, বামুন-হাটের মেলা দেখে এস।" প্রাণ ধরিয়া বিদায়বাণী উচ্চারণ করিতে পারিলেন না। উদ্বেলদুঃখে এই ছলনাটুকুর আশ্রয় লইলেন।

হাতী চলিয়া গেল। মুখোপাধ্যায় মহাশয় শূন্যমনে বৈঠক-খানার ফরাস-বিছানার উপর গিয়া লুটাইয়া পড়িলেন। অনেক বেলা হইলে, অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া বধূরা তাঁহাকে স্নান করাইলেন—স্নানান্তে আহারে বসিলেন বটে, কিন্তু পাতের অন্ন-ব্যঞ্জন অধিকাংশই অভুক্ত পড়িয়া রহিল।

কল্যাণীর বিবাহের সমস্ত কথাবার্ত্তা পাকা হইয়া গিয়াছে। ১০ই জ্যৈষ্ঠ শুভ কার্য্যের দিন স্থির হইয়াছে। বৈশাখ পড়িলেই উভয়পক্ষের আশীর্ব্বাদ হইবে। হস্তী-বিক্রয়ের টাকাটা আসিলেই গহনা গড়াইতে দেওয়া হয়। কিন্তু ১লা বৈশাখ সন্ধ্যাবেলা মস্ মস্

করিয়া আদরিণী ঘরে ফিরিয়া আসিল। বিক্রয় হয় নাই—উপযুক্ত মূল্য দিবার খরিদ্দার জোটে নাই।

আদরিণীকে ফিরিতে দেখিয়া বাড়ীতে আনন্দ কোলাহল পড়িয়া গেল। বিক্রয় হয় নাই বলিয়া কাহারও কোনও খেদের চিহ্ন সে সময় দেখা গেল না। যেন হারাধন ফিরিয়া পাওয়া গিয়াছে—সকলের আচরণে এইরূপই মনে হইতে লাগিল। আনন্দের প্রথম উচ্ছ্বাস অপনীত হইলে, পরদিন সকলের মনে হইল—কল্যাণীর বিবাহের এখন কি উপায় হইবে?

প্রতিবেশী বন্ধুগণ আবার বৈঠকখানায় সমবেত হইলেন। অতবড় মেলায় এমন ভাল হাতীর খরিদ্দার কেন জুটিল না, তাহা লইয়া আলোচনা হইতে লাগিল। বামুন-হাটের মেলা ভাঙ্গিয়া সেখান হইতে আরও দশ ক্রোশ উত্তরে রসুলগঞ্জে সপ্তাহব্যাপী আর এক মেলা হয়। যে সকল গো-মহিষাদি বামুন-হাটে বিক্রয় হয় নাই—সে সব রসুলগঞ্জে গিয়া জমে। সেই খানেই আদরিণীকে পাঠাইবার পরামর্শ হইল।

আজ আবার আদরিণী মেলায় যাইবে। আজ আর বৃদ্ধ তাহার কাছে গিয়া বিদায়-সম্ভাষণ করিতে পারিলেন না। রীতিমত আহারাদির পর আদরিণী বাহির হইয়া গেল। কল্যাণী আসিয়া বলিল, "দাদামশায়, আদর যাবার সময় কাঁদছিল।"

মুখোপাধ্যায় শুইয়া ছিলেন, উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন, "কি বল্লি? কাঁদছিল?"

"হ্যাঁ, দাদামশায়। যাবার সময় চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ ক'রে জল পড়তে লাগল।"

বৃদ্ধ আবার ভূমিতে পড়িয়া দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত বলিতে

লাগিলেন, "জানতে পেরেছে। ওরা অন্তর্য্যামী কি না। এ বাড়ীতে যে আর ফিরে আসবে না, তা জানতে পেরেছে।"

নাতিনী চলিয়া গেলে বৃদ্ধ সাশ্রুনয়নে আপন মনে বলিতে লাগিলেন, "যাবার সময় আমি তোর সঙ্গে দেখাও করলাম না—সে কি তোকে অনাদর ক'রে? না, না, তা নয়। তুই ত অন্তর্য্যামী—তুই কি আমার মনের কথা বুঝতে পারিস নি?—খুকীর বিয়েটা হয়ে যাক। তারপর তুই যার ঘরে যাবি, তাদের বাড়ী গিয়ে আমি তোকে দেখে আসব। তোর জন্যে সন্দেশ নিয়ে যাব, রসগোল্লা নিয়ে যাব, যতদিন বেঁচে থাকব, তোকে কি ভুলতে পারব? মাঝে মাঝে গিয়ে তোকে দেখে আসব। তুই মনে কোনও অভিমান করিসনে মা।"

পরদিন বিকালে একটি চাষী লোক একখানি পত্র আনিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হাতে দিল। পত্র পাঠ করিয়া ব্রাহ্মণের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। মধ্যম পুত্র লিখিয়াছে, "বাটী হইতে সাত ক্রোশ দূরে আসিয়া কল্য বিকালে আদরিণী অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়ে। সে আর পথ চলিতে পারে না। রাস্তার পার্শ্বে একটা আমবাগানে শুইয়া পড়িয়াছে। তাহার পেটে বোধ হয় কোনও বেদনা হইয়াছে—শুড়টি উঠাইয়া মাঝে মাঝে কাতরস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিতেছে। মাহুত যথাবিদ্যা সমস্ত রাত্রি তাহার চিকিৎসা করিয়াছে—কিন্তু কোনও ফল হয় নাই—বোধ হয় আদরিণী আর বাঁচিবে না। যদি মরিয়া যায়, তবে তাহার শব-দেহ প্রোথিত করিবার জন্য নিকটেই একটু জমী বন্দোবস্ত লইতে হইবে। সুতরাং কর্ত্তা মহাশয়ের অবিলম্বে আসা আবশ্যক।"

বাড়ীর মধ্যে গিয়া উঠানে পাগলের মত পায়চারি করিতে করিতে বৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন, "আমার গাড়ীর বন্দোবস্ত করে দাও। আমি এখনি বেরুব। আদরের অসুখ—যাতনায় সে ছট্‌ফট করছে। আমাকে না দেখতে পেলে সে সুস্থ হবে না। আমি আর দেরী করতে পারব না।"—তখনই ঘোড়ার গাড়ীর বন্দোবস্ত করিতে লোক ছুটিল। বধূরা অনেক কষ্টে বৃদ্ধকে একটু দুগ্ধ মাত্র পান করাইতে সমর্থ হইলেন। রাত্রি দশটার সময় গাড়ী ছাড়িল। জ্যেষ্ঠ পুত্রও সঙ্গে গেলেন। পত্র-বাহক সেই চাষী লোকটি কোচবাক্সে বসিল।

পরদিন প্রভাতে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়া বৃদ্ধ দেখিলেন, সমস্ত শেষ হইয়া গিয়াছে। আদরিণীর সেই নবজলধরবর্ণ বিশাল দেহ-খানি আম্রবনের ভিতরে পতিত রহিয়াছে—তাহা আজ নিশ্চল—নিস্পন্দ! বৃদ্ধ ছুটিয়া গিয়া হস্তিনীর শব-দেহের নিকট লুটাইয়া পড়িয়া তাহার মুখের নিকট মুখ রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বারংবার বলিতে লাগিলেন, "অভিমান ক'রে চ'লে গেলি মা? তোকে বিক্রী করতে পাঠিয়েছিলাম ব'লে—তুই অভিমান ক'রে চ'লে গেলি?"

ইহার পর দুইটি মাস মাত্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় জীবিত ছিলেন।

মাষ্টার মহাশয়

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

১

কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে, বর্দ্ধমান সহর হইতে যোল ক্রোশ দূরে, দামোদর নদের অপর পারে, নন্দীপুর ও গোঁসাইগঞ্জ নামক পাশাপাশি দুইটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল; এবং উভয় গ্রামের সীমারেখার উপর একটি প্রাচীন সুবৃহৎ বটবৃক্ষ দণ্ডায়মান ছিল। এখন সে গ্রাম দু'খানিও নাই, বটবৃক্ষটিও অদৃশ্য—দামোদরের বন্যা সে সমস্ত ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে।

ফাল্গুন মাস; এক প্রহর বেলা হইয়াছে। গোঁসাইগঞ্জের মাতব্বর প্রজা এবং গ্রামের অভিভাবক-স্থানীয় কায়স্থ-সন্তান শ্রীযুক্ত হীরালাল দাস দত্ত মহাশয় হুকা হাতে করিয়া ধূমপান করিতেছিলেন। প্রতিবেশী শ্যামাপদ মুখুয্যে ও কেনারাম মল্লিক (ইহারাও বড় প্রজা) নিকটে বসিয়া, এ বৎসর চৈত্র মাসে বারোয়ারী অন্নপূর্ণা-পূজা কিরূপভাবে নির্ব্বাহ করিতে হইবে, তাহারই পরামর্শ করিতেছিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী নন্দীগ্রামেও প্রতিবৎসর চাঁদা করিয়া ধূমধামের সহিত অন্নপূর্ণা-পূজা হইয়া থাকে। গোঁসাইগঞ্জবাসিগণের একবাক্যে ইহাই মত যে, তিন পুরুষ ধরিয়া গোঁসাইগঞ্জ কোনও বিষয়েই নন্দীপুরের নিকটে হটে নাই—এবং আজিও হটিবে না।

আগামী বারোয়ারী পূজা সম্বন্ধে যখন গ্রামস্থ তিন জন প্রধান ব্যক্তির মধ্যে গভীর ও গূঢ় আলোচনা চলিতেছিল সেই সময় রামচরণ মণ্ডল হাঁপাইতে হাঁপাইতে সেইখানে আসিয়া পৌঁছিল

এবং হাতের লাঠিটা আছড়াইয়া ফেলিয়া ধপাস্ করিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল। তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া হীরু দত্ত সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হে মোড়লের পো, অমন করে' বসে' পড়লে কেন? কি হয়েছে?"

রামচরণ দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "কি হয়েছে, জিজ্ঞাসা করছেন দত্তজা, কি হ'তে আর বাকী আছে? হায় হায় হায়!—কার্ত্তিক মাসে যখন আমার জ্বরবিকার হয়েছিল, তখনই আমি গেলাম না কেন? এই দেখবার জন্যে কি আমায় বাঁচিয়ে রেখেছিলি, হা—রে বিধেতা, তোর পোড়া কপাল।"

শ্যামাপদ ও কেনারামও ঘোর দুশ্চিন্তায় রামচরণের পানে চাহিয়া রহিলেন। দত্তজা বলিলেন, "কি হয়েছে, কি হয়েছে? সব কথা খুলে' বল। এখন আসছ কোথা থেকে?"

দীর্ঘ-নিশ্বাস-জড়িত স্বরে রামচরণ উত্তর করিল, "নন্দীপুর থেকে। হায় হায়. শেষকালে নন্দীপুরের কাছে মাথা হেঁট হয়ে গেল! হা—রে কপাল!"—বলিয়া রামচরণ সজোরে নিজ ললাটে করাঘাত করিল।

দত্তজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, কেন? নন্দীপুরওয়ালারা কি করেছে?"

"বলছি। বলবার জন্তেই এসেছি। এই রোদ্দুরে মশাই, এক কোশ পথ ছুটতে ছুটতে এসেছি। গলাটা শুকিয়ে গেছে, মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না। এক ঘটী জল—"

দত্তজার আদেশে অবিলম্বে এক ঘড়া জল এবং একটি ঘটী আসিল। রামচরণ উঠিয়া রোয়াকের প্রান্তে বসিয়া, সেই জলে মুখ হাত পা ধুইয়া ফেলিল; কিঞ্চিৎ পানও করিল তারপর

হাত মুখ মুছিতে মুছিতে নিকটে আসিয়া বসিয়া, গভীর বিষাদে মাথাটি ঝুঁকাইয়া রহিল।

হীরু দত্ত বলিলেন, "এবার বল কি হয়েছে, আর দগ্ধে' মেরো না বাপু।"

রামচরণ বলিল, "কি হয়েছে? যা হবার নয়, তাই হয়েছে। বড় বড় সহরে যা হয় না, নন্দীপুরে তাই হয়েছে। এ সব পাড়াগাঁয়ে কেউ কখনও যা স্বপ্নেও ভাবেনি, তাই হয়েছে। তারা হুস্কুল বসিয়েছে।"

তিন জনেই সমবেত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি আবার? হুস্কুল কি?"

রামচরণ বলিল, "আরে ছাই, আমিই কি জানতাম আগে হুস্কুল কার নাম? আজ না শুনলাম! ইঞ্জিরি পড়ার পাঠশালকে হুস্কুল বলে।"

দত্তজা বলিলেন, "ওঃ—ইস্কুল খুলেছে বুঝি?"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ—তাই খুলেছে। একজন ম্যাষ্টার নিয়ে এসেছে। ইঞ্জিরি পাঠশালের গুরু মহাশয়কে নাকি ম্যাষ্টার বলে। দাশু ঘোষের চণ্ডীমণ্ডপে হুস্কুল বসেছে। স্বচক্ষে দেখে এলাম, ম্যাষ্টার বসে' দশ-বার জন ছেলেকে ইঞ্জিরি পড়াচ্চে।"

হীরু দত্ত একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, গালে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাষ্টার কোথা থেকে এনেছে, তা কিছু শুনলে?"

"সব খবরই নিয়ে এসেছি। বর্দ্ধমান থেকে এনেছে। বামুণের ছেলে—হারান চক্রবর্ত্তী। পনের টাকা মাইনে, বাসা, খোরাক। সব খবরই নিয়ে এসেছি।"

বাহিরে এই সময়ে একটা কোলাহল শুনা গেল। পরক্ষণেই দেখা গেল, পিল্ পিল্ করিয়া লোক সদর দরজা দিয়া প্রবেশ করিতেছে। রামচরণ পথে আসিতে আসিতে, নন্দীপুরের হস্তে গোঁসাইগঞ্জের এই অভূতপূর্ব্ব পরাভব-সংবাদ প্রচার করিয়া আসিয়াছিল। সকলে আসিয়া চীৎকার করিয়া নানা ছন্দে বলিতে লাগিল, "এ কি সর্ব্বনাশ হ'ল। নন্দীপুরের হাতে এই অপমান। আমাদের ইস্কুল খোলবার এখন কি উপায় হ'বে?"

হীরু দত্ত সেই রোয়াকের বারান্দায় দাঁড়াইয়া উঠিয়া, হাত নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন—

"ভাই সকল! তোমরা কি মনে করেছ, তিন পুরুষ পরে আজ গোঁসাইগঞ্জ নন্দীপুরের কাছে হ'টে যাবে? কখনই না। এ দেহে প্রাণ থাকতে নয়। আমরাও ইস্কুল খুলবো। ওরা বা কি ইস্কুল খুলেছে, আমরা তার চতুর্গুণ ভাল ইস্কুল খুলবো। তোমরা শান্ত হয়ে' ঘরে যাও। আজই খাওয়া-দাওয়া করে' আমি বেরুচ্চি। কলকাতা যাবার রেল খুলেছে, আর ত কোন ভাবনা নেই। আমি কলকাতা গিয়ে ওদের চেয়েও ভাল মাষ্টার নিয়ে আসবো। ওরা ১৫৲ টাকা দিয়ে মাষ্টার এনেছে? আমরা ২৫৲ টাকা মাইনে দেবো। ওদের মাষ্টারকে পড়াতে পারে এমন মাষ্টার আমি নিয়ে আসবো। আজ থেকে এক হপ্তার মধ্যে, আমার এই চণ্ডীমণ্ডপে ইস্কুল বসাবো বসাবো বসাবো—তিন সত্য করলাম। এখন যাও, তোমরা বাড়ী যাও, স্নানাহার করগে।"

"জয় গোঁসাইগঞ্জের জয়! জয় হীরু দত্তের জয়!"—সোল্লাসে চীৎকার করিতে করিতে তখন সেই জনতা প্রস্থান করিল।

২

কলিকাতা হইতে মাষ্টার নিযুক্ত করিয়া হীরু দত্ত চতুর্থ দিবসে গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন।

মাষ্টার মহাশয়ের নাম ব্রজগোপাল মিত্র। বয়স্ ত্রিশ বৎসর, খর্ব্বাকার কৃশকায় ব্যক্তি, বড় মিষ্টভাষী। ইংরাজি বলিতে-কহিতে, লিখিতে-পড়িতে তিনি নাকি ভারি ওস্তাদ। ইংরাজিটা তাঁহার এতই বেশী অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, লোকের সঙ্গে আলাপ করিতে করিতে মাঝে মাঝে ইংরাজি কথা মিশাইয়া ফেলেন—অজ্ঞ লোকের সুবিধার্থ আবার তাহা বাঙ্গালা করিয়া বুঝাইয়াও দেন। বলেন, পূর্ব্বে পিতার জীবিতকালে, একদিন কলিকাতার গঙ্গার ধারে মাষ্টার মহাশয় নাকি বেড়াইতেছিলেন, তথায় এক সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তা হয়। সাহেব তাঁহার ইংরাজি শুনিয়া, লাট সাহেবের নিকট সে গল্প করিয়াছিলেন। লাট সাহেব মাষ্টার মহাশয়কে ডাকিয়া পাঠাইয়া, ডেপুটি কালেক্টারি পদ তাঁহাকে দিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু তখন তিনি বাপের বেটা, সংসারের চিন্তা ছিল না, সেই প্রস্তাব তিনি বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। আজ অভাবে পড়িয়া এই ২৫৲ টাকার চাকরি তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইল। পুরুষস্য ভাগ্যং।—মাষ্টার মহাশয়ের মুখে এইরূপ কথাবার্ত্তা শুনিয়া এবং তাঁহার ইংরাজিয়ানা চাল-চলন দেখিয়া গ্রামের লোক একেবারে মোহিত হইয়া গেল।

হীরু দত্তের প্রতিজ্ঞা-অনুসারে পর দিনই ইস্কুল খুলিল। পনের-ষোলটি ছাত্র লইয়া মাষ্টার মহাশয় অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন। কলিকাতা হইতে (দত্তজার ব্যয়ে) তিনি প্রচুর পরিমাণে সেলেট,

পেন্সিল ও মরে সাহেবের 'স্পেলিং বুক' পুস্তক খরিদ করিয়া আনিয়াছিলেন, ছাত্রগণের উৎসাহ-বর্দ্ধনার্থ সেগুলি তাহাদিগকে বিনামূল্যেই দেওয়া হইতে লাগিল।

গোঁসাইগঞ্জের লোকের সঙ্গে নন্দীপুরের লোকের পথে-ঘাটে দেখা হইলে, উভয় গ্রামের মাষ্টার-সম্বন্ধে আলোচনা হইত। গোঁসাইগঞ্জ বলিত—"বর্দ্ধমানের মাষ্টার, ও জানেই বা কি, আর পড়াবেই বা কি!" নন্দীপুর বলিত—"হ'লেই বা আমাদের মাষ্টারের বর্দ্ধমানে বাড়ী, তিনিও ত কলকাতাতেই লেখাপড়া শিখেছেন। ওঁরা যখন পড়তেন, তখন কি বর্দ্ধমানে ইংরিজি ইস্কুল ছিল? কলকাতায় গিয়ে ইংরিজি পড়তে হ'ত।"

যথা সময়ে উভয় গ্রামের বারোয়ারী পূজার উৎসব আরম্ভ হইল। উভয় গ্রামই উভয় গ্রামের লোকদিগকে প্রতিমা-দর্শন, প্রসাদ-ভক্ষণ, এবং যাত্রা ও ঢপ সঙ্গীত-শ্রবণের নিমন্ত্রণ করিল। এই উপলক্ষে উভয় মাষ্টারের দেখা-সাক্ষাৎ হইয়া গেল এবং সভাস্থলে প্রকাশ পাইল, উভয়ে পূর্ব্বাবধি পরিচিত।

পূজান্তে গোঁসাইগঞ্জ একটা কথা শুনিয়া বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। নন্দীপুরের মাষ্টার নাকি বলিয়াছেন—"ঐ বেজা বুঝি ওদের মাষ্টার হয়ে এসেছে, তা এদ্দিন জানতাম না! ওটা ত মহামূর্খ! ছেলেবেলায় কলকেতায় আমরা এক-কেলাসে পড়তাম কি না। আমরা যখন 'সেকেন বুক' পড়ি, সেই সময়েই ও ইস্কুল ছেড়ে দেয়। তারপর আর ত ও ইংরেজি পড়েনি। বড়বাজারে এক মহাজনের আড়তে খাতা লিখত, মাইনে ছিল সাত টাকা। গেল-বছরও ত কলকেতায় ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়; তখনও ত ঐ চাকরি করছে।"

গোঁসাইগঞ্জবাসীরা ব্রজ মাষ্টারকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি শুনছি ?"

ব্রজ মাষ্টার এ প্রশ্ন শুনিয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন ; বলিলেন, "একেই বলে কলিকাল ! সেকেন বুক পড়ার সময় আমি ইস্কুল ছেড়ে দিয়েছিলাম, না ও-ই ছেড়ে দিয়েছিল ? হ'য়েছিল কি জান না বুঝি ? মাষ্টার কেলাসে রোজ পড়া জিজ্ঞাসা করতো, ও একদিনও বলতে পারতো না। মাষ্টার একদিন ওকে একটা 'কোশ্চেন' জিজ্ঞাসা করলে, ও 'এন্সার' করতে পারলে না। আমায় জিজ্ঞাসা করতেই আমি বল্লাম। মাষ্টার আমায় বল্লে, 'দাও ওর কাণ মলে'।' আমি কাণ মলে' দিতেই ওর মুখচোখ রাগে রাঙা হয়ে গেল। ও বলতে লাগলো, 'আমি হ'লাম বামুণের ছেলে, ও কায়েত হয়ে কি না আমার কাণে হাত দেয় !' সেই অপমানে ও-ই ত ইস্কুল ছেড়ে দিলে। আমি তারপর পাঁচ-ছ বছর সেই ইস্কুলে পড়ে', একেবারে লায়েক হয়ে তবে বেরুলাম।"

অতঃপর গোঁসাইগঞ্জের লোক নন্দীপুর কর্তৃক ব্যক্ত ঐ অপবাদের প্রতিবাদ করিতে লাগিল। অবশেষে হারান মাষ্টার বলিলেন, "আমরা ইস্কুলে যে মাষ্টারের কাছে পড়তাম, তিনি আজও বেঁচে আছেন। গোঁসাইগঞ্জ থেকে তোমরা দু'জন মাতব্বর লোক আমার সঙ্গে চল তাঁর কাছে ; তাঁকে জিজ্ঞাসা করে' দেখ—কার কথা সত্যি, কার কথা মিথ্যে।"

এ কথা শুনিয়া ব্রজ মাষ্টার হা হা করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "অ্যাঁ ! এই কথা বলেছে ? ও সব ত বিলকুল 'ফল্সো'—মিথ্যে কথা। সেই মাষ্টারের কাছে নিয়ে গিয়ে ভজিয়ে দেবে ? তিনি

কি আর বেঁচে আছেন ? গেল বছরের আগের বছর, তিনি যে 'হেভেন'—স্বর্গে গেলেন। তাঁর শ্রাদ্ধে আমি 'ইন্‌ভাইট'—নেমন্তন্ন খেয়ে এসেছি, বেশ মনে আছে। আমাকে বড্ড ভালবাসতেন যে! একেবারে 'সন্ ইকোয়েল'—পুত্রতুল্য। তাঁর ছেলেরা আজও আমায় বেজো দাদা বলতে 'ইগ্‌নোরেণ্ট'—অজ্ঞান।"

উভয় মাষ্টারের পরস্পরের প্রতি এই তীব্র অপবাদ-প্রয়োগের ফল এই হইল, উভয় গ্রামই স্ব স্ব মাষ্টারের অসাধারণ পাণ্ডিত্য-সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উঠিল।

অবশেষে স্থির হইল, কোনও প্রকাশ্য স্থানে দুই জনের মধ্যে বিচার হউক—কে কাহাকে পরাস্ত করিতে পারে, দেখা যাউক।

উভয় গ্রামের মাতব্বর ব্যক্তিগণ মিলিত হইয়া পরামর্শ করিলেন, উভয় গ্রামের সীমারেখার উপর যে প্রাচীন বটবৃক্ষ আছে, তাহারই নিম্নে বিচার-সভা বসিবে। কিন্তু উভয় গ্রামের লোকেই ইংরাজিতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। সুতরাং যাহাতে জয়-পরাজয়-সম্বন্ধে কাহারও মনে কিছুমাত্র সংশয় না থাকে, এমন একটি সরল বিচার-প্রণালী স্থির করা আবশ্যক। উভয় গ্রামের সম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, মাষ্টারেরা পরস্পরকে একটি ইংরাজি কথার মানে জিজ্ঞাসা করিবে, অপরকে তাহার মানে বলিতে হইবে। যদি উভয়েই বলিতে পারেন, তবে উভয়ে তুল্যমূল্য। একজন অন্যকে ঠকাইতে পারিলে, তিনিই জয়পত্র পাইবেন।

বিচারের দিন স্থির হইল—আগামী বৈশাখী পূর্ণিমা ; স্থান—উপরি উক্ত বটবৃক্ষ-তল ; সময়—সূর্য্যাস্ত।

৩

ধার্য্যদিনে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই গোঁসাইগঞ্জের মাতব্বর ব্যক্তিগণ ব্রজ মাষ্টারকে সঙ্গে লইয়া বটবৃক্ষ-অভিমুখে শোভাযাত্রা করিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে ঢাক ঢোল কাড়া নাগারা প্রভৃতি বাদ্যকরগণ আছে এবং এক ব্যক্তি একটা বৃহৎ রামসিঙ্গা লইয়া চলিয়াছে—ঈশ্বরেচ্ছায় যদি জয় হয়, তবে ঢাক ঢোল বাজাইয়া আনন্দ করিতে করিতে গ্রামে ফিরিয়া আসিতে হইবে। পথে যাইতে যাইতে ব্রজ মাষ্টারের পার্শ্ববর্ত্তী ব্যক্তিগণ বলিতে লাগিলেন, "কি হে মাষ্টার, মুখ রাখতে পারবে ত? বেছে বেছে খুব শক্ত একটা কিছু ঠিক করে' রাখ, হারান মাষ্টার যেন কিছুতেই তার মানে বলতে না পারে।" ব্রজবাবু বলিলেন, "আপনারা ভাবছেন কেন? দেখুন না কি করি। এমন কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করবো যে তা শুনেই হারান মাষ্টারের আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাবে—মানে বলা ত দূরের কথা।" দত্তজা বলিলেন, "দেখো ভায়া, আজ যদি মুখ রাখতে পার, তবে তোমার পাঁচ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দেবো।"—কেহ স্পষ্ট না বলিলেও ব্রজ মাষ্টার ইহা বিলক্ষণ জানিতেন যে, আজ যদি তাঁহার পরাজয় ঘটে, তবে এ গ্রাম কল্যই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে!

সূর্য্যাস্তের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই গোঁসাইগঞ্জের দল বটবৃক্ষ-তলে উপনীত হইল। শপ্-মাদুর-শতরঞ্চি-প্রভৃতি-বাহকেরা তৎপূর্ব্বেই আসিয়া, নিজ গ্রামের সীমারেখার নিকট সেগুলি বিছাইয়া রাখিয়াছে। দূরে পঙ্গপালের মত নন্দীপুরবাসিগণ আসিতেছে, দেখা গেল। তাহাদের সঙ্গেও শপ, মাদুর প্রভৃতি ও ঢাক, ঢোল ইত্যাদি আসিতেছে

ক্রমে নন্দীপুর আসিয়া নিজ সীমানার নিকট শপ, মাদুর বিছাইয়া বসিয়া গেল। উভয় গ্রামের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ সম্মুখে বসিয়াছেন, মধ্যে দুই-তিন হাত মাত্র খালি জমি।

এখন প্রশ্ন উঠিল, কোন্ মাষ্টার প্রথমে মানে জিজ্ঞাসা করিবেন। উভয় গ্রামই প্রথম জিজ্ঞাসার অধিকার দাবী করিল। কোনও পক্ষই নিজ দাবী ত্যাগ করিতে সম্মত নহে। অবশেষে বৃদ্ধগণ মীমাংসা করিয়া দিলেন, হীরু দত্ত মহাশয় একটা ছড়ি ঘুরাইয়া ঊর্দ্ধে ছুড়িয়া দিন, ছড়ি যে গ্রামের অভিমুখে মাথা করিয়া পড়িবে, সেই গ্রামের মাষ্টার প্রথমে মানে জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার পাইবেন।

"আমার ছড়ি লউন—আমার ছড়ি লউন" বলিয়া উভয় গ্রামের অনেকেই ছুটিয়া আসিল। হাতের কাছে যে ছড়িটি পাইলেন, তাহা লইয়া হীরু দত্ত সজোরে ঘুরাইয়া ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিলেন।

ক্রমে ছড়ি আসিয়া ভূমিতে পতিত হইল। সকলে দেখিল, তাহার মাথাটি নন্দীপুরের দিকে হেলিয়া রহিয়াছে।

নন্দীপুর ইহা দেখিয়া উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল; গোঁসাইগঞ্জের মুখটি চূণ হইয়া গেল। সকলে সাগ্রহে বিচার-ফলের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিল।

নন্দীপুরের হারান মাষ্টার তখন বুক ফুলাইয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ব্রজ মাষ্টারও উঠিয়া দাঁড়াইলেন; তাঁহার বুকটি দুরু দুরু করিতে লাগিল; কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টায় মুখে সে ভাবকে তিনি প্রকাশ পাইতে দিলেন না।

হারান মাষ্টার তখন বলিলেন, "আচ্ছা, বল দেখি, এর মানে কি—

'HORNS OF A DILEMMA'."

সৌভাগ্যক্রমে ব্রজ মাষ্টার এই কূটপ্রশ্নের অর্থ অবগত ছিলেন। তিনি বুক ফুলাইয়া, সহাস্য বদনে বলিলেন, "এর মানে—

'উভয়-সঙ্কট'

—কেমন কিনা?"

"পেরেছে—পেরেছে—আমাদের মাষ্টার পেরেছে"—বলিয়া গোঁসাইগঞ্জ তুমুল কোলাহল আরম্ভ করিয়া দিল। দলপতিগণ অনেক কষ্টে তাহাদের থামাইলেন। এখন ব্রজ মাষ্টারের প্রশ্ন জিজ্ঞাসার পালা আসিল।

ব্রজ মাষ্টার উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—

"শোন হারানবাবু, আমি তোমায় কোনও কঠিন প্রশ্ন করতে চাইনে, বরং খুব সহজ দেখেই একটা জিজ্ঞাসা করবো। এ অঞ্চলে, মনে কর, তুমি আর আমি এই দু'জন যা ইংরেজিনবীশ আছি। একটা শক্ত কথার মানে জিজ্ঞাসা করে' তোমায় ঠকিয়ে দেবো সেটা আমার মনঃপূত নয়। এতে হয়ত গোঁসাইগঞ্জ রাগ করতে পারেন—কিন্তু আমি নিজে একজন ইংরেজিনবীশ হয়ে, আর একজন ইংরেজিনবীশের প্রকাশ্য সভায় অপমান ত করতে পারিনে। আচ্ছা, খুব সহজ একটা কথার মানে জিজ্ঞাসা করি—বেশ হেঁকে উত্তর দাও, যাতে দুই গ্রামের সকলে শুনতে পায়। আচ্ছা এর মানে কি বল দেখি—তুমি জান নিশ্চয়ই—আচ্ছা এর মানে বল—

'I DON'T KNOW'."

হারান মাষ্টার উচ্চস্বরে বলিলেন—

"আমি জানি না।"

শ্রবণমাত্র নন্দীপুরের সকলের মুখ একেবারে পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। সেই মুহূর্ত্তে গোঁসাইগঞ্জের দল একসঙ্গে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বিপুল বেগে নৃত্য ও চীৎকার করিতে লাগিল—"হো হো জানে না—নন্দীপুর জানে না—হেরে গেল—দুও—দুও!"

হারান মাষ্টার মহাবিপন্নভাবে সকলকে কি বলিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ঠিক সেই সময়ে গোঁসাইগঞ্জের ঢাক ঢোল কাড়া নাগারা ও রামসিঙ্গা সমবেতভাবে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। তাঁহার কথা আর কাহারও শ্রুতিগোচর হইবার সম্ভাবনা রহিল না।

গোঁসাইগঞ্জনিবাসী কয়েক জন বলশালী লোক আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া আসিল, এবং তন্মধ্যে এক জন ব্রজ মাষ্টারকে স্কন্ধের উপর তুলিয়া লইয়া গ্রামাভিমুখে চলিল। সকলে তাঁহাকে ঘিরিয়া নৃত্য করিতে করিতে, বাদ্যভাণ্ডের সহিত গ্রামে ফিরিয়া আসিল।

পর দিন শুনা গেল, হারান মাষ্টার নন্দীপুর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। তথায় স্কুলটি বন্ধ হইয়া গেল। গোঁসাইগঞ্জে ব্রজ মাষ্টার অপ্রতিহত প্রভাবে মাষ্টারি এবং অপত্য-নির্ব্বিশেষে গ্রামস্থ সকলের ক্ষীর ননী ছানা ভোজন করিতে লাগিলেন। ৺

সমুদ্রবক্ষে সাইক্লোন

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বর্ত্তমান যুগের উপন্যাস-লেখকদিগের অগ্রণী। ইনি ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইনি 'কাশীনাথ' নামক ক্ষুদ্র উপন্যাসখানি লেখেন। তাহার পর চৌদ্দ হইতে বাইশ বৎসরের মধ্যে 'বড়দিদি', 'চন্দ্রনাথ' ও 'দেবদাস' রচিত হয়। 'পথনির্দ্দেশ' ও 'বিন্দুর ছেলে' তাঁহার ছত্রিশ বৎসর বয়সের রচনা। ইহার পর 'চরিত্রহীন,' 'পরিণীতা,' 'বিরাজ বৌ,' 'পণ্ডিত মশাই,' 'মেজদিদি,' 'দর্পচূর্ণ,' 'আঁধারে আলো,' 'পল্লীসমাজ,' 'শ্রীকান্ত,' 'অরক্ষণীয়া,' 'নিষ্কৃতি,' 'গৃহদাহ,' দেনা পাওনা,' 'বামুনের মেয়ে,' 'নববিধান,' 'দত্তা,' 'শেষ প্রশ্ন,' 'পথের দাবী,' 'বিপ্রদাস' প্রভৃতি উপন্যাস রচিত হয়। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ইনি পরলোক-গমন করিয়াছেন। 'শ্রীকান্ত' (২য় পর্ব্ব) হইতে নিম্নের অংশটী 'সমুদ্রবক্ষে সাইক্লোন' নামকরণ করিয়া মুদ্রিত হইল।]

সারাদিন আকাশে ছেঁড়া মেঘের আনাগোনার বিরাম ছিল না; এখন অপরাহ্নের কাছাকাছি একটা গাঢ়, কালো মেঘ দিক্-চক্রবাল আচ্ছন্ন করিয়া ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া উঠিতে লাগিল। মনে হইল, সমস্ত খালাসীদের মুখে-চোখেই কেমন যেন একটা উদ্বেগের ছায়া পড়িয়াছে। তাহাদের চলা-ফেরায় মধ্যেও এক প্রকার ব্যস্ততার লক্ষণ—যাহা ইতিপূর্ব্বে লক্ষ্য করি নাই।

একজন বৃদ্ধ গোছের খালাসীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, চৌধুরীর পো, আজ রাত্রেও কি কালকের মত ঝড় হবে মনে হয়?

বিনয়ে চৌধুরীর পুত্র বশ হইল। দাঁড়াইয়া কহিল, কোর্ত্তা; নীচে যাও ; কাপ্তান কইচে ছাইক্লোন হোত্তি পারে।

মিনিট-পোনর পরেই দেখিলাম, কথাটা অমূলক নয়। উপরের যত যাত্রী ছিল, সকলকে একরকম জোর করিয়া খালাসীরা হোল্‌ডের মধ্যে নামাইয়া দিতে লাগিল। দুই চারিজন আপত্তি করায়, সেকেণ্ড অফিসার নিজে আসিয়া ধাক্কা মারিয়া তাহাদিগকে তুলিয়া দিয়া বিছানা-পত্র পা ।দয়া গুটাইয়া দিতে লাগিল। আমার তোরঙ্গ, বিছানা খালাসীরা ধরাধরি করিয়া নীচে লইয়া গেল ; কিন্তু আমি নিজে আর একদিকে সরিয়া পড়িলাম। শুনিলাম, যে হতভাগ্যেরা দশ টাকার বেশী ভাড়া দিতে পারে নাই, তাহাদিগকে জাহাজের খোলের মধ্যে পুরিয়া, গর্ত্তের মুখ আঁটিয়া বন্ধ করা হইবে। তাহাদের মঙ্গলের জন্যও বটে, জাহাজের মঙ্গলের জন্যও বটে, এইরূপ বিধি। আমার কিন্তু নিজের জন্য এই কল্যাণের ব্যবস্থা কিছুতেই মনঃপূত হইল না। ইতিপূর্ব্বে সাইক্লোন বস্তুটি সমুদ্রে কেন, ডাঙ্গাতেও দেখি নাই। কি ইহার কাজ, কেমন ইহার রূপ, অমঙ্গল ঘটাইবার কতখানি ইহার শক্তি—কিছুই জানি না। মনে মনে ভাবিলাম, ভাগ্যবলে যদি এমন জিনিসেরই আবির্ভাব আসন্ন হইয়াছে, তবে, না দেখিয়া ইহাকে ছাড়িব না,—তা অদৃষ্টে যা ঘটে, তা ঘটুক। আর ঝড়ে জাহাজ যদি মারা-ই যায়, ত অমন প্লেগের ইঁদুরের মত পিঁজরায় আবদ্ধ হইয়া, মাথা ঠুকিয়া ঠুকিয়া জল খাইয়া মরিতে যাই কেন ? যতক্ষণ পারি, হাত পা নাড়িয়া, ঢেউয়ের উপরে নাগরদোলা চাপিয়া, ভাসিয়া গিয়া, এক সময়ে টুপ্ করিয়া ডুব্ দিয়া পাতালের রাজবাড়ীতে অতিথি হইলেই চলিবে।

অনেকক্ষণ হইতেই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছিল। সন্ধ্যার কাছাকাছি বাতাস এবং বৃষ্টির বেগ উভয়ই বাড়িয়া উঠিল; এমন হইয়া উঠিল যে, পলাইয়া বেড়াইবার আর যো রহিল না, যেখানে হোক, সুবিধামত একটু আশ্রয় না লইলেই নয়। সন্ধ্যার আঁধারে যখন স্বস্থানে ফিরিয়া আসিলাম, তখন উপরের ডেক জনশূন্য। মাস্তলের পাশ দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম, ঠিক সম্মুখেই বুড়ো কাপ্তেন দূরবীণ হাতে ব্রিজের উপর ছুটাছুটি করিতেছেন। হঠাৎ তাঁর সুনজরে পড়িয়া গিয়া পাছে এ কষ্টের পরেও আবার সেই গর্তে গিয়া ঢুকিতে হয়, এই ভয়ে একটা সুবিধা-গোছের জায়গা অন্বেষণ করিতে করিতে একেবারে অচিন্তনীয় আশ্রয় মিলিয়া গেল। একধারে অনেকগুলা ভেড়া, মুরগী ও হাঁসের খাঁচা উপরি-উপরি রাখা ছিল, তাহারই উপরে উঠিয়া বসিলাম। মনে হইল, এমন নিরাপদ্ জায়গা বুঝি সমস্ত জাহাজের মধ্যে আর কোথাও নাই। কিন্তু, তখনও অনেক কথাই জানিতে বাকী ছিল।

বৃষ্টি, বাতাস, অন্ধকার এবং জাহাজের দোলন সব কটিই ধীরে ধীরে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। সমুদ্র-তরঙ্গের আকৃতি দেখিয়া মনে হইল, এই বুঝি ছাই-ক্লোন; কিন্তু সে যে সাগরের কাছে গোষ্পদমাত্র, তাহা অস্থিমজ্জায় হৃদয়ঙ্গম করিতে আর একটু অপেক্ষা করিতে হইল।

হঠাৎ বুকের ভিতর পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া দিয়া জাহাজের বাঁশী বাজিয়া উঠিল। উপরের দিকে চাহিয়া মনে হইল, মন্ত্রবলে যেন আকাশের চেহারা বদ্‌লাইয়া গেছে। সেই গাঢ় মেঘ আর নাই,—সমস্ত ছিঁড়িয়া-খুঁড়িয়া কি করিয়া সমস্ত আকাশটা যেন হাল্কা

হইয়া কোথাও উধাও হইয়া চলিয়াছে, পরক্ষণেই একটা বিকট শব্দ সমুদ্রের প্রান্ত হইতে ছুটিয়া আসিয়া কানে বিঁধিল, যাহার সহিত তুলনা করিয়া বুঝাইয়া দিই এমন কিছুই জানি না।

ছেলেবেলায় অন্ধকার রাত্রে ঠাকুরমার বুকের ভিতরে ঢুকিয়া সেই যে গল্প শুনতাম, কোন্ এক রাজপুত্র একডুবে পুকুরের ভিতর হইতে রূপার কৌটা তুলিয়া সাতশ রাক্ষসীর প্রাণ সোণার ভোম্‌রা হাতে পিষিয়া মারিয়াছিল, এবং সেই সাতশ রাক্ষসী মৃত্যু-যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে করিতে পদভরে সমস্ত পৃথিবী মাড়াইয়া-গুঁড়াইয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল, এও যেন তেম্‌নি কোথায় কি একটা বিপ্লব বাধিয়াছে। তবে রাক্ষসী সাতশ নয়, শতকোটী; উন্মত্ত কোলাহলে এ দিকেই ছুটিয়া আসিতেছে। আসিয়াও পড়িল। রাক্ষসী নয়,—ঝড়। তবে, এর চেয়ে বোধ করি তাদের আসাই ঢের ভাল ছিল।

এই দুর্জ্জয় বায়ুর শক্তি বর্ণনা করা ত ঢের দূরের কথা, সমগ্র চেতনা দিয়া অনুভব করাও যেন মানুষের সামর্থ্যের বাহিরে। জ্ঞান-বুদ্ধি সমস্ত অভিভূত করিয়া শুদ্ধমাত্র এম্‌নি একটা অস্পষ্ট অথচ নিঃসন্দেহ ধারণা মনের মধ্যে জাগিয়া রহিল যে, দুনিয়ার মেয়াদ একেবারে নিঃশেষ হইতে আর বিলম্ব নাই। পাশেই যে লোহার খুঁটি ছিল, গলার চাদর দিয়া নিজেকে তাহার সঙ্গে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিলাম। অনুক্ষণ মনে হইতে লাগিল, এইবার ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আমাকে সাগরের মাঝখানে উড়াইয়া লইয়া ফেলিবে।

হঠাৎ মনে হইল, জাহাজের গায়ে কালো জল যেন ভিতরের ধাক্কায় বজ্ বজ্ করিয়া ক্রমাগত উপরের দিকে ঠেলিয়া উঠিতেছে।

দূরে চোখ পড়িয়া গেল—দৃষ্টি আর ফিরাইতে পারিলাম না। একবার মনে হইল, এ বুঝি পাহাড়, কিন্তু পরক্ষণেই সে ভ্রম যখন ভাঙিল, তখন হাত জোড় করিয়া বলিলাম, ভগবান্! এই চোখ দুটি যেমন তুমিই দিয়াছিলে, আজ তুমিই তাহাদের সার্থক করিলে। এতদিন ধরিয়া ত সংসারের সর্ব্বত্র চোখ মেলিয়া বেড়াইতেছি; কিন্তু তোমার এই সৃষ্টির তুলনা ত কখনও দেখিতে পাই নাই। যতদূর দৃষ্টি যায়, এই যে অচিন্তনীয় বিরাট্‌কায় মহাতরঙ্গ মাথায় রজত-শুভ্র কিরীট পরিয়া দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, এত বড় বিস্ময় জগতে আর আছে কি!

সমুদ্রে ত কত লোকই যায় আসে; আমি নিজেও ত আরও কতবার এই পথে যাতায়াত করিয়াছি; কিন্তু এমনটি ত আর কখনও দেখিতে পাইলাম না। তা ছাড়া, চোখে না দেখিলে, জলের ঢেউ যে কোন গতিকেই এত বড় হইয়া উঠিতে পারে, এ কথা কল্পনার বাপের সাধ্যও নাই কাহাকেও জানায়।

মনে-মনে বলিলাম, হে ঢেউ-সম্রাট্! তোমার সংঘর্ষে আমাদের যাহা হইবে সে ত আমি জানি-ই; কিন্তু এখনও ত তোমার আসিয়া পৌঁছিতে অন্ততঃ আধ মিনিট কাল বিলম্ব আছে, সেই সময়টুকু বেশ করিয়া তোমার কলেবরখানি যেন দেখিয়া লইতে পারি। একটা জিনিষের সুবিপুল উচ্চতা ও ততোধিক বিস্তৃতি দেখিয়াই কিছু এ ভাব মনে আসে না; কারণ তা' হইলে হিমালয়ের যে কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গই ত যথেষ্ট। কিন্তু, এই যে বিরাট্ ব্যাপার জীবন্তের মত ছুটিয়া আসিতেছে, সেই অপরিমেয় গতি ও শক্তির অনুভূতিই আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল।

কিন্তু সমুদ্র-জলে ধাক্কা দিলে যাহা জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতে থাকে, সেই জ্বলা নানা প্রকারের বিচিত্র রেখায় ইহার মাথার উপর খেলা করিতে না থাকিলে, এই গভীর কৃষ্ণ জলরাশির বিপুলত্ব এই অন্ধকারে হয় ত তেমন করিয়া দেখিতেই পাইতাম না। এখন যতদূর দৃষ্টি যায়, ততদূরই এই আলোকমালা, যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদীপ জ্বালিয়া এই ভয়ঙ্কর সুন্দরের মুখ আমার চক্ষের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিল।

জাহাজের বাঁশী অসীম বায়ুবেগে থর থর করিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া বাজিতেই লাগিল; এবং ভয়ার্ত্ত খালাসীর দল আল্লার কর্ণে তাহাদের আকুল আবেদন পৌঁছিয়া দিতে গলা ফাটাইয়া সমস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। যাঁহার শুভাগমনের জন্য এত ভয়, এত ডাক-হাঁক, এত উদ্যোগ-আয়োজন—সেই মহাতরঙ্গ আসিয়া পড়িলেন। একটা প্রকাণ্ড-গোছের ওলট-পালটের মধ্যে হরবল্লভের মত আমারও প্রথমটা মনে হইল,—নিশ্চয়ই আমরা ডুবিয়া গেছি, সুতরাং দুর্গানাম করিয়া আর কি হইবে। আশে পাশে, উপরে নীচে চারিদিকেই কালো জল! জাহাজ-শুদ্ধ সবাই যে পাতালের রাজবাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইতে চলিয়াছি, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এখন ভাবনা শুধু এই যে, খাওয়া-দাওয়াটা তথায় কি জানি কিরূপ হইবে। কিন্তু মিনিটখানেক পরে দেখা গেল, না—ডুবি নাই, জাহাজ-শুদ্ধ আবার জলের উপরে ভাসিয়া উঠিয়াছি। অতঃপর তরঙ্গের পর তরঙ্গেরও আর শেষ হয় না, আমাদের নাগরদোলা-চাপারও আর সমাপ্তি হয় না। এতক্ষণে টের পাইলাম, কেন কাপ্তেন সাহেব মানুষগুলাকে জানোয়ারের মত গর্ত্তে পূরিয়া চাবি বন্ধ করিয়াছেন।

ডেকের উপর দিয়া মাঝে মাঝে যেন জলের স্রোত বহিয়া যাইতে লাগিল। আমার নীচে হাঁস-মুরগীগুলা বারকতক ঝট্‌-পট্‌ করিয়া এবং ভেড়াগুলা কয়েকবার ম্যা-ম্যা করিয়া ভবলীলা সাঙ্গ করিল আমি শুধু তাহাদের উপরতলা আশ্রয় করিয়া লোহার খুঁটি সবলে জড়াইয়া ধরিয়া ভবলীলা বজায় করিয়া চলিলাম। কিন্তু এখন আর এক প্রকারের বিপদ জুটিল। শুধু যে জলের ছাট্‌ ছুঁচের মত গায়ে বিঁধিতে লাগিল, তাই নয়, সমস্ত জামা-কাপড় ভিজিয়া প্রচণ্ড বাতাসে এমনি শীত করিতে লাগিল যে. দাঁতে দাঁতে ঠক্‌-ঠক্‌ করিয়া বাজিতে লাগিল। মনে হইল, জলে ডোবার হাত হইতে যদি-বা সম্প্রতি নিস্তার পাই, নিউমোনিয়ার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইব কিরূপে? এই ভাবে আরও কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিলে যে, পরিত্রাণ পাওয়া সত্যই অসম্ভব হইয়া পড়িবে, তাহা নিঃসংশয়ে অনুভব করিলাম। সুতরাং যেমন করিয়া হোক, এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া এমন কোথাও আশ্রয় লইতে হইবে, যেখানে জলের ছাট বল্লমের ফলার মত গায়ে বেঁধে না। একবার ভাবিলাম, ভেড়ার খাঁচার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলে কিরূপ হয়? কিন্তু তাই বা কতটুকু নিরাপদ? তার মধ্যে যদি সেইরূপ লোনা জলের স্রোত ঢুকিয়া পড়ে ত নিতান্তই যদি না ম্যা-ম্যা করি, মা-মা করিয়াও অন্ততঃ ইহ-লীলা সমাপ্ত করিতে হইবে।

শুধু এক উপায় আছে। জাহাজের পার্শ্ব-পরিবর্ত্তনের মধ্যে ছুট দিবার একটু অবকাশ পাওয়া যায়; অতএব এই সময়টুকুর মধ্যে আর কোথাও গিয়া যদি ঢুকিয়া পড়িতে পারি, হয় ত বাঁচিতেও পারি। যে কথা, সেই কাজ। কিন্তু খাঁচা হইতে অবতরণ করিয়া তিনবার ছুটিয়া ও তিনবার বসিয়া যদি-বা সেকেণ্ড

ক্লাস কেবিনের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলাম, দ্বার বন্ধ। লোহার কপাট হাজার ঠেলা-ঠেলিতেও পথ দিল না। সুতরাং আবার সেই পথ তেম্‌নি করিয়া অতিক্রম করিয়া ফার্ষ্ট ক্লাসের দোর গোড়ায় আসিয়া হাজির হইলাম। এবার ভাগ্য-দেবতা সুপ্রসন্ন হইয়া একটা নিরালা ঘরের মধ্যে আশ্রয় দিলেন। লেশমাত্র দ্বিধা না করিয়া কপাট বন্ধ করিয়া দিয়া খাটের উপর ঝুপ্‌ করিয়া শুইয়া পড়িলাম।

রাত্রি বারোটার মধ্যেই ঝড়-বৃষ্টি থামিয়া গেল বটে, কিন্তু পরদিন ভোরবেলা পর্য্যন্ত সমুদ্রের রাগ পড়িল না।

আমার জিনিষপত্রের এবং সহযাত্রীদের অবস্থা কি হইল, জানিবার জন্য সকালবেলা নীচে নামিয়া গেলাম। তাহাদের অবস্থা দেখিলে সত্যই কান্না পায়। এই তিন চারশ' যাত্রীর মধ্যে সমর্থ থাকা ত দূরের কথা, বোধ করি, অক্ষত কেহই ছিল না। মেয়েরা শিলের উপর নোড়া দিয়া যেমন করিয়া বাটনা বাটে, কল্যকার সাইক্লোন এই তিন চারশ লোক দিয়া ঠিক তেম্‌নি করিয়া সারারাত্রি বাটনা বাটিয়াছে। সমস্ত জিনিষপত্র, বাক্স-পেঁটরা লইয়া এই লোকগুলি সমস্ত রাত্রি জাহাজের এধার হইতে ওধার গড়াইয়া বেড়াইয়াছে।

মেজদিদি

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কেষ্টার মা মুড়ি-কড়াই ভাজিয়া, চাহিয়া চিন্তিয়া, অনেক দুঃখে কেষ্টধনকে চোদ্দ-বছরেরটি করিয়া মারা গেলে, গ্রামে তাহার আর দাঁড়াইবার স্থান রহিল না। বৈমাত্র বড়বোন কাদম্বিনীর অবস্থা ভাল। সবাই কহিল, "যা কেষ্ট, তোর দিদির বাড়ীতে গিয়ে থাক্‌গে। সে বড় মানুষ, বেশ থাক্‌বি, যা।"

মায়ের দুঃখে কেষ্ট কাঁদিয়া কাটিয়া জ্বর করিয়া ফেলিল। শেষে ভাল হইয়া, ভিক্ষা করিয়া, শ্রাদ্ধ করিল। তার পরে ন্যাড়া মাথায় একটি ছোট পুঁটুলি সম্বল করিয়া, দিদির বাড়ী রাজহাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। দিদি তাহাকে চিনিত না। পরিচয় পাইয়া এবং আগমনের হেতু শুনিয়া একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া উঠিল। সে নিজের নিয়মে ছেলেপুলে লইয়া ঘরসংসার পাতিয়া বসিয়াছিল—অকস্মাৎ, এ কি উৎপাত!

কাদম্বিনীর স্বামী নবীন মুখুয্যের ধান-চালের আড়ত ছিল। তিনি বেলা বারোটার পর বাড়ী ফিরিয়া কেষ্টাকে বক্র কটাক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া, প্রশ্ন করিলেন, "এটি কে?" কাদম্বিনী মুখ ভারি করিয়া জবাব দিল, "তোমার বড়-কুটুম গো বড়-কুটুম! নাও, খাওয়াও পরাও, মানুষ কর—পরকালের কাজ হোক্‌।"

বড়-কুটুম যে গো! একে তার মত রাখ্‌তে হবে ত! এতে আমার পাঁচুগোপালের বরাতে এক বেলা এক সন্ধ্যা জোটে ত তাই ঢের! নইলে অখ্যাতিতে দেশ ভ'রে যাবে।" বলিয়া পাশের বাড়ীর দোতালা ঘরের বিশেষ একটা খোলা জানালার প্রতি রোষকষায়িত লোচনে অগ্নিবৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। এই ঘরট তাহার মেজ-যা হেমাঙ্গিনীর।

কেষ্ট বারান্দায় একধারে ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিল। কাদম্বিনী ভাঁড়ারে ঢুকিয়া একটা নারিকেল-মালায় একটুখানি তেল আনিয়া, তাহার পাশে ধরিয়া দিয়া কহিলেন, "আর মায়া-কান্না কাঁদ্‌তে হবে না, যাও, পুকুর থেকে ডুব দিয়ে এসোগে—বলি, ফুলেল তেল-টেল মাখা অভ্যাস নেই ত?" স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া চেঁচাইয়া বলিলেন, "তুমি চান কর্‌তে যাবার সময় বাবুকে ডেকে নিয়ে যেয়ো গো, নইলে ডুবে ম'লে-ট'লে বাড়ীশুদ্ধ লোকের হাতে দড়ি পড়্‌বে।"

কেষ্ট ভাত খাইতে বসিয়াছিল। সে স্বভাবতঃই ভাতটা কিছু বেশী খাইত। তাহাতে কাল বিকাল হইতে খাওয়া হয় নাই, আজ এতখানি পথ হাঁটিয়া আসিয়াছে—বেলাও হইয়াছে। নানা কারণে পাতের ভাতগুলি নিঃশেষ করিয়াও তাহার ঠিক ক্ষুধা মিটে নাই। নবীন অদূরে খাইতে বসিয়াছিলেন; লক্ষ্য করিয়া স্ত্রীকে কহিলেন, "কেষ্টাকে আর দুটি ভাত দাও গো।"—"দিই" বলিয়া কাদম্বিনী উঠিয়া গিয়া পরিপূর্ণ একথালা ভাত আনিয়া সমস্তটা তাহার পাতে ঢালিয়া দিয়া, উচ্চ হাস্য করিয়া কহিলেন, "তবেই হয়েছে! এ হাতীর খোরাক নিত্য যোগাতে গেলে যে, আমাদের আড়ত খালি হ'য়ে যাবে! ওবেলা দোকান থেকে মণ

দুই মোটা চাল পাঠিয়ে দিয়ো, নইলে দেউলে হ'তে হবে, তা ব'লে রাখ্‌ছি।"

মর্ম্মান্তিক লজ্জায় কেষ্টর মুখখানি আরও ঝুঁকিয়া পড়িল। সে এক মায়ের এক ছেলে। দুঃখিনী জননীর কাছে সরু চাল খাইতে পাইয়াছিল কি না, সে খবর জানি না, কিন্তু পেট ভরিয়া ভাত খাওয়ার অপরাধে কোন দিন যে লজ্জায় মাথা হেঁট করিতে হয় নাই, তাহা জানি। তাহার মনে পড়িল, হাজার বেশী খাইয়াও কখন মায়ের মনের সাধ মিটাইতে পারে নাই। মনে পড়িল, এই সে দিনও ঘুড়ি লাটাই কিনিবার জন্য দু'মুঠা ভাত বেশী খাইয়া পয়সা আদায় করিয়া লইয়াছিল।

তাহার দুই চোখের কোণ বাহিয়া বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা ভাতের থালার উপর নিঃশব্দে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, সে সেই ভাত মাথা গুঁজিয়া গিলিতে লাগিল। বাঁ-হাতটা তুলিয়া মুছিতে পর্য্যন্ত সাহস করিল না, পাছে দিদির চোখে পড়ে। অনতিপূর্ব্বেই মায়া-কান্না কাঁদার অপরাধে বকুনি খাইয়াছিল। সেই ধমক তাহার এত বড় মাতৃ-শোকেরও ঘাড় চাপিয়া রাখিল।

২

পৈতৃক বাড়ীটা দুই ভায়ে ভাগ করিয়া লইয়াছিল।

পাশের দোতালা বাড়ীটা মেজভাই বিপিনের। ছোট ভায়ের অনেক দিন মৃত্যু হইয়াছিল। বিপিনেরও ধান-চালের কারবার। তাহার অবস্থাও ভাল, কিন্তু বড়ভাই নবীনের সমান নয়। তথাপি ইহার বাড়ীটাই দোতালা। মেজবউ হেমাঙ্গিনী সহরের মেয়ে। সে দাসদাসী রাখিয়া, লোকজন খাওয়াইয়া, জাঁকজমকে

থাকিতে ভালবাসে। পয়সা বাঁচাইয়া গরিবী চালে চলে না বলিয়াই বছর চারেক পূর্ব্বে দুই যায়ে কলহ করিয়া পৃথক্ হইয়াছিল। সেই অবধি প্রকাণ্ড কলহ অনেকবার হইয়াছে, অনেকবার মিটিয়াছে, কিন্তু মনোমালিন্য একটি দিনের জন্যও ঘুচে নাই। কারণ, সেটা বড়-যা কাদম্বিনীর একলার হাতে। তিনি পাকা লোক, ঠিক বুঝিতেন, ভাঙা হাঁড়ি জোড়া লাগে না; কিন্তু, মেজবউ অত পাকা নয়, অমন করিয়া বুঝিতেও পারিত না।

আজ বেলা তিনটা সাড়ে তিনটার সময় হেমাঙ্গিনী এ বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। কূপের পার্শ্বে সিমেণ্ট বাঁধান বেদির উপর রোদে বসিয়া কেষ্ট সাবান দিয়া একরাশ কাপড় পরিষ্কার করিতেছিল; কাদম্বিনী দূরে দাঁড়াইয়া, অল্প সাবান ও অধিক গায়ের জোরে কাপড় কাচিবার কৌশলটা শিখাইয়া দিতেছিলেন। মেজ-যাকে দেখিবামাত্রই বলিয়া উঠিলেন, "মাগো,—ছোঁড়াটা কি নোংরা কাপড়-চোপড় নিয়েই এসেচে!"

কথাটা সত্য। কেষ্টার সেই লাল পেড়ে ধুতিটা পরিয়া এবং চাদরটা গায়ে দিয়া, কেহ কুটুমবাড়ী যায় না। দুটাকে পরিষ্কার করার আবশ্যক ছিল বটে, কিন্তু, রজকের অভাবে ঢের বেশী আবশ্যক হইয়াছিল, পুত্র পাঁচুগোপালের জোড়া দুই এবং তাহার পিতার জোড়া দুই পরিষ্কার করিবার। কেষ্টা আপাততঃ তাহাই করিতেছিল। হেমাঙ্গিনী চাহিয়াই টের পাইল, বস্ত্রগুলি কাহাদের। কিন্তু, সে উল্লেখ না করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ছেলেটি কে দিদি?" ইতিপূর্ব্বে নিজের ঘরে বসিয়া আড়ি পাতিয়া সে সমস্তই অবগত হইয়াছিল। তিনি ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া,

পুনঃ

দিদি। বলি, বাপের বাড়ীর কেউ নাকি ?" কাদম্বিনী বিরক্ত গম্ভীর মুখে জবাব দিলেন, "হুঁ, আমার বৈমাত্র ভাই। ওরে, ও কেষ্ট, তোর মেজদিকে একটা প্রণাম কর্ না রে! কি অসভ্য ছেলে বাবা!" কেষ্ট থতমত খাইয়া উঠিয়া আসিয়া কাদম্বিনীর পায়ের কাছেই নমস্কার করাতে তিনি ধম্‌কাইয়া উঠিলেন, "আ মর্, হাবা কালা নাকি কাকে প্রণাম কর্‌তে বল্‌লুম, কাকে এসে কর্‌লে!"

বস্তুতঃ, আসিয়া অবধি তিরস্কার ও অপমানের অবিশ্রান্ত আঘাতে তাহার মাথা বে-ঠিক হইয়া গিয়াছিল। তাহার ঝাঁঝে ব্যস্ত ও হতবুদ্ধি হইয়া হেমাঙ্গিনীর পায়ের কাছে সরিয়া আসিয়া শির অবনত করিতেই সে হাত দিয়া ধরিয়া ফেলিয়া, তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিল, "থাক্ থাক্, হয়েছে ভাই— চিরজীবী হও।" কেষ্ট মূঢ়ের মত তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। এ দেশে এমন করিয়া যে কেহ কথা বলিতে পারে, ইহা যেন তাহার মাথায় ঢুকিল না।

তাহার সেই কুণ্ঠিত, ভীত, অসহায় মুখখানির পানে চাহিবা-মাত্রেই হেমাঙ্গিনীর বুকের ভিতরটা যেন মুচড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিল। নিজেকে আর সামলাইতে না পারিয়া, সহসা এই হতভাগ্য অনাথ বালককে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া, তাহার পরিশ্রান্ত ঘর্ম্মাপ্লুত মুখখানি নিজের আঁচলে মুছাইয়া দিয়া, বা'কে কহিল, "আহা, একে দিয়ে কি কাপড় কাচিয়ে নিতে আছে দিদি, একটা চাকর ডাক নি কেন ?"

কাদম্বিনী হঠাৎ অবাক্ হইয়া গিয়া, জবাব দিতে পারিলেন না; কিন্তু নিমিষে সাম্‌লাইয়া লইয়া রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন,

"আমি ত তোমার মত বড় মানুষ নই মেজবউ যে, বাড়ীতে দশ-বিশটা দাসদাসী আছে? আমাদের গেরস্ত ঘরে—" কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই হেমাঙ্গিনী নিজের ঘরের দিকে মুখ তুলিয়া মেয়েকে ডাকিয়া কহিল, "উমা, শিবুকে একবার এ বাড়ীতে পাঠিয়ে দে ত মা, বট্‌ঠাকুর আর পাঁচুর ময়লা কাপড়গুলো পুকুর থেকে কেচে এনে শুকোতে দিক্।" বড়-যায়ের দিকে ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, "এবেলা কেষ্ট আর পাঁচুগোপাল, আমার ওখানে খাবে দিদি। সে ইস্কুল থেকে এলেই পাঠিয়ে দিয়ো, আমি ততক্ষণ একে নিয়ে যাই।" কেষ্টকে কহিল, "ওঁর মত আমিও তোমার দিদি হই কেষ্ট—এসো আমার সঙ্গে"—বলিয়া তাহার একটা হাত ধরিয়া নিজেদের বাড়ী চলিয়া গেল।

কাদম্বিনী বাধা দিলেন না। অধিকন্তু, হেমাঙ্গিনী-প্রদত্ত এত বড় খোঁচাটাও নিঃশব্দে হজম করিলেন। তাহার কারণ, যে ব্যক্তি খোঁচা দিয়াছে, সে এ বেলার খরচটাও বাঁচাইয়া দিয়াছে। কাদম্বিনীর পয়সার বড় সংসারে আর কিছু ছিল না। তাই গাভী দুধ দিতে দাঁড়াইয়া পা ছুঁড়িলে তিনি সহিতে পারিতেন।

৩

সন্ধ্যার সময় কাদম্বিনী প্রশ্ন করিলেন, "কি খেয়ে এলি রে কেষ্ট?"

কেষ্ট সলজ্জ নতমুখে কহিল, "লুচি।"—"কি দিয়ে খেলি?" কেষ্ট তেমনি ভাবে বলিল, "রুই মাছের মুড়োর তরকারি, সন্দেশ, রসগো—"

"ইস্! বলি মেজ-ঠাক্‌রুণ মুড়োটা কার পাতে দিলেন?"

হঠাৎ এই প্রশ্নে কেষ্টর মুখখানি পাণ্ডুর হইয়া গেল। উদ্যত প্রহরণের সম্মুখে রজ্জুবদ্ধ জানোয়ারের প্রাণটা যেমন করিয়া উঠে, কেষ্টর বুকের ভিতরটায় তেম্‌নিধারা করিতে লাগিল। দেরী দেখিয়া কাদম্বিনী কহিলেন, "তোর পাতে বুঝি?"

গুরুতর অপরাধীর মত কেষ্ট মাথা হেঁট করিল।

অদূরে দাওয়ায় বসিয়া নবীন তামাক খাইতেছিলেন। কাদম্বিনী সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বলি, শুন্‌লে ত?" নবীন সংক্ষেপে 'হুঁ' বলিয়া হুঁকায় টান দিলেন।

কাদম্বিনী উষ্মার সহিত বলিতে লাগিলেন, "খুড়ো, আপনার লোক, তার ব্যাভারটা স্থাখো। পাঁচুগোপাল আমার রুইমাছের মুড়ো বল্‌তে অজ্ঞান, সে কি তা' জানে না? তবে কোন্ আক্কেলে তার পাতে না দিয়ে ব্যানা বনে মুক্ত ছড়িয়ে দিলে? বলি হাঁরে কেষ্ট, সন্দেশ-রসগোল্লা খুব পেট ভ'রে খেলি? সাত জন্ম কখন তুই এ সব চোখেও দেখিস্ নি।" স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল, "যারা দুটি ভাত পেলে বেঁচে যায়, তাদের পেটে লুচি-সন্দেশ কি হবে! কিন্তু আমি বল্‌চি তোমাকে, কেষ্টাকে মেজগিন্নী বিগ্‌ড়ে না দেয় ত আমাকে কুকুর ব'লে ডেকো।" নবীন মৌন হইয়া রহিলেন। কারণ, স্ত্রী বিদ্যমানে মেজবউ তাহাকে বিগ্‌ড়াইয়া ফেলিতে পারিবে, এরূপ দুর্ঘটনা তিনি বিশ্বাস করিলেন না।

পরদিন হইতে দুটো চাকরের একটাকে ছাড়ান হইল; কেষ্ট নবীনের ধান-চালের আড়তে কায করিতে লাগিল। সেখানে সে ওজন করে, বিক্রী করে, চার পাঁচ কোশ পথ হাঁটিয়া নমুনা সংগ্রহ করিয়া আনে, দুপুর বেলা নবীন ভাত খাইতে আসিলে, দোকান আগ্‌লায়। দিন দুই পরে, তিনি আহার-নিদ্রা সমাপ্ত

করিয়া ফিরিয়া গেলে, সে ভাত খাইতে আসিয়াছিল। তখন বেলা তিনটা। কেষ্ট পুকুর হইতে স্নান করিয়া আসিয়া দেখিল, দিদি ঘুমাইতেছেন। তাহার তখনকার ক্ষুধার তাড়নায় বোধ করি বাঘের মুখ হইতেও খাবার কাড়িয়া আনিতে পারিত, কিন্তু, দিদিকে ডাকিয়া তুলিবে, এ সাহস হইল না।

রান্নাঘরের দাওয়ার একধারে চুপ্‌টি করিয়া দিদির ঘুমভাঙার আশায় বসিয়াছিল, হঠাৎ ডাক শুনিল—"কেষ্ট?" সে আহ্বান কি স্নিগ্ধ হইয়াই তাহার কাণে বাজিল। মুখ তুলিয়া দেখিল, মেজদি' তাঁহার দোতালার ঘরের জানালা ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। কেষ্ট একটিবার চাহিয়াই মুখ নামাইল। খানিক পরে হেমাঙ্গিনী নামিয়া আসিয়া, সুমুখে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ক-দিন দেখিনি ত? এখানে এমন চুপ ক'রে ব'সে কেন, কেষ্ট?" একে ত ক্ষুধায় অল্পেই চোখে জল আসে, তাহাতে এমন স্নেহার্দ্র কণ্ঠস্বর। তাহার দু'চোখ টল্‌টল্ করিতে লাগিল, সে ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল, উত্তর দিতে পারিল না।

মেজখুড়ীমাকে সব ছেলে-মেয়েরা ভালবাসিত। তাঁহার গলা শুনিয়া কাদম্বিনীর ছোট মেয়ে ঘর হইতে বাহিরে আসিয়াই চেঁচাইয়া বলিল, "কেষ্ট মামা, রান্না-ঘরে তোমার ভাত ঢাকা আছে, খাওগে। মা খেয়ে দেয়ে ঘুমোচ্চে।" হেমাঙ্গিনী অবাক্ হইয়া কহিলেন, "কেষ্টর এখনো খাওয়া হয়নি, তোর মা খেয়ে ঘুমোচ্চে কি রে? হাঁ কেষ্ট, আজ এত বেলা হ'ল কেন?"

কেষ্ট ঘাড় হেঁট করিয়াই রহিল। টুনি তাহার হইয়া জবাব দিল, "কেষ্ট মামার রোজ ত এম্‌নি বেলাই হয়। বাবা খেয়ে-দেয়ে দোকানে ফিরে গেলে তবে ত ও খেতে আসে।" হেমাঙ্গিনী

বুঝিলেন, কেষ্টকে দোকানে কাজে লাগান হইয়াছে। তাহাকে বসাইয়া খাওয়ান হইবে, এ আশা অবশ্য তিনি করেন নাই, কিন্তু, একবার এই বেলার দিকে চাহিয়া, একবার এই ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় আর্ত্ত শিশু-দেহের পানে চাহিয়া, তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে তিনি বাড়ী চলিয়া গেলেন। মিনিট দুই পরে একবাটি দুধহাতে ফিরিয়া আসিয়া, রান্নাঘরে ঢুকিয়াই শিহরিয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইলেন।

কেষ্ট খাইতে বসিয়াছিল। একটা পিতলের থালার উপর ঠাণ্ডা শুক্‌নো ড্যালা পাকান ভাত। একপাশে একটুখানি ডাল, ও কি-একটু তরকারির মত। দুধটুকু পাইয়া তাহার মলিন মুখখানি হাসিতে ভরিয়া গেল। হেমাঙ্গিনী দ্বারের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কেষ্ট খাওয়া শেষ করিয়া পুকুরে আঁচাইতে চলিয়া গেলে একবারটি মুখ বাড়াইয়া দেখিলেন, পাতে গোনা একটিও ভাত পড়িয়া নাই। ক্ষুধার জ্বালায় সে সেই অন্ন নিঃশেষ করিয়া খাইয়াছে। হেমাঙ্গিনীর ছেলে ললিতও প্রায় সেই বয়সী। নিজের অবর্ত্তমানে নিজের ছেলেকে এই অবস্থায় হঠাৎ কল্পনা করিয়া ফেলিয়া কান্নার ঢেউ তাঁহার কণ্ঠ পর্য্যন্ত ফেনাইয়া উঠিল। তিনি সেই কান্না চাপিতে চাপিতে বাড়ী চলিয়া গেলেন।

৪

সর্দ্দি উপলক্ষ করিয়া হেমাঙ্গিনীর মাঝে মাঝে জ্বর হইত, দিন দুই থাকিয়া আপনি ভাল হইয়া যাইত। দিন কয়েক পরে এমনি একটু জ্বর-বোধ হওয়ায় সন্ধ্যার পর বিছনায় পড়িয়াছিলেন। ঘরে কেহ ছিল না, হঠাৎ মনে হইল, কে যেন অতি সন্তর্পণে কপাটের

আড়ালে দাঁড়াইয়া উঁকি মারিয়া দেখিতেছে। ডাকিলেন; "কে রে ওখানে দাঁড়িয়ে, ললিত?" কেহ সাড়া দিল না। আবার ডাকিতে, আড়াল হইতে জবাব আসিল, "আমি!"—"কে আমি রে? আয়, ঘরে এসে বোস্।" কেষ্ট সসঙ্কোচে ঘরে ঢুকিয়া দেয়াল ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। হেমাঙ্গিনী উঠিয়া বসিয়া সস্নেহে কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন রে কেষ্ট?" কেষ্ট আর একটু সরিয়া আসিয়া, মলিন কোঁচার খুঁট খুলিয়া দুটি আধ্পাকা পেয়ারা বাহির করিয়া বলিল, "জ্বরের উপর খেতে বেশ।" হেমাঙ্গিনী সাগ্রহে হাত বাড়াইয়া বলিলেন, "কোথায় পেলি রে? আমি কাল থেকে লোকের কত খোসামোদ কচ্চি, কেউ এনে দিতে পারে নি"—বলিয়া পেয়ারাশুদ্ধ কেষ্টর হাতখানি ধরিয়া কাছে বসাইলেন। কেষ্ট লজ্জায় আহ্লাদে আরক্ত মুখ হেঁট করিল।

যদিও এটা পেয়ারার সময় নয়, হেমাঙ্গিনীও খাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন নাই, তথাপি এই দুইটি সংগ্রহ করিয়া আনিতে দুপুর বেলার সমস্ত রোদটা কেষ্টর মাথার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছিল। হেমাঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ কেষ্ট, কে তোকে বল্লে, আমার জ্বর হয়েচে?" কেষ্ট জবাব দিল না। "কে বল্লে রে আমি পেয়ারা খেতে চেয়েচি?" কেষ্ট তাহারও জবাব দিল না। সে সেই যে মুখ হেঁট করিল, আর তুলিতেই পারিল না। ছেলেটি যে অতিশয় লাজুক ও ভীরুস্বভাব, হেমাঙ্গিনী তাহা পূর্ব্বেই টের পাইয়াছিল। তখন তাহার মাথায় মুখে হাত বুলাইয়া দিয়া, আদর করিয়া, 'দাদা' বলিয়া ডাকিয়া, আরও কত কি কৌশলে তাহার ভয় ভাঙাইয়া, অনেক কথা জানিয়া লইলেন। বিস্তর অনুসন্ধানে পেয়ারা-সংগ্রহ করিবার

কথা হইতে সুরু করিয়া, তাহাদের দেশের কথা, মায়ের কথা, এখানে খাওয়া-দাওয়ার কথা, দোকানে কি কি কাজ করিতে হয়, তাহার কথা—একে একে সমস্ত বিবরণ শুনিয়া লইয়া, চোখ মুছিয়া বলিলেন, "এই তোর মেজদি'কে কখনও কিছু লুকোসনে কেষ্ট, যখন যা' দরকার হবে, চুপি চুপি এসে চেয়ে নিস্—নিবি ত?" কেষ্ট আহ্লাদে মাথা নাড়িয়া কহিল, "আচ্ছা।"

সত্যকার স্নেহ যে কি, তাহা দুঃখী মায়ের কাছে কেষ্ট শিখিয়াছিল। এই মেজদি'র মধ্যে তাহাই আস্বাদ করিয়া কেষ্টর রুদ্ধ মাতৃ-শোক আজ গলিয়া ঝরিয়া গেল। উঠিবার সময় সে মেজদি'র পায়ের ধুলা মাথায় লইয়া যেন বাতাসে ভাসিতে ভাসিতে বাহির হইয়া আসিল।

কিন্তু তাঁহার দিদির আক্রোশ তাহার প্রতি প্রতিদিন বাড়িয়াই চলিতে লাগিল। কারণ, সে সৎমার ছেলে, সে নিরুপায়। আবশ্যক হইলে অখ্যাতির ভয়ে তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়াও যায় না, বিলাইয়া দেওয়াও যায় না। সুতরাং যখন রাখিতেই হইবে, তখন যতদিন তাহার দেহ বহে, ততদিন কষিয়া খাটাইয়া লওয়াই ঠিক। সে ঘরে ফিরিয়া আসিতেই দিদি ধরিয়া পড়িলেন, "সমস্ত দুপুর দোকান পালিয়ে কোথা ছিলি রে কেষ্ট?" কেষ্ট চুপ করিয়া রহিল। কাদম্বিনী ভয়ানক রাগিয়া বলিলেন, "বল্ শীগ্গীর!" কেষ্ট তথাপি নিরুত্তর হইয়া রহিল। মৌন থাকিলে যাহাদের রাগ পড়ে, কাদম্বিনী সে দলের নহেন। অতএব কথা বলাইবার জন্য তিনি যতই জেদ করিতে লাগিলেন, বলাইতে না পারিয়া তাঁহার ক্রোধ এবং রোখ ততই চড়িয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে পাঁচুগোপালকে ডাকিয়া, তাহার দুই কান

পুনঃ পুনঃ মলাইয়া দিলেন এবং তাহার জন্য রাত্রে হাঁড়িতে 'চাল লইলেন না।

আঘাত যতই গুরুতর হোক, প্রতিহত হইতে না পাইলে লাগে না। পর্ব্বত-শিখর হইতে নিক্ষেপ করিলেই হাত-পা ভাঙে না, ভাঙে শুধু তখনই, যখন পদতলস্পৃষ্ট কঠিন ভূমি সেই বেগ প্রতিরোধ করে। ঠিক তাহাই হইয়াছিল কেষ্টর। মায়ের মরণ যখন পায়ের নীচের নির্ভরস্থলটুকু তাহার একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দিল, তখন হইতে বাহিরের কোন আঘাতই তাহাকে আঘাত করিয়া ধূলিসাৎ করিয়া দিতে পারিল না। সে দুঃখীর ছেলে, কিন্তু কখন দুঃখ পায় নাই। লাঞ্ছনা-গঞ্জনার সহিত তাহার পূর্ব্ব-পরিচয় ছিল না, তথাপি এখানে আসা অবধি কাদম্বিনীর দেওয়া কঠোর দুঃখকষ্ট সে যে অনায়াসে সহ্য করিতে পারিতেছিল, সে শুধু পায়ের তলায় অবলম্বন ছিল না বলিয়াই। কিন্তু আজ আর পারিল না। আজ সে হেমাঙ্গিনীর মাতৃ-স্নেহের সুকঠিন ভিত্তির উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাই, আজিকার এই অত্যাচার-অপমান তাহাকে একেবারে ধরাশায়ী করিয়া দিল। মাতাপুত্র এই নিরপরাধ নিরাশ্রয় শিশুকে শাসন করিয়া, লাঞ্ছনা করিয়া, অপমান করিয়া, দণ্ড দিয়া, চলিয়া গেলেন, সে অন্ধকার ভূশয্যায় পড়িয়া আজ অনেক দিনের পর আবার মাকে স্মরণ করিয়া, মেজদি'র নাম করিয়া, ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

৫

পরদিন সকালেই কেষ্ট হঠাৎ গুটি গুটি ঘরে ঢুকিয়া হেমাঙ্গিনীর পায়ের কাছে বিছানার এক পাশে আসিয়া বসিল। হেমাঙ্গিনী

পা দুটো একটু গুটাইয়া লইয়া সস্নেহে বলিলেন, "দোকানে যাস্ নি কেষ্ট ?"

কেষ্ট। এইবার যাব।

হেমা। দেরি করিস্ নে দাদা, এই বেলা যা। নইলে এক্ষণি আবার গালাগালি করবে।

কেষ্টর মুখ একবার আরক্ত, একবার পাণ্ডুর হইল। 'যাই' বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। একবার ইতস্ততঃ করিয়া কি একটা বলিতে গিয়া চুপ করিল।

হেমাঙ্গিনী তাহার মনের কথা যেন বুঝিলেন, বলিলেন, "কিছু বল্‌বি আমাকে রে ?"

কেষ্ট মাটির দিকে চাহিয়া অতি মৃদুস্বরে বলিল, "কাল কিছু খাই নি মেজদি'—"

"কাল থেকে খাস্ নি! বলিস্ কি কেষ্ট ?" কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত হেমাঙ্গিনী স্থির হইয়া রহিলেন, তাহার পর দুই চোখ জলে পূর্ণ হইয়া গেল। সেই জল ঝর-ঝর করিয়া ঝরিতে লাগিল। তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া আর একবার কাছে বসাইয়া, একটি একটি করিয়া সব কথা শুনিয়া লইয়া বলিলেন, "কাল রাত্তিরেই কেন এলি নে ?"

কেষ্ট চুপ করিয়া রহিল। হেমাঙ্গিনী আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিলেন, "আমার মাথার দিব্যি রইল, ভাই, আজ থেকে আমাকে তোর সেই মরা মা ব'লে মনে করবি।"

যথাসময়ে সমস্ত কথা কাদম্বিনীর কাণে গেল। তিনি নিজের বাড়ী হইতে মেজবউকে ডাক দিয়া বলিলেন, "ভাইকে আমি কি খাওয়াতে পারি নে যে, তুমি অত কথা তাকে গায়ে প'ড়ে বল্‌তে

গেছ?" কথার ধরণ দেখিয়া হেমাঙ্গিনীর গা-জ্বালা করিয়া উঠিল। কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া বলিল, "যদি গায়ে প'ড়েই ব'লে থাকি, তাতেই বা দোষ কি?" কাদম্বিনী প্রশ্ন করিলেন, "তোমার ছেলেটিকে ডেকে এনে আমি যদি এম্‌নি ক'রে বলি, তোমার মানটি থাকে কোথায় শুনি? তুমি এমন ক'রে 'নাই' দিলে আমি তাকে শাসন করি কি ক'রে বল দেখি?"

হেমাঙ্গিনী আর সহ্য করিতে পারিল না। বলিল, "দিদি, পনর যোল বছর এক সঙ্গে ঘর কর্‌চি—তোমাকে আমি চিনি। পেটে মেরে আগে তোমার নিজের ছেলেকে শাসন কর, তার পরে পরের ছেলেকে ক'রো, তখন গায়ে প'ড়ে কথা কইতে যাব না।"

কাদম্বিনী অবাক্ হইয়া বলিলেন, "আমার পাঁচুগোপালের সঙ্গে ওর তুলনা? দেব্‌তার সঙ্গে বাঁদরের তুলনা? এর পরে আরও কি যে তুমি ব'লে বেড়াবে, তাই ভাবি মেজবউ!"

মেজবউ উত্তর দিল, "কে দেব্‌তা, কে বাঁদর, সে আমি জানি। কিন্তু আর আমি কিছুই বল্‌ব না দিদি, যদি বলি ত এই যে, তোমার মত নিষ্ঠুর, তোমার মত বেহায়া মেয়েমানুষ আর সংসারে নেই।" বলিয়া সে প্রত্যুত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই জানালা বন্ধ করিয়া দিল।

সেই দিন, সন্ধ্যার প্রাক্কালে অর্থাৎ কর্ত্তারা ঘরে ফিরিবার সময়টিতে বড়বউ নিজের বাড়ীর উঠানে দাঁড়াইয়া দাসীকে উপলক্ষ করিয়া উচ্চকণ্ঠে তর্জ্জনগর্জ্জন আরম্ভ করিয়া দিলেন—"যিনি দিন-রাত্ত কচ্চেন, তিনিই এর বিহিত কর্‌বেন। মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ বেশী! আমার ভাইয়ের মর্ম্ম আমি বুঝিনে, বোঝে পরে! কখ্‌খন ভাল হবে না—ভাইবোনে ঝগড়া বাধিয়ে দিয়ে

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখ্‌লে ধর্ম্ম সইবেন না—তা' ব'লে দিচ্চি"—বলিয়া তিনি রান্নাঘরে গিয়া ঢুকিলেন।

উভয় যা'য়ের মধ্যে এই ধরণের গালিগালাজ, শাপশাপান্ত অনেকবার অনেক রকম করিয়া হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আজ ঝাঁজটা কিছু বেশী। অনেক সময়ে হেমাঙ্গিনী শুনিয়াও শুনিত না, বুঝিয়াও গায়ে মাখিত না, কিন্তু আজ নাকি তাহার দেহটা খারাপ ছিল, তাই উঠিয়া আসিয়া জানালায় দাঁড়াইয়া কহিল, "এর মধ্যেই চুপ কর্‌লে কেন দিদি? ভগবান্ হয় ত শুন্‌তে পান নি—আর খানিকক্ষণ ধ'রে আমার সর্ব্বনাশ কামনা কর,—বট্‌ঠাকুর ঘরে আসুন, তিনি শুনুন, ইনি ঘরে এসে শুনুন,—এর মধ্যেই হাঁপিয়ে পড়্‌লে চল্‌বে কেন?"

কাদম্বিনী উঠানের উপর ছুটিয়া আসিয়া মুখ উঁচু করিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন, "আমি কি কোন সর্ব্বনাশীর নাম মুখে এনেচি?" হেমাঙ্গিনী স্থিরভাবে জবাব দিল, "মুখে আন্‌বে কেন দিদি, মুখে আন্‌বার পাত্রী তুমি নও। কিন্তু তুমি কি ঠাওরাও, একা তুমিই সেয়ানা আর পৃথিবী-শুদ্ধ হ্যাকা? ঠেস্ দিয়ে দিয়ে কার কপাল ভাঙ্‌চ, সে কি কেউ টের পায় না?"

কাদম্বিনী এবার নিজমূর্ত্তি ধরিলেন। মুখ ভ্যাংচাইয়া হাত-পা নাড়িয়া বলিলেন, "টের পেলেই বা। যে দোষে থাক্‌বে, তারই গায়ে লাগ্‌বে। আর একা তুমিই টের পাও, আমি পাই নে? কেষ্টা যখন এলো, সাত চড়ে রা কর্‌ত না, যা বল্‌তুম, মুখ বুজে তাই কর্‌ত—আজ দুপুর বেলা কার জোরে কি জবাব দিয়ে গেল, জিজ্ঞাসা ক'রে ছাখো, এই প্রসন্নর মাকে"—বলিয়া দাসীকে দেখাইয়া দিল।

প্রসন্নর মা কহিল, "সে কথা সত্যি মেজবউ-মা। আজ সে ভাত ফেলে উঠে যেতে, মা বল্লেন, 'এই পিণ্ডিই না গিল্‌লে যখন যমের বাড়ী যেতে হবে, তখন এত তেজ কিসের জন্যে?' সে ব'লে গেল, 'আমার মেজদি' থাকতে কাউকে ভয় করিনে'।"

কাদম্বিনী সদর্পে বলিলেন, "কেমন হ'ল ত? কার জোরে এত তেজ শুনি? আজ আমি স্পষ্ট ব'লে দিচ্চি, মেজবউ, ওকে তুমি একশ বার ডেকো না। আমাদের ভাইবোনের কথার মধ্যে থেকো না।"

হেমাঙ্গিনী আর কথা কহিল না। কেঁচো সাপের মতন চক্র ধরিয়া কামড়াইয়াছে শুনিয়া, তাহার বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা রহিল না। জানালা হইতে আসিয়া চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল, কত বড় পীড়নের দ্বারা ইহাও সম্ভব হইতে পারিয়াছে।

আবার মাথা ধরিয়া জ্বর বোধ হইতেছিল, তাই অসময়ে শয্যায় আসিয়া নির্জ্জীবের মত পড়িয়াছিল। তাহার স্বামী ঘরে ঢুকিয়া, ইহা লক্ষ্য না করিয়াই ক্রোধভরে বলিয়া উঠিলেন, "বো-ঠানের ভাইকে নিয়ে আজ কি কাণ্ড বাধিয়ে ব'সে আছ? কারু মানা শুন্‌বে না, যেখানে যত হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া আছে, দেখ্‌লেই তার দিকে কোমর বেঁধে দাঁড়াবে, রোজ রোজ আমার এত হাঙ্গামা সহ্য হয় না মেজবউ। আজ বো-ঠান আমাকে না-হক্ দশটা কথা শুনিয়ে দিলেন।"

হেমাঙ্গিনী শ্রান্তকণ্ঠে বলিল, "বো-ঠান হক্-কথা কবে বলেন যে, আজ তোমাকে না-হক্ কথা বলেচেন?"

বিপিন বলিলেন, "কিন্তু, আজ তিনি ঠিক কথাই বলেচেন। তোমার স্বভাব জানি ত। সেবার বাড়ীর রাখাল ছোঁড়াটাকে

নিয়ে এই রকম করলে, মতি কামারের ভাগ্নের অমন বাগানখানা তোমার জন্যেই মুঠোর ভেতর থেকে বেরিয়ে গেল, উল্টে পুলিশ থামাতে একশ দেড়শ ঘর থেকে গেল। তুমি নিজের ভাল-মন্দও কি বোঝ না? কবে এ স্বভাব যাবে?"

হেমাঙ্গিনী এবার উঠিয়া বসিয়া, স্বামীর মুখপানে চাহিয়া কহিল, "আমার স্বভাব যাবে মরণ হ'লে, তার আগে নয়। আমি মা,—আমার কোলে ছেলেপুলে আছে, মাথার ওপর ভগবান্ আছেন। এর বেশী আমি গুরুজনের নামে নালিশ করতে চাইনে। আমার অসুখ করেচে—আর আমাকে বকিও না—তুমি যাও।" বলিয়া গায়ের র‍্যাপারখানা টানিয়া লইয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া পড়িল।

বিপিন প্রকাশ্যে আর তর্ক করিতে সাহস করিলেন না; কিন্তু, মনে মনে স্ত্রীর উপর এবং বিশেষ করিয়া ঐ গলগ্রহ হুর্ভাগাটার উপর আজ মর্ম্মান্তিক চটিয়া গেলেন।

আল্‌হাম্‌রা

কাজি ইম্‌দাদুল হক

[খুলনা জেলার অন্তর্গত মালেক-পরৈকাঠী গ্রামে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে খাঁ বাহাদুর কাজি ইম্‌দাদুল হক জন্মগ্রহণ করেন। বি.এ. এবং বি.টি. পাস করার পর ১৯০৬ সালে ইনি শিক্ষাবিভাগে নিযুক্ত হন এবং ১৯২৬ সালে যখন ইঁহার মৃত্যু হয় তখন ইনি ঢাকার ইন্টারমিডিয়েট ও সেকেণ্ডারি এডুকেশন বোর্ডের সেক্রেটারির পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি 'নবনূর,' 'ভারতী,' 'মোসলেম-ভারত' প্রভৃতি পত্রিকায় নিয়মিত লেখক ছিলেন এবং 'নব-কাহিনী,, 'প্রবন্ধমালা,' 'সরল সাহিত্য-সংগ্রহ' প্রভৃতি অনেকগুলি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন।]

তুষারাবৃত সিয়েরা নেভাডা (Sierra Nevada) গিরিশ্রেণীর পাদমূলে, বিশাল "ভেগা" (Vega) প্রান্তরের উপকূলে, গ্রাণাডা-রাজ্যের রাজধানী গ্রাণাডা মহানগরী অবস্থিত। ইহারই এক প্রান্তে মুর-কীর্ত্তিমুকুটের উজ্জ্বলতম রত্ন আল্‌হামরা প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার অভ্রভেদী চূড়া হইতে, বহুস্রোতস্বিনী-সলিল-ধৌত, দ্রাক্ষা-নারঙ্গ-কাননপূর্ণ, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিরশ্যামল কুসুমকুঞ্জ-সমন্বিত সেই বিস্তীর্ণ "ভেগা"র মনোহর শোভা নয়ন-গোচর হয়। সুশীতল মৃদুসমীরণ চিরহিমাবৃত "চন্দ্রগিরি"-শিখর হইতে অবতীর্ণ হইয়া, "ভেগা" খণ্ডের প্রফুল্ল কুসুমরাজির সৌরভ-ভার বহন করিতে করিতে লোহিত প্রাসাদের সুপ্রশস্ত গবাক্ষপথে যখন প্রবিষ্ট হয়, তখন নিদাঘপ্রখর উষ্ণ মধ্যাহ্নও মাধবী-সন্ধ্যার ন্যায় সুখশীতল হইয়া উঠে।

আল্‌হাম্‌রা প্রাসাদ একটী অসমতল উচ্চভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার চতুষ্পার্শ্বে অত্যুচ্চ দুর্ভেদ্য প্রাচীর, এবং স্থানে স্থানে দৃঢ় দুর্গদ্বারা সুসংরক্ষিত। উত্তরে দারো (Durro) নদী ইহার পাদদেশ ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। আল্‌হাম্‌রার অনেকগুলি প্রবেশদ্বার; তন্মধ্যে "ন্যায়দ্বার" সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। লোহিত এবং বাসন্তী বর্ণে সুরঞ্জিত একটী প্রকাণ্ড দুর্গভেদ করিয়া এই দ্বার আল্‌হাম্‌রার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। মূর-খলিফাগণ এই "ন্যায়দ্বারে" বিচারাসনে উপবিষ্ট হইতেন। এই পথে প্রাসাদে প্রবেশ করিলে, সম্মুখে একটী চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণ নয়নগোচর হয়। তাহার পর সুন্দর মার্টলপুঞ্জে সুশোভিত মার্টলপ্রাসাদ। এই রমণীয় প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইয়া একটী সঙ্কীর্ণপথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে, প্রায় শতহস্ত দীর্ঘ এবং তদর্দ্ধপরিমিত প্রস্থ একটী সুদৃশ্য প্রাঙ্গণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার মধ্যস্থলে সুবর্ণমৎস্যপরিপূর্ণ একটী জলাশয় আছে; এবং যখন বালসূর্য্যরশ্মিজাল সেই সকল ক্রীড়ারত মৎস্যগাত্র হইতে প্রতিফলিত হইতে থাকে, তখন এক অতি অনির্ব্বচনীয় দৃশ্য প্রকটিত হয়। নানাকারুকার্য্যখচিত এবং বিচিত্র চিত্রে শোভিত স্তম্ভসমূহে প্রাঙ্গণটী বেষ্টিত; ইহার উত্তরে চতুষ্কোণ কোমারিস দুর্গ ঊর্দ্ধমুখে গগনমণ্ডল চুম্বন করিতে উদ্যত হইয়াছে।

আল্‌হাম্‌রার এই অংশ প্রগাঢ় শান্তিময়; এত নিস্তব্ধ যে, বহির্জগতের অস্তিত্বমাত্রও এস্থানে অনুমিত হয় না। ক্ষুদ্র একটী জলস্রোত নিঃশব্দে অতি মৃদুগতি জলাশয়ে প্রবেশ করে এবং তদ্রূপ নিঃশব্দে ভিন্নপথে পুনরায় চলিয়া যায়। সমীরণের মৃদুতম একটি হিল্লোলও এ স্থানের লতাপত্রাদিকে এক বিন্দু কম্পিত

করিতে সাহসী হয় না; কীটপতঙ্গের উল্লাসরবের ক্ষীণতম একটী কম্পনও এ নীরবতা ভেদ করিতে পারে না,—এ স্থান এমনি নিস্তব্ধ। চারিদিক্ যেন একটি অচিন্তনীয় গম্ভীর স্তব্ধরাজ্য;—কিন্তু তাই বলিয়া এ নিস্তব্ধতার মধ্যে ধ্বংস ও মৃত্যুর নিদারুণ বিভীষিকার ছায়া অনুভূত হয় না। শতাব্দীর পর শতাব্দী জগতের শত শত কীর্ত্তিরাশি বহন করিয়া কালগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এ প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষও সেই প্রাচীন-কালের মাহাত্ম্য-মুকুট শিরে পরিয়া অদ্যাপি দণ্ডায়মান রহিয়াছে,—সে যেন সর্ব্বগ্রাসী কালের সহিত শত শত বর্ষ যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণের অস্তিত্বটুকু জ্ঞাপন করিবার জন্য সদা-সর্ব্বদা ব্যগ্র হইয়া রহিয়াছে।

রাজসভাগৃহে প্রবেশ করিলে মনে হয়, যেন অদূরে বহুকীর্ত্তিপ্রথিত মূর-সম্রাট্ রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া নীরবে আপনার প্রাচীন মহিমা বিস্তার করিতেছেন, এবং তাঁহার সভাসদ্‌গণ তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া তেমনি নীরবে তাঁহার পুরাতন কীর্ত্তিকলাপ সকরুণ ছন্দে গাহিয়া যাইতেছেন। সে কি অপূর্ব্ব গম্ভীর কল্পনাগর্ভ স্মৃতিবিদারক নিস্তব্ধতা। মুহূর্ত্তের জন্য সে চিত্র মানসচক্ষে অঙ্কিত করিলে, নিমেষমধ্যে শত শত বর্ষ পুরাতন মোস্‌লেমসৌভাগ্য-সূর্য্যের মধ্যাহ্নকিরণপ্রতাপে কল্পনা-প্রবণ অবশ-চিত্ত অভিভূত হইয়া যায়।

উপরোক্ত বিশাল প্রকোষ্ঠের প্রাচীরগাত্রে কারুকার্য্যখচিত নানাবর্ণের বহুমূল্য প্রস্তরসমূহ গ্রথিত রহিয়াছে; তদুপরি গগনস্পর্শী অর্দ্ধমণ্ডলাকৃতি ছত্রতল, সুচিত্রিত গ্রহতারাদি লইয়া যেন অনন্ত আকাশমণ্ডলের অনুকরণেচ্ছায় বিপুল দেহ বিস্তার

করিয়া রহিয়াছে। সুদৃশ্য সুপ্রশস্ত গবাক্ষশ্রেণী কক্ষটী আলোকিত করিতেছে। এই সকল গবাক্ষের মধ্যে প্রবাদ-নির্দ্দিষ্ট একটি গবাক্ষের নিকটবর্ত্তী হইয়া সম্মুখস্থ দারো নদীর স্থূল রজতরেখার উপর মুগ্ধদৃষ্টি ক্ষণকাল আবদ্ধ রাখিলে, স্মৃতি মন্থন করিয়া শত শত অতীত ঘটনার স্পষ্টচ্ছায়া চক্ষুর সম্মুখ দিয়া বহিয়া যায়। মনে হয়, পাঁচশত বর্ষ পূর্ব্বে বেগম আয়েষা তাঁহার শিশুপুত্র শাহজাদা আবু আবদুল্লাকে এই গবাক্ষপথে কৌশলে নিম্নে অবতারণ করাইয়া,—বুঝি সে অতুলনীয় রাজ্য-সম্পদ্ ভবিষ্যতে তাঁহারই দুই হাত দিয়া নষ্ট করাইবার জন্য—একদিন গুপ্তহন্তার হস্ত হইতে তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। আবার যখন মনে পড়ে, এই আবদুল্লাকে লক্ষ্য করিয়া সহৃদয় সম্রাট পঞ্চম চার্লস্ একদিন গভীর সহানুভূতির সহিত কহিয়াছিলেন,—"যাহার হস্ত হইতে এ অসীম সম্পদ্ চিরদিনের জন্য স্খলিত হইয়া গিয়াছে, হায়, সে কত না দুর্ভাগ্য!"—তখন দীর্ঘনিঃশ্বাস সহকারে বলিতে ইচ্ছা করে—"হায়, সেই গুপ্তহন্তার হস্তে কেন এ হতভাগ্য শিশুকালেই মৃত্যুমুখে পতিত হইল না!" আবার যখন মূর-সুলতানগণের সম্পদ্‌গৌরবের কথা চিত্ত হইতে ক্রমে অপসৃত হইয়া, পরবর্ত্তী ইসাই রাজত্বকালের দুই একটি চিত্র উদিত হইতে থাকে, তখন সহসা মনে পড়িয়া যায়, স্বনামধন্য মহাত্মা কলম্বস্ তাঁহার কল্পিত নূতন পৃথিবী আবিষ্কারার্থ একদিন রাণী ইসাবেলার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু বিফলমনোরথ হইয়া কোন বিদেশীয় সহৃদয় নরপতির নিকট আবেদন করিবার কথা কল্পনা করিতে করিতে ফিরিয়া যাইতেছিলেন, সে-ও ত এই ঐতিহাসিক গবাক্ষেরই সম্মুখ দিয়া!

অপ্রশস্ত ঘূর্ণিত সোপানপথে উল্লিখিত প্রকোষ্ঠের উচ্চ শিখর-দেশে আরোহণকালে মনে হয়, ভেগা-প্রান্তরে কোন যুদ্ধ হইবার সময়ে সৈন্যগণের গতিবিধি-দর্শনমানসে কত সুন্দরী রাজকন্যা এবং কত বীরশ্রেষ্ঠ রাজপুত্র এই সোপান অতিক্রম করিয়া প্রাসাদ-শীর্ষে আরোহণ করিতেন, আর সুন্দরীগণের সুকোমল চরণস্পর্শে সেই সোপানাবলী কত মৃদুমধুর শব্দ করিত এবং বীরপুরুষগণের পদভরে কিরূপ গৌরবান্বিত হইত। শীর্ষদেশ হইতে ভেগার বিশালবক্ষে দৃষ্টি স্থাপিত করিলে, তাহার কোন্ কোন্ অংশে পুরাকালে ইসাই এবং মোস্‌লেমগণ আল্‌হাম্‌রার অধিকার লইয়া বারবার সমরে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা প্রবাদবাক্য-দ্বারা নির্দ্ধারিত করিবার জন্য চিত্ত ব্যগ্র হইয়া উঠে। সঙ্গে সঙ্গে সেই বহুপুরাতন জনশ্রুতিগুলি স্মরণ করাইয়া দেয় যে, রাণী ইসাবেলা একবার কলম্বসের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া, পুনরায় তাঁহাকে ডাকিয়া আনাইবার জন্য যে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, সে ত ঐ স্থানে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়া, দেশত্যাগোন্মুখ ভগ্নহৃদয় কলম্বস্‌কে ফিরাইয়া আনিয়াছিল। প্রচলিত প্রবাদ মাত্রেই এই সকল ঐতিহাসিক স্থান চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছে; কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? এই কিংবদন্তীগুলি আল্‌হাম্‌রার এক একটী প্রধান অঙ্গ-স্বরূপ; কেননা ইহারা আল্‌হাম্‌রার অনন্ত সৌন্দর্য্য একটী কল্পনা-মুখর গাম্ভীর্য্যে, এবং একটী বিচিত্র রহস্যময় ইন্দ্রজালে মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে।

অতীত স্মৃতির এই প্রিয় নিভৃত আবাসভূমি পশ্চাতে রাখিয়া আল্‌হাম্‌রার আরও অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে, মুর-সুলতানাগণের অন্তঃপুর প্রাপ্ত হওয়া যায়। তত্রত্য গবাক্ষপথে ভেগা-প্রান্তরের

নয়নাভিরাম শ্যামল শোভা, দূরত্বনিবন্ধন অধিকতর মনোহর বলিয়া অনুভূত হয়। এ অন্তঃপুরের কক্ষগুলির তলদেশ তুষারধবল মর্ম্মরে মণ্ডিত। ইহার প্রত্যেকটীর দ্বারসন্নিধানে কক্ষতলে কতকগুলি করিয়া সঙ্কীর্ণ ছিদ্র আছে। শুনা যায়, ইহার নিম্নদেশে নানাজাতীয় গন্ধদ্রব্য প্রজ্জ্বলিত হইত এবং তদুত্থিত সুরভি ধুম্ররাজি ঐ সকল রন্ধ্রপথে সুলতানাগণের কক্ষসমূহে প্রবিষ্ট হইয়া, সমস্ত অন্তঃপুর এক স্বর্গীয় পরিমলে আমোদিত করিয়া তুলিত। এই প্রবাদ হইতে প্রাচীন মূরজাতির বিলাসিতার কথঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রত্যেক কক্ষে একখানি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড হইতে খোদিত এক একটী স্নানাগার সংলগ্ন আছে; এগুলি বিচিত্র বর্ণে ও কারুকার্য্যে সুচিত্রিত এবং গোলাপ ও নক্ষত্রাকৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গবাক্ষপথে আলোকিত। অন্তঃপুরের মধ্যে একটী কুসুমিত-লতাগুল্মশোভিত প্রস্তরময় ক্ষুদ্র প্রাঙ্গন দৃষ্ট হয়। ইহারও একপার্শ্বে কতকগুলি স্নানাগার রহিয়াছে। এই স্নানাগারগুলিতে যে চিত্রনৈপুণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা অতীব বিস্ময়জনক। সুলতানাদিগের স্নানকালে এবং স্বর্ণশয্যায় বিশ্রামকালে তাঁহাদিগের চিত্তবিনোদনার্থ যখন গীতবাদ্য হইত, তখন এই প্রাঙ্গনমধ্যস্থিত একটী উৎস হইতে তাহার সহিত তালে তালে শ্রুতিমধুর সলিল-কল্লোল উত্থিত হইত।

আল্হাম্‌রার সিংহপ্রাসাদই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও প্রসিদ্ধ। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যত সৌন্দর্য্য যেন তিল তিল করিয়া এই প্রাসাদে মাখাইয়া রাখিয়াছে। পূর্ব্ব-বর্ণিত মার্টলপ্রাসাদ অপেক্ষা ইহার আয়তন কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্রতর। ১২৮টী মর্ম্মরস্তম্ভে সিংহপ্রাসাদ সুশোভিত। ইহার প্রাঙ্গনে একটী বৃহৎ শুভ্রজলপাত্রের উপর

দ্বাদশটী সিংহের প্রস্তরমূর্ত্তি সজ্জিত রহিয়াছে বলিয়া ইহার নাম সিংহ-প্রাসাদ। এক সময়ে এই দ্বাদশটী সিংহমুখনিঃসৃত সুবাসিত সলিলে শূন্যপাত্রটী সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকিত। অন্যগুলির ন্যায় এ প্রাসাদ তেমন উচ্চ না হইলেও, ইহার বিচিত্র নির্ম্মাণপ্রণালী, অমলধবল স্তম্ভশ্রেণীর গঠনপারিপাট্য এবং সুনিপুণ শিল্পী-চিত্রিত স্বর্ণ ও অন্যান্য বিবিধ বর্ণের চিত্ররাজির ধ্বংসাবশেষেরও অদ্ভুত পরিস্ফুটত্ব, প্রথম দর্শনে ইহাকে কল্পনাসর্ব্বস্ব কবির স্বপ্নদৃষ্ট কোন পরীরাজ্যের সুন্দরী রাজকন্যাদিগের বিলাসপ্রাসাদের ছায়ামাত্র বলিয়া সহসা ভ্রম জন্মাইয়া দেয়!

দেশের সেবা

অনুরূপা দেবী

[অনুরূপা দেবী সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র রায় মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় বাহাদুরের কন্যা। ইনি বাল্যে পিতামহ ও পিতার নিকটে সংস্কৃত কাব্য ও দর্শনাদি শিক্ষা করেন। ইঁহার স্বামী উত্তরপাড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত শিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবর্ণপদকধারী, গণিত-শাস্ত্রে প্রগাঢ় পণ্ডিত ও মজঃফরপুরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারাজীব। ইনি স্বামীর নিকটে ইংরাজী কাব্য-সাহিত্যাদিতে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এইরূপে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য বিদ্যায় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া ইনি বঙ্গবাণীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ইনি বহু উপন্যাস ও গল্পের রচয়িত্রী হইলেও, ধর্ম্মতত্ত্ব, সমাজ প্রভৃতি নানা-বিষয়ক যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া সাহিত্যে যশোভাগিনী হইয়াছেন। ইঁহার প্রণীত উপন্যাসগুলির মধ্যে 'মন্ত্রশক্তি,' 'মা', 'পোষ্যপুত্র,' 'বাগ্‌দত্তা,' 'গরীবের মেয়ে,' 'পথের সাথী,' 'পথহারা,' 'বিবর্ত্তন,' 'মহানিশা' প্রভৃতি সর্ব্বজন-প্রিয় সুপরিচিত গ্রন্থ; ইহাদের মধ্যে কয়েকখানি নাটকাকারে রূপান্তরিত হইয়াছে।]

বারীৎপুর একখানি গ্রাম হইলেও, নিতান্ত গণ্ডগ্রাম নহে। গঙ্গাতীর হইতে ইহার শোভাটীও নেহাৎ হতশ্রী দেখায় না। গ্রামের মধ্যে দুচার ঘর মধ্যবিত্তের বাস থাকায়, এই গ্রামে একটী স্কুল, একটী ছোট গোছের লাইব্রেরী, ও সম্প্রতি গ্রামের মেয়েদের জন্য একটী বালিকা-বিদ্যালয়ও সংস্থাপিত হইয়াছে। রামদয়াল গুপ্ত পুরুষানুক্রমে এই গ্রামেই বাস করিয়া আসিতেছেন। সাধারণের সকল কার্য্যে,—যেমন, স্কুল-সংস্থাপন ও পরিচালনে, লাইব্রেরী-স্থাপনায়, মিউনিসিপ্যাল যে কোন ব্যাপারে—সকল বিষয়েই

খাবদয়াল অগ্রণী ছিলেন। এর জন্য, এবং সংসারের নানাবিধ ব্যয়বাহুল্যে, পয়সা খরচ তাঁহাকে কম করিতে হয় নাই। এইভাবে তাঁহার স্বল্প সঞ্চয় নিঃশেষ হইয়াছিল।

গ্রামের একজন জমিদার ছিলেন। বহুকাল তিনি অন্যান্য জমিদার-জাতীয় জীবদিগের মতই অসভ্য পল্লীজীবনের মায়া কাটাইয়া সহরবাসী। তাঁদের পুরানো ফ্যাসানের বৃহৎ অট্টালিকাটার সদর দেউড়ী খোলা থাকিলেও, ভিতরে একটী দুঃস্থ আত্মীয় ব্যতীত আর বড় কেহ থাকিত না। এই পরিবারটীর দারিদ্র্য-খ্যাতি এ অঞ্চলের মধ্যে সর্ব্বশ্রুত ব্যাপার। জমিদার-গৃহে বাস করিয়াও উহারা একাহারী, অনাহারী থাকিয়া দিনপাত করিতেছেন—সে কথা গোপন করিবার কোন প্রয়োজন বোধ করিতেন না।

একদা বহুকালবিস্মৃত পিতৃ-ভূমে এক জমিদার-পুত্রের আবির্ভাব হইল। দেশের লোক কৌতূহলী হইয়া ভিড় করিল; কিন্তু বিরক্তি ও নৈরাশ্য লইয়া ফিরিয়া গেল। জমিদার-পুত্রের চেহারাটা ছাড়া, আর কোনখানটাতেই তাহার জমিদারত্ব ব্যক্ত হইতেছিল না। ছেলেটীর ঘাড় চাঁচিয়া কামানো,—সামনে কোঁকড়া চুলের সুন্দর স্তর।—উজ্জ্বল চক্ষু সোনার বাঁধনে বাঁধা চশমায় মণ্ডিত।—গায়ে সাদাসিদা পিরান ও ধুতী। সে আসিয়া বড়রকম একটা ভোজ দিল না;—খাজনা মাপ দিল না। এক-দিন লাইব্রেরীর বারান্দায় লোক জড়ো করাইয়া, সবার নিকট—কলিকাতায় যেখানে সে নিজে থাকে, সেইখানেরই কি একটা অজ্ঞাত প্রয়োজন-সাধনের নিমিত্ত যে সভা তাহারা করিয়াছে (যাহার সঙ্গে এ গ্রামের কোনই লাভ-ক্ষতির সম্বন্ধ জড়িত নয়),

তাহারই জন্ত—চাঁদার বহি বাহির করিয়া ধরিল। গ্রাম্য-বৃদ্ধগণ প্রকাশ্রে নিন্দা করিলেন, অপ্রকাশ্রে গালি দিলেন। যুবার দল কেহ-বা চাঁদা দিয়া জমিদারের সহিত সখ্য করিল, কেহ-বা জমিদারের সঙ্গে এবং তাঁর সঙ্গীদের সহিত বচসা আরম্ভ করিয়া দিল। জমিদার নিজে আসিয়া বলিলেন, "এ দেশের কাজ,—এতে সকলে যোগ না দিলে পাপ হইবে। অতএব তোমাদের আত্মার কল্যাণের জন্যই তোমাদের ইহাতে যোগ দিতে ডাকিতেছি।"

উহারা বলিল, "দেশের যদি কাজ হইত, তাহা হইলে দেশ ইহার ফলভাগী হইত। তোমার কলিকাতার রাস্তায় গিয়া তুমি হাত-পা নাড়িয়া বক্তৃতা করিবে, তাহাতে কি আমার ঘরে অর্থ আসিবে, না আমার গ্রামের ম্যালেরিয়া দূর হইবে, না ভাত-কাপড় সস্তা হইবে?" জমিদার ঘৃণার সহিত হাসিয়া বলিলেন, "দেশের আইডিয়াটাই তোমাদের কত ক্ষুদ্র! দেশ বলিতে কি এই গ্রামখানিই বুঝায়? সমস্ত ভারতবর্ষই তো আমার দেশ! ভারতলক্ষ্মী আমার দেশ-মাতা। শুধু গ্রামের উন্নতি, ঘরের উন্নতি খুঁজিলে দেশের কার্য্য করা হয় না। আমাদের এখন স্বরাজ চাই, স্বাধীনতা চাই, নিজেদের সব স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া, ঐ বিষয়ে চেষ্টা করিতে হইবে।"

অপর পক্ষ চটিয়া বলিল, "রেখে দাও তোমার স্বরাজ! রেখে দাও তোমার স্বাধীনতা! নিজের গাঁয়ের ভিটে মাটি হ'চ্চে। গাঁয়ে খাবার জলের অভাবে লোকে পচা জল খাচ্চে। মড়কে মানুষ ম'রে গ্রাম শ্মশান হ'চ্চে।—একটা ডাক্তারখানা নেই, অতিথিশালা নেই,—এইটুকুই পেরে ওঠেন না, আর উঁরা

সমস্ত ভারতবর্ষকে স্বাধীন করবেন! সে অমনি ছেলের হাতের মোয়া কি না?”

জমিদারের দল উত্তেজিত হইয়া জবাব দিল, “ছোট কাজ করবার অবসর অনেকেরই হয়। একটা মহত্তর ব্যাপার সংঘটিত ক'রে তোলা মুখের কথা নহে। আগে স্বরাজ আদায় হ'ক, এসব তখন আপনিই ঘ'টে যাবে।”

বিপক্ষগণ এ কথা মানিতে চাহিল না। তাহারা সেকালের নিরাড়ম্বর দেশ-প্রীতির দু'একটা উদাহরণ দিতে বসিয়া গেল,— যখন সভা-সমিতির খুব জাঁক ছিল না, কিন্তু কাজ ছিল—ধর্ম্মের নামে জনহিতকর কার্য্য হইত—জমিদারের বাড়ীতে চিকিৎসালয়, অনাথাশ্রম থাকিত—নিত্য নিত্য ক্রিয়া-কলাপে গরীব-সাধারণ ভালমন্দ খাইতে পাইত—পুণ্যের লোভে লোকে পুষ্করিণী-প্রতিষ্ঠায় উত্তম পান-জলের ব্যবস্থা করিত—বৃক্ষ-ছায়ায় পথিকের তাপ দূর করিত। কেহ কেহ দৃষ্টান্ত-স্বরূপ এই গ্রামেরই রামদয়াল গুপ্তের নাম করিল; বলিল, “এখনও তো ঐ একটা বৃদ্ধ বেঁচে রয়েছেন। কোন ধূমধাম না ক'রেই সকল ভাল কাজের মধ্যে আছেন: স্কুল চাই? আচ্ছা, স্কুল নাও। পুকুর ম'জে উঠেছে? আচ্ছা, কাটিয়ে দিচ্ছি। রাস্তা বে-মেরামত? তৈরি হ'ল।— তা যতটা শক্তি—অর্থ দিয়ে, যতটা শক্তি—সামর্থ্য দিয়ে, আর যতটা পারা যায়—দৃষ্টান্তে ও মিষ্টি কথায় পাঁচজনের মন ভুলিয়ে। একেই বলি দেশের কাজ! প্রত্যেক গ্রামে প্রত্যেক পল্লীতে যদি এরই অনুকরণ হয়, তবেই ত দেশে স্বরাজ-প্রতিষ্ঠা আপনি হবে।”

নবীন জমিদার দল-বলকে বলিয়া দিল, “ওহে, রামদয়ালের

কাছে গেলে, হয় ত বেশ বড় রকম একটা চাঁদা আদায় হবে। তা'ছাড়া, ধ'রে ক'রে পাঁচজনের কাছে থেকেও কিছু কিছু—"

বৃদ্ধ জীর্ণ রামদয়ালের সহিত এই নবীন, এবং জীবনের উদ্দাম-চাঞ্চল্যে সতেজ, তরুণটির অনেক কথাই হইল। রামদয়াল উহার চাঁদার খাতায় সহি দিলেন না; তবে সঙ্গে-সঙ্গেই পঁচিশটি টাকা নগদ গণিয়া উহার হাতে দিলেন। ছেলেটী খুৎ খুৎ করিয়া জানাইল, তাঁহার বদান্যতা-সম্বন্ধে সে এর চাইতে ঢের বেশী গুজব শুনিয়াছিল। রামদয়াল ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "লোকে সাধারণতঃ একটু বেশি করিয়াই বলিয়া থাকে। আপাততঃ এখানে একটী মেয়ে-স্কুল করিবার কল্পনা আছে; সেজন্যও কিছু টাকা খরচের প্রয়োজন। গ্রামের কাজ ফেলিয়া গ্রামান্তরের কাজে হাত দেওয়া, তাঁহার মতে একটুখানি অসঙ্গত,—অবশ্য যদি সেটা বেশী প্রয়োজনীয় না হয়।"

ছেলেটী বুঝিল, ইতঃপূর্ব্বে যারা এই গ্রাম্য-প্রীতি লইয়া তর্ক করিয়াছিল, তাহারা এই বৃদ্ধ ব্যক্তিটিরই ছাত্র। কিছু বিরক্ত হইয়া কহিল, "দেখুন 'আইডিয়াল'টা (আদর্শ) একটু 'হাই' (উচ্চ) হওয়ায় দোষ কি? এই যে সব সঙ্কীর্ণ মতগুলা আপনারা প্রচার ক'রে থাকেন, দেশের এই নূতন উদ্যমের দিনে এটা কি ভাল?"

দয়াল বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্‌টা?"

ছেলেটী উত্তর করিল, "এই—গ্রামকেই সর্ব্বস্ব মনে করা? এক ত আমাদের দেশের লোকে এ-পাড়া থেকে ও-পাড়া যাওয়াকে 'বিদেশ যাত্রা' মনে করে; নিজ শ্রেণীর বাইরেই ব্রাহ্মণে-ব্রাহ্মণে এক পংক্তিতে খায় না,—ব্রাহ্মণ-কায়স্থে ত কথাই

নাই। এখনও যদি আপনারা, এই সব জটিল এবং কুটিল শিক্ষার কুহক থেকে দেশকে মুক্তি দেবার চেষ্টা না ক'রে, তাকে এক বিশাল ভারতবর্ষ—এক বৃহত্তম ভারতীয় নেশনে পরিপূর্ণিত হ'তে না দিয়ে, শুধু নিজের পরিবারে—স্ব-গ্রামে বদ্ধ রাখ্‌তে চান, তা'হলে আমাদের স্ব-রাজ প্রাপ্তির আশা কি শুদ্ধ আকাশ-কুসুমেই পর্য্যবসিত হবে না?"

বৃদ্ধ ব্যক্তিটী কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করিয়াছেন, এমন বোধ হইল না। মৃদুহাস্যে তাঁহার শীর্ণ মুখে এক অপূর্ব্ব আলোক-দ্যুতি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি তরুণের আবেগোত্তেজিত, আরক্ত সুন্দর মুখের পানে চাহিয়া স্নেহ-মধুর কণ্ঠে কহিলেন, "বাবা, তুমি যা বল্‌ছো, সব ঠিক। কিন্তু নিজের পরিবারকে—স্ব-গ্রামকে যদি দুর্দ্দশার মধ্যে ফেলে রাখ্‌তে চাও, তা'হলে তোমার স্ব-রাজকে তুমি প্রতিষ্ঠা করবে কোন্ সহরের কোন্ টাউন হলে? প্রত্যেকে যদি তোমরা তোমাদের দরিদ্র আত্মীয়ের, দরিদ্র মূর্খ প্রতিবেশীর অজ্ঞতা, রোগ, অভাব বিদূরিত করবার জন্য বদ্ধপরিকর হও,—যদি জাতিকে শিক্ষা দান কর, নৈতিক চরিত্রে উন্নতি দানের চেষ্টা কর,—যদি তাদের মানুষ ক'রে গ'ড়ে নেবার জন্য আত্মোৎসর্গ কর,—যে ম্যালেরিয়া সোনার বাংলাকে যমের দক্ষিণ দুয়ারে পরিণত ক'রে তুলছে, তার উচ্ছেদকেই যদি জীবনের প্রধান তপস্যা ক'রে তোল,—যদি পাশ্চাত্ত্য শক্তির সঙ্গে প্রাচ্যের ধর্ম্মপ্রাণতায় নিজেদের অলঙ্কৃত ক'রে তোল,—তা'হলে তার চেয়ে বড় স্ব-রাজ আর কে কোথায় পেয়ে থাকে?"

পাষাণের কথা

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

[১২৯২ সালে (১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে) রাখালদাস জন্মগ্রহণ করেন। অতি অল্প বয়সেই ইনি ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের চর্চ্চায় নিযুক্ত হন। মুদ্রাতত্ত্ব ও প্রত্নলিপিতত্ত্ব, এই দুই বিষয়ে ইঁহার অসামান্য প্রতিভা ও অভিজ্ঞতা ছিল। কয়েক বৎসর যাবৎ ইনি ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সহকারী পরিদর্শক-পদে নিযুক্ত ছিলেন। মোহেন্-জো-দড়োর আবিষ্কার ইঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। বাঙ্গালা ও ইংরাজীতে ইনি বহু গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। ইঁহার রচিত 'The Palas of Bengal' নামক গ্রন্থ কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে এবং 'History of Orissa' নামক গ্রন্থ প্রবাসী প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। 'পাষাণের কথা' ইঁহার রচিত প্রথম বাঙ্গালা গ্রন্থ। ইঁহার 'বাঙ্গালার ইতিহাস' বাঙ্গালা ইতিহাস-সাহিত্যের একখানি মূল্যবান্ গ্রন্থ। ইঁহার 'প্রাচীন মুদ্রা' পুস্তকে ভারতীয় প্রাচীন মুদ্রাতত্ত্বের বিবরণ বিশেষ পাণ্ডিত্য-সহকারে প্রদত্ত হইয়াছে। ইঁহার 'শশাঙ্ক' ও 'ধর্ম্মপাল' বাঙ্গালা ঐতিহাসিক উপন্যাসকে এক নূতন রূপ দান করিয়া সুধীসমাজে প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে। ১৩৩৭ সালে ইনি ইহলোক ত্যাগ করেন।]

আমার সময়ের ধারণা নাই, সুতরাং আমার জন্ম-মুহূর্ত্ত হইতে কত কাল অতীত হইয়াছে তাহা আমি বলিতে পারি না। যতদূর স্মরণ আছে তাহাই বলিতেছি। শৈশবের কথা এইমাত্র মনে পড়ে যে, প্রশস্ত সমুদ্রসৈকতে আমি ও আমার ভ্রাতৃবর্গ খেলা করিয়া বেড়াইতাম—বায়ুভরে উড়িয়া যাইতাম, ঘূর্ণবাত্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতাম; কখন বা সমুদ্রের জলে পতিত হইতাম; জল সরিয়া গেলে—ভূমি শুষ্ক হইয়া গেলে পুনরায় ফিরিয়া আসিতাম। সে সমুদ্রের বিশালতা ধারণা করিবার শক্তি তোমাদের নাই;

সে সমুদ্রসৈকতের বিস্তৃতি তোমাদিগের মহাপ্রদেশ-সমূহের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা অধিক। যে সকল জলজন্তু সেই মহাসমুদ্রে বাস করিত, যৌবনের মূর্চ্ছাভঙ্গের পর তাহাদিগকে আর দেখি নাই। আমার শৈশবে আমি একবার মূর্চ্ছিত হইয়াছিলাম। মূর্চ্ছাভঙ্গে দেখি, আমি যৌবনপ্রাপ্ত হইয়াছি। শুনিয়াছি, তোমাদিগের এই সংগ্রহ-শালায় সেই মহাসমুদ্রের জীবজন্তুর অস্থি আছে। কিছুকাল পূর্ব্বে শ্বেতকায়, বিরলকেশ একজন সাধক পর্ব্বত ভেদ করিয়া সেই সকল জীবজন্তুর অস্থি লইয়া আসিয়াছিলেন।

কতদিন সমুদ্রসৈকতে উড়িয়া বেড়াইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। অবস্থান্তরপ্রাপ্তির পূর্ব্বের কথা সামান্যমাত্র আমার মনে পড়ে। একদিন মধ্যাহ্নে প্রখর সূর্য্যতপ্ত বায়ু আমাকে অপর কতকগুলি বালুকণার সহিত সমুদ্রবক্ষে নিক্ষেপ করিয়াছিল। সে দিন যত দূরে আসিয়া পড়িয়াছিলাম, জীবনে আর কোন দিন তত দূর আসিতে পারি নাই। আমার জীবনযাত্রায় সেই প্রথম পাদক্ষেপ। সে দিন বুঝিতে পারি নাই যে, পরে অতীতকালের সাক্ষিস্বরূপ বহুযুগের ইতিহাস বহন করিয়া আমাকে সংগ্রহশালায় আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইবে। সে দিন যে স্থানে আসিয়াছিলাম, সে স্থান হইতে সমুদ্রের জল সরে না, সুতরাং শৈশবের আবাস-ভূমি আর কখনও দেখি নাই।

সমুদ্রগর্ভে অপরাপর বালুকণার সহিত বহুকাল বাস করিয়াছি। কত অপরূপ জলজন্তু আমাদের বক্ষের উপর দিয়া চলিয়া যাইত। আমরা তাহাদের জন্মমৃত্যু দেখিতাম। বালুকাময় সমুদ্রগর্ভে তাহাদের জন্ম হইত। তাহারা আমরণ সেই বালুকাক্ষেত্রেই বাস করিত। জীবনান্তে তাহাদের অস্থিগুলি

শুভ্র বালুকাক্ষেত্রটিকে শুভ্রতর করিয়া তুলিত। সেই সকল অস্থি তোমাদের অতীত জীববিদ্যার মূল। তোমরা সেই যুগের কোন জীবেরই সমগ্র কঙ্কাল সংগ্রহ করিতে পার নাই, একখানি দুইখানি অস্থি লইয়া তোমরা অতীত যুগের জীবনের চিত্র অঙ্কিত করিতে চাহ; কিন্তু তাহা হয় না। অতীতের সাক্ষী, আমি—সেই সকল জীব দেখিয়াছি। আমি তাহাদিগকে স্পর্শ করিয়াছি; তাহাদিগের জীবনের প্রারম্ভ হইতে তাহাদিগের চৈতন্যের শেষ সীমা পর্য্যন্ত তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়াছি; জীবনান্তে বহুযুগ তাহাদের অস্থিনিচয় বক্ষে ধারণ করিয়াছি —আমি বলিতেছি, তাহা হয় না। তোমরা অতীত যুগের জীবনসমূহের যে চিত্রাবলী রাখিয়াছ তাহা হাস্যোদ্দীপক। বালুকণার যদি উচ্চহাস্য করিবার ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে আমার উচ্চহাস্যে তোমাদের এই গৃহ ধ্বনিত হইয়া উঠিত। আমি দেখিয়াছি, আমার স্মরণ আছে, কিন্তু আমার মনের ভাব প্রকাশ করিবার ক্ষমতা নাই, তোমাদের মত বলিবার বা লিখিবার ক্ষমতা নাই, সুতরাং সব জানিয়াও আমার কিছু বলা হইল না।

সমুদ্রগর্ভস্থ বালুকাক্ষেত্রে কত দিন বাস করিয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না; কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার সময়ের ধারণা নাই। শৈশবে যে আমার মূর্চ্ছা হইয়াছিল তাহাও পূর্ব্বে বলিয়াছি। একদিন সূর্য্যাস্তকালে কোন দারুণ আঘাতে সমুদ্রগর্ভ বিদীর্ণ হইয়া গেল, গভীর আলোড়নে বিশাল জলরাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, বহু জলজন্তুর জীবনান্ত হইল—আমি মূর্চ্ছিত হইলাম। তাহার পর কালপ্রবাহ কি ভাবে কতদূর

অগ্রসর হইয়াছিল, তাহা কেমন করিয়া বলিব? অজ্ঞান অবস্থায় আমি যেন অত্যন্ত ক্লেশ অনুভব করিতাম, যেন দুর্ব্বিষহ যাতনা অনুভূত হইত, বোধ হইত যেন কেহ ভীষণ বলে আমার ক্ষুদ্র দেহখানি ক্ষুদ্রতর করিবার চেষ্টা করিতেছিল। এতদ্ব্যতীত আর কিছুরই স্মরণ নাই। মূর্চ্ছাভঙ্গে দেখি, অজ্ঞাত শক্তির প্রয়োগে বালুকাক্ষেত্রে বিষম বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। সেই সমুদ্রসৈকত, সেই বিশাল জলরাশি, সেই সব জীবজন্তু, উদ্ভিদ্ সমস্তই অন্তর্হিত হইয়াছে। সে জগৎ আর নাই; অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে লক্ষ লক্ষ বালুকাকণা একত্র হইয়া রক্তবর্ণ প্রস্তরে পরিণত হইয়াছে, —আমার স্বাধীনতা লুপ্ত হইয়াছে।

চেতনার প্রারম্ভে দেখিলাম, নূতন জগতে তৃণশষ্প, তরুলতা, জীবজন্তু প্রভৃতি সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সে নূতন জগতের আকার অনেকটা বর্ত্তমান জগতের স্থায়। তাহার পর স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন হইয়াছে মাত্র। আমি তখন যে প্রস্তরখণ্ডের দেহে লীন হইয়াছিলাম, মূর্চ্ছা-অবসানে দেখি, তাহার দেহ স্নিগ্ধ শ্যামদূর্ব্বাদলে আচ্ছাদিত; নূতন আকারের চতুষ্পদ জীব তাহার উপরে বিচরণ করিতেছে। সময়ে সময়ে মসীকৃষ্ণবর্ণ ছাগ-চর্ম্মাচ্ছাদিত তোমাদের স্বশ্রেণীর জীবগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিত। তাহারা নখ, দন্ত বা উপলখণ্ডের সাহায্যে চতুষ্পদ জীবগুলিকে জয় করিবার চেষ্টা করিত ও লোকবলের আধিক্যে অনেক সময় তাহাদিগকে নিধন করিতে সমর্থ হইত; কিন্তু কখনও কখনও শৃঙ্গের তাড়নায় পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতেও বাধ্য হইত। আমার নিকটে ইহাই মানব-জীবনের ইতিহাসের সূত্রপাত। মনুষ্য আমার নিকটে তখন নবজাত জীব।

আমি যখন জ্ঞানলাভ করি তখন মনুষ্যজাতি উন্নতির পথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াছে, সুতরাং মনুষ্য-জীবনের প্রারম্ভের কথা বলিতে আমি অক্ষম। আমি সর্ব্বপ্রথমে মনুষ্যজাতীয় যে সকল জীব দেখিয়াছিলাম, তাহারা অত্যন্ত খর্ব্বাকৃতি ছিল এবং মৃগয়াই তাহাদিগের উপজীবিকা ছিল বলিয়া বোধ হইত। শুনিয়াছি, তদ্বংশীয়েরা দক্ষিণ-সমুদ্রের উপকূলে অদ্যাপি বাস করিয়া থাকে। অপেক্ষাকৃত বলবান্ জাতি-কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া তাহারা এখন বৃক্ষশাখা আশ্রয় করিয়াছে; বৃহদাকার জন্তুর অভাবে তাহারা কীটপতঙ্গ প্রভৃতির দ্বারা জঠরানল নিবৃত্তি করিয়া থাকে। ইহারাই এই দেশের প্রকৃত অধিপতি, কারণ মনুষ্য-জীবনের প্রারম্ভে ইহারাই শুষ্ক ভূমির এই অংশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। পরে তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ প্রভৃতি যে সকল জাতি আসিয়া এ দেশে বাস করিতেছে তাহারা সকলেই দস্যু ও অধর্ম্মচারী। যে কৃষ্ণবর্ণ খর্ব্বকায় মনুষ্যজাতির কথা বলিলাম, তাহারা সংখ্যায় অত্যন্ত অল্প ছিল—শতাধিক ব্যক্তিকে কখনও একত্র হইতে দেখি নাই। তাহারা ধাতুর ব্যবহার জানিত না, শিলাখণ্ডই তাহাদিগের একমাত্র আয়ুধ ছিল। কিছুকাল পরে সে জাতীয় মনুষ্য এ প্রদেশ হইতে অন্তর্হিত হইল। তাহারা কোথায় গেল, কেন গেল, তাহা বলিতে পারি না, কারণ তখনও আমরা ভূগর্ভ-নিহিত ছিলাম। তোমরা অনুমান কর, সভ্যতর জাতি আসিয়া তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের সাহায্যে পূর্ব্বোক্ত কৃষ্ণবর্ণ খর্ব্বাকার মনুষ্যজাতির ধ্বংস-সাধন করিয়াছিল। তাহার কতকটা সত্য হইতে পারে, কারণ ইহার পরবর্ত্তী মনুষ্যেরা উজ্জ্বল ধাতুময় অস্ত্রের সাহায্যে মৃগয়া করিত।

একদিন একজন ঐরূপ অস্ত্রের সাহায্যে আমাদিগকে ভেদ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। দূরে পাটলীপুত্রবাসী ভিক্ষু-দত্ত যে স্তম্ভ দেখিতেছ, উহার একপার্শ্বে অদ্যাবধি সেই অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। পরে জানিয়াছি, ঐ ধাতু তাম্র। শুনিয়াছি, যে জাতীয় মনুষ্য তাম্রনির্ম্মিত অস্ত্র ব্যবহার করিত, তাহাদিগের বংশধরেরা বিস্তীর্ণ দাক্ষিণাত্যে এখনও বাস করিতেছে। তোমাদের সংগ্রহ-শালায় তাম্রনির্ম্মিত আয়ুধের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প, কিন্তু তুমি বোধ হয় এই জাতীয় অস্ত্র অনেক দেখিয়াছ। তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যখন লৌহনির্ম্মিত অস্ত্রের সাহায্যে ভারতবর্ষ অধিকার করেন, তখন পূর্ব্ববাসীরা তাড়িত হইয়া বিন্ধ্য পর্ব্বতের দক্ষিণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। ক্রমে বিজেতারাও লৌহ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাম্রের ব্যবহার রহিত হইয়া যায়। একদিন রাত্রিকালে তাম্রনির্ম্মিত অস্ত্রধারী কতকগুলি লোক আমাদের বক্ষের উপর আসিয়া কয়েক স্থানে অগ্নি প্রজ্বালিত করিল। বহুকাল পরে সেই দিন ঐ আলোক দর্শন করিলাম। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা যাহা বলিয়াছি তাহা পার্শ্ববর্ত্তী বালুকাকণার নিকট শুনিয়াছিলাম। অগ্নির সাহায্যে ক্রমে আমাদের বক্ষ ও পার্শ্বস্থিত তৃণক্ষেত্র ভস্মে পরিণত হইল। দারুণ উত্তাপে আমরা বিদীর্ণ হইয়া গেলাম ও জনগণ পলায়ন করিতে বাধ্য হইল। ক্ষণকাল পরেই শ্বেতবর্ণ, দীর্ঘকায়, সুদীর্ঘ পিঙ্গলবর্ণকেশধারী কতকগুলি মনুষ্য পার্শ্ববর্ত্তী বনভূমি হইতে নির্গত হইয়া আসিল। তাহারা আসিবামাত্র চতুর্দ্দিক হইতে কৃষ্ণবর্ণ তাম্রনির্ম্মিত অস্ত্রধারী পুরুষ তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। শ্বেতকায় ব্যক্তিগণ আত্মরক্ষার চেষ্টা না করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে অগ্নি

ও আকাশকে লক্ষ্য করিয়া নূতন ভাষায় গম্ভীর শব্দে কি বলিয়া গেল। সেই শব্দমালার গাম্ভীর্য্য এত অধিক যে, আক্রমণকারীদের মধ্যে কয়েকজন ভীত হইয়া পলায়ন করিল। শ্বেত-কৃষ্ণ মনুষ্যের বিবাদের ফলে আমি অগ্নির আলোক দর্শন করিলাম। পরে কতবার সেরূপ আলোক দেখিয়াছি, কতবার উজ্জ্বলতর অগ্নি আমার নিকট প্রজ্বালিত হইয়াছে, কিন্তু প্রথম সে আলোক দর্শনে যে আনন্দ তাহা পরে আর অনুভব করি নাই। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রজতশুভ্র বর্ম্মাবৃত, সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রধারী শ্বেতকায় সৈনিকগণ দলে দলে আসিয়া ভস্মরাশি বেষ্টন করিয়া ফেলিল—বিলাপে পর্ব্বতের সানুদেশ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। দলে দলে সৈনিকবর্গ কাষ্ঠ অন্বেষণে চলিয়া গেল। কেবল কয়েকজন মাত্র মৃতদেহের পার্শ্বে বসিয়া রহিল।

কিয়ৎকাল মধ্যে চিতাধূম গগন স্পর্শ করিল, অরণ্যবাসী শ্বেতকায় মনুষ্যগুলির দেহ ভস্মীভূত হইয়া গেল। দগ্ধাবশিষ্ট অস্থিগুলি একটি ক্ষুদ্র মৃন্ময় পাত্রে রক্ষিত হইল, দলে দলে শ্বেতকায় মনুষ্য আসিয়া তাহাতে পুষ্পবৃষ্টি করিয়া গেল। সন্ধ্যাকালে একটি শুভ্র দণ্ডের সহিত ভস্মাধারটি ভূগর্ভে প্রোথিত হইল। ইহার পর কয়েক দিবস চারি পার্শ্বের পর্ব্বতশ্রেণী হইতে গভীর আর্ত্তনাদ উত্থিত হইত। শুনিতে পাইতাম, কৃষ্ণবর্ণ মনুষ্যজাতির শোণিতে পর্ব্বতের সানুদেশ রঞ্জিত হইতেছে, ভীষণ প্রতিহিংসার প্রাবল্যে শ্বেতকায় সৈনিকগণ কৃষ্ণকায় জাতির ধ্বংস-সাধন করিতেছে, বৃদ্ধ ও বালক, স্ত্রী ও পুরুষ দলে দলে নিহত হইতেছে, পর্ব্বতের উপত্যকাগুলি ক্রমশঃ জনশূন্য হইতেছে। বায়ু আসিয়া ভস্মরাশিকে উড়াইয়া লইয়া গেল, ভস্মসিঞ্চিত ভূমির উর্ব্বরতা

বর্দ্ধিত হইল, অতি অল্পকালের মধ্যে উপত্যকা আবার নির্দ্দাম বনরাজিতে আবৃত হইল। ইহার পর আমরা আর সর্ব্বদা মানুষের মুখ দেখিতে পাইতাম না, কৃষ্ণকায় মনুষ্যেরা অতি সাবধানে মৃগয়া করিতে আসিত, অধিক সংখ্যক কৃষ্ণকায় মনুষ্য আর কখনও দেখি নাই। কখন অরণ্যবাসী জটাশ্মশ্রুধারী পুরুষগণ সমিধ-পুষ্পাহরণের জন্য গভীর বনে আসিতেন, কখন বা প্রতিহিংসা-পরবশ কৃষ্ণকায় অলক্ষ্যে শ্বেতকায় বনচারীর পশ্চাদ্‌গমন করিত। কিন্তু সে পর্ব্বতের সানুদেশে বা উপত্যকায় বহুকাল পর্য্যন্ত মনুষ্যের বাস ছিল না।

শুনিয়াছি, ক্রমে শ্বেতকায় মনুষ্যে দেশ প্লাবিত হইয়া গেল, কৃষ্ণকায় মানবজাতি ক্রমে লুপ্ত হইতে লাগিল; যাহারা অবশিষ্ট রহিল, তাহারা অধীনতা স্বীকার করিয়া নবাগত জাতির অনুকরণে প্রবৃত্ত হইল ও ক্রমে শ্বেত জনসঙ্ঘে মিশিয়া গেল। শ্বেতাঙ্গ জনগণের চরম উৎকর্ষের অবস্থা দেখি নাই। আমি যখন পুনরায় মনুষ্যসমাজের সংসর্গে আনীত হইয়াছিলাম, তখন শ্বেতকায় জাতির অবনতি সূচিত হইয়াছে। শুনিয়াছি, এই জাতির যেরূপ উন্নতি হইয়াছিল, এতদ্দেশবাসী অপর কোন জাতিরই সেরূপ হয় নাই। তাহারা বৃহৎ কাষ্ঠের দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ করিত, সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রের দ্বারা হর্ম্ম্যাবলী চিত্রশোভিত করিত; ক্রমে কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে পর্ব্বতগাত্র ছেদন করিয়া গৃহ-নির্ম্মাণের জন্য পাষাণ লইয়া যাইত, অস্ত্রসাহায্যে তাহার মলিনত্ব দূর করিয়া তাহার ঔজ্জ্বল্য সাধন করিত। তাহারা কাষ্ঠখণ্ডের সাহায্যে জলরাশি উত্তীর্ণ হইত, বৃহদাকার কাষ্ঠখণ্ডের নিম্নে বর্ত্তুলাকার কাষ্ঠখণ্ড সংলগ্ন করিয়া গো, মহিষ, অশ্ব প্রভৃতি

বনবাসী জীবসমূহকে ভারবহনে নিযুক্ত করিত। যে ব্যক্তি বর্ত্তুলাকার কাষ্ঠখণ্ডের পরিবর্ত্তে রথে চক্র যোজন করিয়াছিল তাহার নাম অদ্যাপি তোমরা করিয়া থাক। ক্রমে সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে ও কৃষ্ণকায় জাতির সহিত মিশ্রণে তাহাদের বর্ণের পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। যখন মনুষ্যসমাজে নীত হইলাম তখন দেখিলাম, নবাগত জাতির বর্ণের বৈষম্য ঘটিয়াছে, আচার-ব্যবহারের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, বলেরও লাঘব হইয়াছে।

বহুকাল পরে পার্শ্বদেশে দারুণ ক্লেশ অনুভব করিলাম। শুনিয়াছি, পাষাণ যে ক্লেশ অনুভব করে তাহা তোমরা এখন স্বীকার কর। দেখিলাম, মলিনবেশধারী জনৈক মনুষ্য আমার পার্শ্বে লৌহকীলক প্রোথিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। অনেক চেষ্টার পর, অনেকগুলি কীলক ভগ্ন হইবার পর একটি কীলকের কিয়দংশ আমার পার্শ্বে প্রবেশ করিল। আমার যন্ত্রণা ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা নাই, বোধ করিবার ক্ষমতা নাই, সমস্ত ঘটনা স্মরণ রাখিবার ক্ষমতা নাই, কিন্তু তথাপি বলিতে পারি, এরূপ অসহ্য যন্ত্রণা কখনও ভোগ করি নাই; এরূপ অসহনীয় যন্ত্রণা সমুদ্র-গর্ভে বাসকালে মূর্চ্ছার প্রারম্ভেও বোধ হয় অনুভব করি নাই; পরবর্ত্তী জীবনে একবার মাত্র ভোগ করিতে হইয়াছিল। ক্রমে সংবাদ আসিল যে, পর্ব্বতের নানাস্থানে মনুষ্যগণ কীলক প্রোথিত করিবার চেষ্টা করিতেছে; দারুণ যন্ত্রণায় সকলেই অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। একটি, দুইটি, তিনটি, ক্রমে দশটি কীলক সমরেখায় প্রোথিত হইল। আমাদিগের আক্রমণকারী লৌহদণ্ডধারী আরও কয়েকজন মনুষ্যকে আহ্বান করিয়া আনিল। কীলকমূলে লৌহ-দণ্ড প্রয়োগে ও মনুষ্যবর্গের সমবেত চেষ্টায় আমরা সশব্দে বিদীর্ণ

হইয়া গেলাম। আমাদিগকে অপসারিত করিয়া আততায়ীরা পুনরায় কীলক প্রোথিত করিতে লাগিল। ক্রমে পর্ব্বতের সানুদেশে সমস্ত স্থান হইতেই এই নিষ্ঠুর বিদারণের শব্দ আসিতে লাগিল; আমরা জানিতে পারিলাম যে, উপত্যকার সর্ব্বস্থানেই পাষাণের উপর অত্যাচার হইতেছে। এইরূপে সন্ধ্যাগমের পূর্ব্বেই পর্ব্বতসানুর আকার অন্যরূপ হইয়া গেল। অন্ধকারের আগমনের সহিত চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্বালিত হইতে লাগিল, বনভূমি বহুকাল পরে মনুষ্য কর্ত্তৃক প্রজ্বালিত অগ্নিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

পরে জানিয়াছিলাম, স্তূপনির্ম্মাণের জন্য নগর হইতে সহস্রাধিক ব্যক্তি পাষাণ ছেদন করিতে পর্ব্বতের নিকটে আসিয়াছিল। তাহারা সমস্ত দিন পাষাণ ছেদন করিয়া পর্ব্বতের সানুদেশে রাত্রি যাপন করিত। সূর্য্যোদয় হইতে সন্ধ্যার সমাগম পর্য্যন্ত পাষাণ ছেদনের শব্দে ও সেই শব্দের প্রতিধ্বনিতে শৈলশ্রেণী কম্পিত হইত। শ্বাপদসঙ্কুল বনাবৃত সানুদেশ জীবশূন্য হইয়া উঠিল। মানবগণ মাসদ্বয় পর্ব্বতপার্শ্ব হইতে শিলাচ্ছেদনে ব্যাপৃত ছিল। শিলাছেদন শেষ হইলে নগর হইতে শত শত গো-যান আসিয়া উপস্থিত হইল; গো-যানের যাতায়াতের জন্য উপত্যকা হইতে নিম্ন-ভূমি পর্য্যন্ত পথ প্রশস্ত করা হইয়াছিল। দলে দলে বৃহৎকায় হস্তিগণ পর্ব্বতনিম্নে আনীত হইল ও দিনের পর দিন হস্তিগণ বৃহৎ পাষাণ-খণ্ডসমূহ শুণ্ডে উঠাইয়া গো-যানে স্থাপন করিতে লাগিল।

দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে হীনবল মানবজাতি কিরূপে এই গুরুভার পাষাণরাশি পর্ব্বতশ্রেণী হইতে বহু দূরবর্ত্তী নগরের সান্নিধ্যে লইয়া গিয়াছিল, বাষ্পীয় যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত গুরুভার পাষাণ কিরূপে ভূমি হইতে উত্তোলিত হইয়াছিল, তাহা ভাবিয়া তোমরা বিস্মিত

হইও, কিন্তু আমি তখন আশ্চর্য্যজনক বিশেষ কিছুই দেখি নাই। আমি কিসে বিস্ময় বোধ করি শুনিবে? আমার বিস্ময় বোধ হইয়াছিল গো-শকট দেখিয়া, গো-শকটের চক্র দেখিয়া, চক্রের প্রবর্ত্তন দেখিয়া। আমি ভাবিয়াছিলাম, কাষ্ঠনির্ম্মিত ক্ষুদ্র চক্র গুরুভার পাষাণের ভার বহন করিতে সমর্থ হইবে না; ভারবহনেও যদি সমর্থ হয়, শকট চলিতে সমর্থ হইবে না, নিশ্চয়ই কোন না কোন বিপদ্ ঘটিবে। কিন্তু সামান্য চেষ্টাতেই শকট চলিল, চক্র প্রবর্ত্তিত হইতে লাগিল, ক্রমে অতি অল্প সময়ের মধ্যে পথ অতিবাহিত হইতে লাগিল। সেরূপ গো-শকট তোমরা এখন আর ব্যবহার কর না, দুই একজন মাত্র তাহার পাষাণে খোদিত চিত্র দেখিয়া থাকিবে। তাহা বর্ত্তমান কালে প্রচলিত গো-শকটের ন্যায় নহে। বর্ত্তমানের গো-শকট দ্বিচক্র, কিন্তু সেগুলি চারি বা ততোধিক চক্রের উপরে স্থাপিত হইত। রথচক্র কোন স্থানে ভূমিতে প্রবেশ করিলে বা পথের কোন স্থান কর্দ্দমাক্ত থাকিলে হস্তিবৃন্দ আসিয়া সাহায্য করিত, শুণ্ডে রথচক্র মুক্ত করিত, কখন বা ভারবাহী গোসমূহকে সাহায্য করিত। এইরূপে গো-শকটে সহস্রাধিক শিলাখণ্ড নূতন পথ ধরিয়া শতাধিক যোজন পথ আনীত হইল; শিলাবাহী শকটসমূহ যেদিন নগরের প্রান্তে উপস্থিত হইয়াছিল, সে দিন নগরে মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছিল। দলে দলে নগরবাসিগণ আসিয়া আমাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অনেকে এরূপ দীর্ঘকায় প্রস্তর পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই; তাহারা বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিল। ক্রমে শকটশ্রেণী নগর-প্রাকার অতিক্রম করিয়া নগরে প্রবেশ করিল এবং পথ রোধ করিয়া ফেলিল। মুষ্টিমেয় রাজপুরুষের চেষ্টায় পথ মুক্ত

হইল না; তখন অতি বৃদ্ধ, লোলচর্ম্ম, মুণ্ডিতশীর্ষ কাষায়বস্ত্র-পরিহিত একজন মনুষ্য আসিয়া ভগবান্ বুদ্ধের নাম উচ্চারণ করিয়া পথ মুক্ত করিতে অনুরোধ করিলেন। বৃদ্ধের ও রাজ-পুরুষগণের চেষ্টায় পথ মুক্ত হইল। শকটসমূহ নগর অতিক্রম করিয়া পুনরায় নগর-প্রাকারের বাহিরে এক প্রান্তরে আসিয়া সমবেত হইল।

এই সময়ে দেখিলাম মনুষ্যজাতির অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে; অনেক উন্নতি হইয়াছে, অনেক বিষয়ে অবনতিও হইয়াছে। নূতন নাম, নূতন আচার-ব্যবহার, নূতন অস্ত্র ও ব্যবহার্য্য সামগ্রী আসিয়া আমার পূর্ব্ব-পরিচিত শ্বেতকায় জাতিতে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে। বুদ্ধ, স্থবির, ভিক্ষু, সঙ্ঘ, সঙ্ঘারাম, চীবর, কাষায় প্রভৃতি কথা পূর্ব্বে কখনও শুনি নাই। মনুষ্যজাতির আবাসস্থল নগরসমূহ সুদৃশ্য গগনস্পর্শী আবাসভবনে পরিপূর্ণ হইয়াছে; রাজপথসমূহ প্রস্তরাচ্ছাদিত হইয়াছে; বিশাল নগরে জলাভাব দূর করিবার জন্য কৃত্রিম নদীসমূহ খনিত হইয়াছে; হস্তী, উষ্ট্র, অশ্ব প্রভৃতি জীবগণ নরজাতির বশীভূত হইয়া তাহাদিগকে বহন করিতেছে; উষ্ট্র ও অশ্ববাহিত শকটের শব্দে শ্রুতিরোধ হইবার উপক্রম হইয়াছে; নগরমধ্যে জলপথে বিচিত্র তরণীসমূহ ইতস্ততঃ যাতায়াত করিতেছে; আমি এরূপ নগর পূর্ব্বে কখন দেখি নাই। ক্রমে হস্তিযূথের সাহায্যে শকট হইতে প্রস্তরসমূহ ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হইল। সমুদায় প্রস্তর নামাইতে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল। শকটের পশ্চাতে যে বিশাল জনসঙ্ঘ প্রান্তরে আসিয়াছিল, তাহারা একে একে নগরে প্রত্যাগমন করিতে লাগিল।

ক্রমে বিশাল প্রান্তর জনশূন্য হইয়া গেল। পূর্ব্বে নগর ও নাগরিক কখনও দেখি নাই। সেদিন সহস্র সহস্র নাগরিকের কথোপকথন কর্ণগোচর হইয়াছিল; তাহার কতক বুঝিতে পারিয়াছিলাম, কতক পারি নাই। তবে এইমাত্র নিশ্চয় জানিয়াছিলাম যে, মানবজাতির ভাষার অবস্থান্তর ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে কৃষ্ণকায় বনবাসী মানবজাতির মুখে যে ভাষার প্রয়োগ শুনিয়াছিলাম, সে ভাষার অবিমিশ্র প্রয়োগ আর শুনি নাই। পূর্ব্বে নবাগত শ্বেতকায় জাতির মুখে যে ভাষা শুনিতাম, সে ভাষাও আর শুনি নাই। এখন নাগরিকগণকে যে ভাষা ব্যবহার করিতে শুনিলাম, তাহা প্রাচীন শ্বেতকায় জাতির ভাষার ন্যায়, কিন্তু সেরূপ পরুষ নহে, অপেক্ষাকৃত কোমল ও সুশ্রাব্য।

বহুকাল পরে মনুষ্যজাতি দেখিলাম। আমি বৃদ্ধ—অতি বৃদ্ধ; আমার বয়সের পরিমাণ করিবার যদি আমার ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে, আমার বয়স শুনিয়া তোমরা বিস্মিত হইতে। বৃদ্ধগণ সাধারণতঃ প্রগল্‌ভ হইয়া থাকে; নগরবাসী মনুষ্যজাতিকে কি প্রকার দেখিলাম তাহা বলিতেছি, তুমি চিত্ত সংযত কর, আমার প্রগল্‌ভতায় বিরক্ত হইও না। শকটবাহিত পাষাণ দেখিতে নানাবিধ মনুষ্য আসিয়াছিল। যাহারা রাজপথে আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ, বৃদ্ধ ও বালক, শ্বেত ও কৃষ্ণ, সর্ব্ববিধ মনুষ্যই দেখিয়াছিলাম। যাহারা আমাদিগকে ছেদন করিতে পর্ব্বতপার্শ্বে গমন করিয়াছিল, তাহারা শ্রমজীবী, কঠোর পরিশ্রমে পটু, পরুষভাষী, বহুভাষী ও বহুভোজী। শকটে প্রস্তর আসিতেছে শুনিয়া যাহারা নগরপ্রান্তে আমাদিগকে দেখিতে গিয়াছিল, তাহারা অধিকাংশই শ্রমজীবী, তবে তাহাদিগের মধ্যে

দুই একজনকে দেখিয়া বোধ হইয়াছিল, তাহারা যেন অপর কোন জগতের মনুষ্য, তাহাদিগের সুদীর্ঘ বপু ও কোমল মুখকান্তি দেখিয়া মনে হইয়াছিল, যেন তাহারা কঠোর শারীরিক শ্রমে অভ্যস্ত নহে। তাহারা সুদৃশ্য বহুমূল্য পরিচ্ছদ ব্যবহার করে; তাহারা যে স্থান দিয়া চলিয়া যায়, সে স্থান সুগন্ধে পূর্ণ হইয়া উঠে; তাহাদিগের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ অথচ যেন আলস্যজড়িত। পরে জানিয়াছিলাম, তাহারা বিলাসপ্রিয় নাগরিক। নগর-প্রাকার অতিক্রমকালে আর এক শ্রেণীর মনুষ্য দেখিয়াছিলাম; তাহারা দীর্ঘকায়, সুদর্শন, কোমল অথচ কঠোর; তাহারা পরিচ্ছদের উপর লৌহবর্ম্ম ধারণ করিয়াছিল, কোমল হস্তে শাণিত লৌহ ধারণ করিয়াছিল, তাহাদিগের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও বলদীপ্ত। পরে জানিয়াছিলাম, তাহারা যুদ্ধব্যবসায়ী। পূর্ব্বে যে শ্বেতকায় জাতি দেখিয়াছিলাম, তাহাদিগের মধ্যে যাহারা যুদ্ধ করিত, তাহারাই দেবসেবা করিত, তাহারাই হলকর্ষণ করিত; কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে বিলাসিতা ছিল না। বর্ত্তমানকালে এ কথা তোমাদিগের নিকট শ্রুতিকঠোর হইবে। সহস্র সহস্র বর্ষকাল ব্যাপিয়া তোমরা জাতিভেদে—জাতি অনুসারে কর্ম্মভেদে—অভ্যস্ত, সুতরাং এ কথা তোমরা হয় ত বিশ্বাস করিবে না। তোমাদিগের নিকটে তোমাদিগের প্রাচীন প্রথার অবশেষ যাহা কিছু আছে, তাহা হইতে তোমরা জানিয়া আসিতেছ যে, জাতিভেদ বহুকালের। কিন্তু আমি জাতিভেদ অপেক্ষাও প্রাচীন, আমি মনুষ্য-জাতি অপেক্ষা প্রাচীন, আমি সর্ব্বজীব অপেক্ষা প্রাচীন,—আমার কথা বিশ্বাস করিও।

নগর কাহাকে বলে তাহা সেই দিন দেখিলাম। দেখিলাম তাহা মনুষ্যের অরণ্যবিশেষ। যতদিন পর্ব্বতের পদপ্রান্তে পড়িয়া

ছিলাম ততদিন দেখিয়াছি, জীব দেখিলে জীব, হয় তাহার নিকট আসিয়া মিলিত হয়, নহে ত দূরে পলায়ন করে, হয় আলাপে প্রবৃত্ত হয়, নহে ত পরস্পরের প্রাণহরণের চেষ্টা করে। এত অল্প-পরিসর স্থানের মধ্যে এত অধিক জীব পরস্পর বিবাদ না করিয়া, হিংসা না করিয়া কিরূপে বাস করে, তাহা আমার নিকট অতীব বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হইয়াছিল। কিন্তু শুনিয়াছি, বিবাদ ও হিংসার প্রকারভেদ হইয়াছে; যে স্থানে জীবের অস্তিত্ব আছে, বিবাদ ও হিংসা এখনও সে স্থানে বিদ্যমান আছে। যখন নগর-প্রাকার অতিক্রম করিয়া নগরমধ্যে গমন করিতেছিলাম, তখন দেখিতেছিলাম, জনস্রোত নানাপথ হইতে আসিয়া একত্র মিলিত হইতেছে। পরস্পর অভিভাষণ না করিয়া, এমন কি পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাতও না করিয়া যে যাহার গন্তব্যপথে চলিয়া যাইতেছে। প্রথম দিন নগর দেখিয়া ইহা আমার নিকট একান্ত বিস্ময়কর বোধ হইয়াছিল। রাজপথের উভয় পার্শ্বে সুসজ্জিত বিপণীশ্রেণী, অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা, বিপুল পণ্যের সমাবেশ প্রথম দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম। বিপণীর উপরে গবাক্ষপথে শকটশ্রেণী-দর্শনলোলুপা অবগুণ্ঠনশূন্যা অন্তঃপুরিকাগণকেও দেখিয়াছিলাম। ইহার পূর্ব্বে কখনও এত অধিক স্ত্রীলোকের একত্র সমাবেশ দেখি নাই। সে দিন কত অলঙ্কার, কত বস্ত্র, কত বেশবৈচিত্র্য দেখিয়াছি তাহা আর কি বলিব। শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিবাহিত হইয়াছে, কিন্তু মনুষ্যজাতির প্রথম নগর দেখিয়া যেরূপ আনন্দ হইয়াছিল, সেরূপ আনন্দ আর কখনও উপভোগ করিব কি না সন্দেহ।

ভারতবর্ষ

এস্. ওয়াজেদ আলি

[এস্. ওয়াজেদ আলি ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর হুগলী জেলার তাজপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি আলিগড় হইতে বি.এ. পরীক্ষা পাস করিয়া য়ুরোপে গমন করেন এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া বি.এ. (অনার্স) পরীক্ষা পাস করেন। পরে ইনি ব্যারিষ্টার হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হন এবং ১৯২৩ সালে কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন। বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ মাসিকপত্র-সমূহে ইনি নিয়মিতভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া সাহিত্য-সেবা করিয়া আসিতেছেন। ইঁহার গল্প-পুস্তক 'গুলদস্তা,' 'মাশুকের দরবার,' 'দরবেশের দোয়া' প্রভৃতি সমাদর লাভ করিয়াছে।]

পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে একবার আমি কলকাতায় এসেছিলুম। তখন আমার বয়স্ দশ-এগার বৎসর হবে। আমাদের বাসার নিকটে ছিল একটি মুদিখানা। তার পাশ দিয়ে আমাদের যাওয়া-আসা করতে হতো। সেই মুদিখানায় একটি বৃদ্ধ গদীতে বসে' বিপুলকায় একটি বই নিয়ে সাপ-খেলানো সুরে কি পড়তো। বৃদ্ধের মাথায় ছিল মস্ত এক টাক, চার পাশে তার ধপ্‌ধপে শাদা চুল। নাকের উপর মস্ত এক চাঁদির চশমা। গম্ভীর শ্মশ্রুগুম্ফশূন্য মুখ। বেশ বিজ্ঞ লোকের মত চেহারা। একটি মাঝারি বয়সের লোক এক এক বার বৃদ্ধের কাছে এসে বসে' পাঠ শুনতো, আবার খদ্দের এলে গিয়ে তাদের দেখা-শুনা করতো। আমারই বয়সী একটি ছেলে, খালি গায়ে বুড়োর

কাছে সর্ব্বদা বসে' থাকতো। আর তার পাশে থাকতো ছু'টি মেয়ে। বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে তারা সেই পাঠ শুনতো। তাদের মুখের ভাব দেখে' মনে হতো, বিষয়টি তারা বিশেষভাবেই উপভোগ করছে।

বুড়ো কি পড়ছে জানবার জন্য আমার বিশেষ কৌতূহল হলো। বাসা থেকে বেরিয়ে মুদিখানার সামনে এসে দাঁড়িয়ে আমি শুনতে লাগলুম। রামচন্দ্র কি করে' কপিসেনার সাহায্যে সমুদ্রের উপর সেতু বেঁধে' লঙ্কাদ্বীপে পৌঁছেছিলেন, তাই ছিল পাঠের বিষয়। সেই অপূর্ব্ব ক্রিয়াকাণ্ডের কথা শুনে' ছেলেদের মুখ আনন্দ, আগ্রহ, আর উৎসাহে উজ্জ্বল হয়ে উঠতো। আমি যখন সেই বর্ণনা শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে যেতুম, তখন কেউ না কেউ এসে, আমায় ডেকে নিয়ে যেতো। সেতু বাঁধা হচ্ছিল, তাই আমি জেনেছিলুম। রামচন্দ্র সেতু পার হয়েছিলেন কি না, আর পার হয়েই বা কি করেছিলেন, তা তখন জানতে পারিনি।

ছু'চার দিন পরে আমি দেশে ফিরে' গেলুম। তারপর কোথা থেকে যে কোথা গেলুম, তার ঠিকানা নেই। পরিবর্ত্তনের কত স্রোত আমার জীবনের উপর দিয়ে বয়ে গেল। সেই বৃদ্ধ আর তার সন্তান-সন্ততির নিরীহ শান্ত জীবনের ছবিটি মনের কোন্ গুপ্ত কোণে হারিয়ে গেল। তাদের অস্তিত্বের কথা আমি ভুলে' গেলুম! এমন কত শত জিনিষ রোজ আমরা ভুলে' যাচ্ছি।

এই সেদিন দৈবক্রমে বেড়াতে বেড়াতে আবার সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলুম। ঘর-বাড়ী সব বদলে গিয়েছে! আগে যেখানে ঘর ছিল, এখন সেখানে বড় বড় ম্যান্‌শন (mansions) মাথা তুলে' দাঁড়িয়েছে। আগে ছু'চারটে রিক্‌শ আর ঘোড়ার গাড়ীই

সে পথ দিয়ে যেতো; এখন বড় বড় মোটর অনবরত যাওয়া-আসা করছে। আগে মিটু মিটু করে' গ্যাসের বাতি জ্বলতো; এখন ইলেকট্রিক আলো স্থানটিকে দিনের মত উজ্জ্বল করে' রেখেছে। আমি কালের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তনের কথা ভাবছি, এমন সময়ে হঠাৎ আমার চোখ পড়লো সেই পুরানো মুদিখানাটির উপর। সেখানে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয়নি। জিনিষপত্র ঠিক আগের মত সাজানো রয়েছে। চাল থেকে এখনও কেরোসিনের একটি বাতি ঝুলছে। বোধ হয় পঁচিশ বছর আগের সেই বাতিটি।

আমি কিন্তু স্তম্ভিত হয়ে গেলুম ভিতরকার দৃশ্য দেখে'। পঁচিশ বছর আগে যে বৃদ্ধকে দেখেছিলুম, ঠিক তারই মত একটি বৃদ্ধ, গদার উপর বসে', মোটা একটি বই নিয়ে সাপ-খেলানো সুরে কি পড়ছিল। পঁচিশ বছর আগে সেই মধ্যবয়স্ক লোকের মতই একটি মধ্যবয়স্ক লোক এক এক বার এসে সেই পাঠ শুনছিল; আর আবশ্যক-মত খদ্দেরদের দেখা-শুনা করছিল। ঠিক সেই আগের ছেলেটির মত একটি ছেলে, খালি গায়ে বুড়োর মুখের দিকে চেয়ে বসেছিল। তার পাশে বসেছিল—সেই আগেকার মেয়েদের মত দেখতে, দু'টি মেয়ে।

কোন মায়া-মন্ত্র-বলে সেই সুদূর অতীত আবার ফিরে' এলো নাকি? আমি অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলুম।—বৃদ্ধ পড়ছিল রামচন্দ্রের সেই সেতুবন্ধনের কথা—পঁচিশ বছর আগে যা শুনেছিলুম।

আমি আর থাকতে পারলুম না; সোজা বৃদ্ধের কাছে গিয়ে বললুম, "মশায়, মাপ করবেন। ঠিক পঁচিশ বছর পূর্ব্বে আমি এই ছেলেদের সামনে আপনাকে এই বই পড়তে দেখেছি।

এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এরা কি আর বাড়েনি, আর আপনার মধ্যেও কি কোন পরিবর্ত্তন হয়নি? রামচন্দ্র কি এখনও সেই সেতু-বন্ধনের কাজে ব্যস্ত আছেন?"

বৃদ্ধ তার চোখ দু'টি তুলে আমার দিকে একবার চাইলে। নাকের উপর থেকে চশমা খুলে' ধুতির খুঁট দিয়ে গ্লাস দু'টিকে ভাল ক'রে পুঁছে আবার সেটিকে নাকের উপর চড়ালে। ধীর গম্ভীর দৃষ্টিতে আমার আপাদমস্তক এক বার ভাল করে' দেখে' নিলে; তারপর বিস্ময়ের স্বরে বললে, "পঁচিশ বছর আগে আপনি এখান দিয়ে গিয়েছিলেন?" আমি বললুম, "আজ্ঞে হাঁ।" বৃদ্ধ বললে, "তা হ'লে আপনি আমার স্বর্গীয় পিতা মহাশয়কে এই রামায়ণ পড়তে দেখেছেন। আমার ছেলে-মেয়েরা তাঁর কাছে বসে' পাঠ শুনতো। ছেলেটি এখন ঐ বড় হয়েছে। ওর বয়স্ আপনার মতই হবে। মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে। ভগবানের ইচ্ছায় তারা স্বামিপুত্র নিয়ে ঘরকন্না করছে। এই ছেলেটি হচ্ছে আমার নাতি, আর এই মেয়ে দু'টি আমার নাত্নী,—আমার ঐ ছেলের সন্তান।" বৃদ্ধের হাতের বইটির দিকে ইঙ্গিত করে' বললুম, "এ বইটি কবেকার?" স্মিত আস্যে বৃদ্ধ বললে, "এ হচ্ছে কৃত্তিবাসের রামায়ণ। আমার ঠাকুরদাদা বটতলায় এটি কিনে-ছিলেন। সে অনেক দিনের কথা; আমার তখন জন্ম হয়নি।"—বৃদ্ধকে অভিবাদন করে' দোকান ত্যাগ করলুম। মনে হলো, আমি দিব্য-চক্ষু পেয়েছি। প্রকৃত ভারতবর্ষের নিখুঁত একটা ছবি আমার চোখের সামনে ফুটে' উঠলো!—সেই tradition সমানে চলেছে, তার কোথাও পরিবর্ত্তন ঘটেনি!

কবি ফের্দৌসীর প্রতিভা

মোহম্মদ বর্‌কতুল্লাহ্‌

[মোহম্মদ বর্‌কতুল্লাহ্‌ পাবনা জেলার ঘোড়শাল নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি এম্‌.এ. ও বি.এল্‌. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন। ইঁহার প্রণীত 'পারস্য প্রতিভা' নামক পুস্তক হইতে বর্ত্তমান সন্দর্ভটি গৃহীত হইয়াছে।]

(Shahnama is) "a glorious monument of Eastern genius and learning which, if ever it should be generally understood in its original language, will contest the merit of invention with Homer himself."

—*Sir William Jones.*

এখনকার যুগে যেমন ঘরে ঘরে কবির জন্ম হয়, পূর্ব্বে এমন ছিল না। শব্দের সহিত শব্দ গাঁথিয়া সুললিত বাক্য রচনা করিতে পারিলেই যে কবি হওয়া যায় না, এ কথা অনেক বার আলোচিত হইয়াছে। এখনকার যুগে যেমন মাসিকপত্রের বাহুল্য ও প্রেসের সুবিধা রহিয়াছে, পূর্ব্বকালের কবিদের পক্ষে এই দুইটি উপকরণ ছিল না। তাই সেকালে রামা-শ্যামার মত লোকে কবিতা লিখিতে যাইত না। যাঁহারা লিখিতেন, অর্থাৎ যাঁহাদের লিখিবার শক্তি ছিল, তাঁহারা যে যশের প্রত্যাশায় দিনরাত্র বসিয়া বসিয়া

কবিতা লিখিতেন, তাহা নহে। যথার্থ কবিতা কখনই চেষ্টাপ্রসূত নহে। কবির মন, কবির দেখিবার শক্তি, কবির চিন্তা—সাধারণ লোক হইতে অনেক ভিন্ন। সাধারণ মানুষ যাহা দেখে, যাহা ভাবে, সেইগুলিই কবির চক্ষে নূতন করিয়া দেখা দেয়, কবির প্রাণে নূতন ভাবে ফুটিয়া উঠে। বাস্তব জগতে নিহিত সত্যগুলি কবির হৃদয়-বীণায় নূতন ভাবে ঝঙ্কার দেয়,—সে ঝঙ্কারে কবি আত্মহারা হইয়া গাছের শ্যাম পত্র, পর্ব্বতের বিরাট্ রূপ, নদীর অবোধ্য ভাষা, এই সকলে কি যেন খুঁজিয়া বেড়ায়। এই সকল লইয়াই কবির প্রথম লেখা, প্রথম ঝঙ্কার বিকাশ লাভ করে। তারপর সে যখন দেখে এই বাস্তব জগতের ভিতর আরও একটা সূক্ষ্ম জগৎ প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজ করিতেছে, তখন সে তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হয়। এই যে একটা সূক্ষ্ম জগতের অস্তিত্ব, এইটিকে প্রত্যক্ষ করিয়া দেখা, স্পষ্ট করিয়া হৃদয়ে অনুভব করা এইটি কবির জীবনের চরম লক্ষ্য। কবি যখন সাধনার বলে এই লক্ষ্যে উপনীত হয়, তখনই সে প্রকৃত কবি; তখন তাহার বীণার ঝঙ্কার শুধু কাণের দ্বার হইতে ফিরিয়া আসে না,—পরন্তু মর্ম্মের গভীরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়া হৃদয়কে আলোড়িত করিয়া তুলে। এই সময়ের যে কাব্য, তাহা অবিনশ্বর, তাহা যুগ-যুগান্তরে ভিতর দিয়া মানবের মনোরাজ্যে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। আমরা লিখিত গ্রন্থে যে কাব্য পাঠ করি, তাহা এই কবির মানস-রাজ্যের মহাকাব্যের ছায়া বা কঙ্কাল মাত্র। ভাষার মিউজিয়ামে রক্ষিত হইয়া এই কঙ্কালগুলিই কবির ভাব-প্রতিমার অস্তিত্বের প্রমাণ দিতেছে। সে ভাব কি প্রকারের, তাহার গভীরতা কত, কিরূপে তাহার বিকাশ হইল, প্রকৃতির

নীরব সঙ্কেতে কিরূপে কবির হৃদয় তাহার দিকে ধাবিত হইল ও সৌন্দর্য্যদেবতার কোন্‌ অঙ্গুলি-স্পর্শে কবির হৃদয়-তন্ত্রী বাজিয়া উঠিয়াছিল, এই সকল জানিবার জন্য মানবের যে একটা স্বাভাবিক কৌতূহল ও তীব্র আকাঙ্ক্ষা, কবি-লিখিত কাব্যে তাহার অনেকটা নিবারণ হয় এবং কবির জীবনে এইগুলিই প্রধান আলোচ্য বিষয়।

পারস্যের তুস নগরে যে কবির জন্ম হয়, ইনি প্রাচীন যুগের একজন মহাকবি। প্রাচীন অর্থে বাল্মীকি-হোমারের মত প্রাচীন না হইলেও আজ নয় শত বৎসর হইল তাঁহার বীণার ধ্বনি নীরবতা লাভ করিয়াছে। ইনিই শাহ্‌নামার রচয়িতা সুপ্রসিদ্ধ ফের্দ্দৌসী। * ফের্দ্দৌসীর প্রকৃত নাম মোহম্মদ আবুল কাসেম। ইহার পিতা মোহম্মদ ইস্‌হাক্‌ এব্‌নে শরূফ্‌ শাহ্‌ তুস নগরের রাজকীয় উদ্যানের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। কবি যৌবনে এই উদ্যান-পার্শ্বস্থিত নদীতীরে বসিয়া কাব্য লিখিতেন। শান্তিময় জীবনের দিনগুলি সুখের হিল্লোলে বহিয়া যাইত। নদীর কলনাদ তাঁহার কানের কাছে অপূর্ব্ব সঙ্গীত গাহিয়া যাইত; সৈকত-বিহারী সমীরণ তাহার আকুল নিঃশ্বাস বহিয়া দিগ্‌দিগন্তে ছুটিয়া যাইত। মৌন-সন্ধ্যায় কবি প্রকৃতির সে সৌন্দর্য্যের পীযূষধারা পান করিয়া মাতৃ-ক্রোড়ে শিশুর ন্যায় ঘুমাইয়া পড়িতেন। প্রকৃতির সে সৌন্দর্য্য কি, আমরা তাহা বুঝি না। আমরা বুঝি, পারস্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত ও মরুভূমি আর দুই-একটি খেজুর গাছ ব্যতীত আর কিছুই নাই। মাঝে মাঝে যে দুই-একটি সমতল ভূমি আছে তাহা বঙ্গের

* জন্ম ৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে, মৃত্যু ১০২০ খ্রীষ্টাব্দে।

ন্যায় এমন সুজলা সুফলা নহে; অথবা স্কট্‌লণ্ডের মত হ্রদবহুল ও শুভ্রতুষারমণ্ডিত গিরিকিরীটিনী নহে। থাকিবার মধ্যে আছে পারস্যের সেই চিরবিখ্যাত ফলেফুলে-ভরা উদ্যানশ্রেণী, যবশীর্ষ-শোভিত প্রান্তর আর স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বতী। কিন্তু কবির প্রাণে সে দৃশ্য কি মহাসৌন্দর্য্যের অবতারণা করিত, তাহা কবিই জানিতেন। তাই আজ রবীন্দ্রনাথের কথাটি মনে পড়ে—

হেলা খেলা সারাবেলা—
একি খেলা আপন মনে।

কিন্তু দিন কাহারও সমান যায় না। কবির সুখের দিন ক্রমে ফুরাইয়া আসিল। তাঁহার পরিবার তুসের গভর্নরের কোপ-দৃষ্টিতে পতিত হইল। অত্যাচার ও অবিচারে কবি মর্ম্মে-মর্ম্মে বড় ব্যথিত হইলেন। দেশের লোক তাঁহার দুঃখ দেখিল না। যাহারা দেখিল, তাহারা বুঝিল না; আবার যাহারা বুঝিল. তাহারাও তাঁহার সমবেদনায় একটা করুণার কথা মুখে আনিল না। দুর্দ্দিনে সকলের দশাই এমনি হয়! কবির গৃহে অবস্থান দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। তিনি পিতা ও পরিবারের দুঃখ-মোচনে প্রতিশ্রুত হইয়া বাটী হইতে বহির্গত হইলেন, কিন্তু বহির্গত হইয়া কোথায় যাইবেন? কাহার নিকট আপন মর্ম্মবেদনা জ্ঞাপন করিবেন? একজন পথের পথিক, অজ্ঞাতনামা লোককে সাহায্যের জন্য কে হস্ত প্রসারণ করিবে? বিষাদ-ক্লিষ্ট অন্তরে কবি নগরে-নগরে দেশে-দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এখন আর তাঁহার সে পূর্ব্বভাব নাই; দয়েল-শ্যামার ঝঙ্কার শুনিয়া তেমন করিয়া আর তাঁহার প্রাণ নাচিয়া উঠে না; দূর্ব্বার উপর

শিশিরবিন্দু দেখিয়া তাঁহার কল্পনা বিশ্বস্রষ্টার রূপ-চিন্তায় ধাবিত হয় না। এখন তিনি বেদনার চক্ষু লইয়া সকল দেখিতেছেন, বেদনার অন্তর লইয়া সকল বুঝিতেছেন। বেদনা-সঞ্জাত সহানুভূতি লইয়া আজ তিনি সমাজের অবস্থা দর্শন করিতেছেন। বিশ্ব-মানবের দুঃখ আজ তাঁহার মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে একান্ত আকুল করিয়া তুলিল। তিনি দেখিলেন,—শুধু তিনিই জগতে দুঃখী ন'ন, শুধু তাঁহার পরিবারই দুঃস্থ নহে; তেমন শত শত পরিবার দুঃখের খরস্রোতে মুহ্যমান তৃণের ন্যায় ভাসিয়া চলিয়াছে। অত্যাচার-উৎপীড়নে দরিদ্রের চক্ষে নিদ্রা নাই; তবুও তাহার কোন প্রতিকার হইতেছে না। রোগে তাপে জর্জ্জরিত হইয়া দুঃখীর পরিবার উৎসন্ন যাইতেছে—চিকিৎসা নাই, আনুকূল্য নাই। মরণের স্রোত অবিরাম চলিয়াছে—তাহার প্রতিরোধের চেষ্টা নাই। শত শত নিরাশ্রয় লোক ও প্রবাসী পান্থ অনাহারে অনিদ্রায় কষ্ট পাইতেছে। অন্নসত্র নাই, আশ্রয় নাই, পান্থ-নিবাস নাই। বর্ষে বর্ষে নদীর বন্যায় দেশ প্লাবিত হইয়া শত শত লোকের দুঃখের পথ মুক্ত করিতেছে, জীবজন্তু-শস্যাদি বন্যার স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, দেশ দুর্ভিক্ষের লীলাস্থল হইতেছে; কেহই সে দিকে লক্ষ্য করিতেছে না। এই শোচনীয় দৃশ্য, দেশের এই আকুল আর্ত্তনাদ তাঁহার হৃদয়কে শতধা বিদীর্ণ করিতে লাগিল। তিনি একটি মহত্তর কর্ত্তব্যে প্রণোদিত হইয়া উঠিলেন,—সংকল্প করিলেন—যেরূপেই হউক, দেশের এই হাহাকার নিবারণ করিতেই হইবে।

অন্তর্য্যামী তাঁহার প্রাণের আকুলতা বুঝিলেন। তাঁহার সময় ফিরিল। এই সময়ে জগতের একজন শ্রেষ্ঠ সম্রাট্ গজনী

নগরে সাহিত্য ও কলাবিদ্যার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইনি সুলতান মাহ্মুদ; তখন তাঁহার অপ্রতিহত প্রভাব ও অসামান্য যশোরাশি ভারতের দ্বারদেশ হইতে সুদূর পারস্যের পশ্চিম সীমান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত। যিনি যে দেশেরই হউন, যাঁহারই প্রতিভা আছে, তাঁহার পক্ষে সুলতান মাহ্মুদের সভায় প্রবেশের অবাধ অধিকার ছিল। জনরবের ভিতর দিয়া প্রতিভার এই সাদর আহ্বানের একটি ঢেউ আবুল কাসেমের (ইনি তখনও ফের্দ্দৌসী উপাধি পান নাই) হৃদয় স্পর্শ করিল। তিনি জগতের তৎকালীন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাটের মহিমান্বিত সভাস্থলে স্বীয় মর্ম্মবেদনা জ্ঞাপন করিতে চলিলেন।

২

সায়ংকাল,—মৃদু সমীরণ রহিয়া রহিয়া তরুলতা দোলাইয়া দোলাইয়া বহিয়া যাইতেছে। সন্ধ্যাকালের লোহিত-রঞ্জিত মেঘমালার হিরণ-আভা পরিব্যাপ্ত হইয়া জগতের প্রত্যেক বস্তুকে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে বিভূষিত করিয়াছে। নিস্তরঙ্গ বায়ুপ্রবাহে দূরাগত বিহগের ললিত কূজন বাহিত হইয়া ভাবুকের কর্ণে অমৃতধারা বর্ষণ করিতেছে; মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত নূতন হইতে নূতনতর পুলকের ধারা বহিয়া আনিতেছে। এই সৌন্দর্য্যের মধ্যে, এই সুখ-প্রবাহে আত্মহারা হইয়া মাহমুদের সভার শ্রেষ্ঠ কবি আন্সারী দুইজন বন্ধু-সমভিব্যাহারে রাজ-উদ্যানে বিহার করিতেছেন। সঙ্গী দুইজনও কবি, কবির সহচর কবি; অপূর্ব্ব মিলন। সকলেই আনন্দে ও আমোদে আত্মহারা। এই আনন্দের সময়ে সহসা

একটি বিঘ্ন জন্মিল। একজন দীনহীন মলিনবেশ পথিক আসিয়া সেই উদ্যানে উপস্থিত হইল। কবি আন্‌সারী অপ্রসন্ন হইলেন; সঙ্গিদ্বয় ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন। একজন বলিলেন,—"লোকটিকে এই মুহূর্ত্তে এখান হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হউক।" অন্যজন ইহা সমর্থন করিলেন; কিন্তু আন্‌সারী বলিলেন,—"কাহার মধ্যে কি আছে, কে বলিতে পারে? হইতে পারে, এই লোকটির ভিতর এমন কিছু আছে, যাহাতে ইহাকে অপমানিত করিয়া পরে আমাদিগকে অনুতপ্ত হইতে হইবে। সুতরাং লোকটিকে অপমানিত না করিয়া কৌশলে দূর করিয়া দেওয়া যাউক।" পরিশেষে তাহাই ঠিক হইল। ইত্যবসরে পথিক তাঁহাদের সম্মুখীন হইল। তখন আন্‌সারী কহিলেন,—"বন্ধো! আমরা তিনজনেই রাজকবি; কবি ব্যতীত অন্য কাহারও সহবাস আমরা ভালবাসি না।" পথিক তখন বিনীতভাবে বলিল,—"মহাত্মন্‌, এ দীন ব্যক্তিও একজন কবিতার উপাসক।" আন্‌সারীর বিস্ময় হইল, বলিলেন,—"বেশ, আমরা তিন বন্ধু তিনটি চরণ বলিব, আপনি যদি তাহার চতুর্থ পাদ পূরণ করিতে পারেন, তবে বুঝিব—আপনি কবি।" পথিক জিজ্ঞাসুভাবে তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিলেন। একে একে তিন রাজকবি তিনটি চরণ বলিলেন; কিন্তু তাহা এমনই কৌশলে রচিত যে, সেগুলির শেষ শব্দ 'শন্‌'-ভাগান্ত এবং পারস্য ভাষায় ঐ তিনটি ভিন্ন ঐ প্রকারের আর কোন শব্দ নাই। সুতরাং তাহার পাদপূরণ যে-কোনও কবির পক্ষেই অসম্ভব। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, পথিক কালবিলম্ব না করিয়াই চতুর্থ পাদ এরূপ কৌশলে পূর্ণ করিলেন যে, কবিগণ বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। পদ্যটি এইরূপ :—

আন্‌সারী—চু আরেজে তু মাহ্‌ না বাশাদ্‌ রওশন্‌;
আস্‌জাদী—মানান্দে রোখ্‌ত্‌ গোল্‌ না বুয়াদ্‌ দর্‌ গোল্‌শন্‌;
ফারুকী—যেজ্‌গানাৎ হামী গোজার্‌ কোনাদ্‌ আজ্‌ জওশন্‌;
পথিক—মানান্দ্‌ সেমানে "গেঁও" দর্‌জঙ্গে পুশন্‌।

(অনুবাদ)

আন্‌সারী—চন্দ্রও সুন্দর নয় তব মুখ-সম;
আস্‌জাদী—বাগানে গোলাপ নাহি হেন মনোরম
ফারুকী—তোমার চোখের ভুরু বর্ম্ম ভেদ করে;
পথিক—পুশনের যুদ্ধে যথা বর্শা "গেঁও" করে।

সুন্দরবনে

শেখ হবিবর রহমান

[শেখ হবিবর রহমান যশোহর জিলার একটি পল্লীগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রজীবনেই ইঁহার কয়েকখানি কবিতা-পুস্তক প্রকাশিত হয়। ইনি মহাকবি শেখ সাদীর প্রসিদ্ধ 'গুলিস্তাঁ' ও 'বুস্তাঁ' নামক ফারসী গ্রন্থদ্বয়ের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন এবং কবিতা, কাব্যগ্রন্থ, ছোটগল্প, উপন্যাস, ইতিহাস, জীবনী, ভ্রমণ-কাহিনী, শিশুপাঠ্যগ্রন্থ প্রভৃতি প্রণয়ন করিয়াছেন।]

রাত্রিটা আমাদিগকে বাধ্য হইয়া এই স্থানেই কাটাইতে হইবে। এরূপ ভয়ঙ্কর স্থান নাকি সমগ্র সুন্দরবনে আর নাই। উত্তর-পূর্ব্ব দিকে ভীষণ বন, নিরতিশয় নিবিড়। ইহার যে-কোন স্থানে অনায়াসে ব্যাঘ্র লুকাইয়া থাকিতে পারে। পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে বিস্তীর্ণ মাঠ। মাঠের মধ্যে মধ্যে কাশবন। স্থানে স্থানে ঢিবি; স্থানে স্থানে গর্ত্ত। এই সমস্ত কাশবনে ও গর্ত্তে ব্যাঘ্র থাকিতে অত্যন্ত ভালবাসে। শুনিলাম ইহারা সৌখিন বাবুদের মত অবসর সময়ে এই মাঠে আসিয়া হাওয়া খায়, খেলা করে। স্থানটি খেলার উপযুক্তই বটে। সবুজ দুর্ব্বাদলে আবৃত বিস্তীর্ণ সমতলভূমি বনের পাশ দিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত বিরাজমান। দুর্ব্বাদল জমাট বাঁধিয়া গালিচার মত পুরু ও কোমল হইয়া আছে। পা রাখিলে দিব্য আরাম অনুভব হয়।

আজ আর কেহই ডিঙ্গিতে শুইতে সাহসী হইল না। দশটি প্রাণী আমরা এই পানশীর মধ্যে সমস্ত দরজা-জানালা অর্গলবদ্ধ

করিয়া শঙ্কার সহিত রাত্রি কাটাইলাম। বাহিরে নৌকার ছাদে হারিকেন বেশ জোরে জ্বলিতে লাগিল—সাধারণের বিশ্বাস যে, আলোর নিকটে বাঘ আসিতে ভয় পায়। বন্দুকটি সুসজ্জিত ছিল। সমস্ত দিন অনাহারজনিত অবসন্নদেহে আমরা সন্ধ্যার সময়েই শুইয়াছিলাম। ব্যাঘ্র-সম্বন্ধে নানা চিন্তায় মন আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়াও বাঘের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম। কি এক বিভীষিকায় যেন আমাদের সমগ্র নৌকা ছাইয়া রহিল। শুনিলাম, যে স্থানে আমাদেব নৌকাখানি অবস্থিত ছিল, সেই স্থান দিয়া ব্যাঘ্রগণ দুর্ব্বার চটিব মাঠে গমনাগমন করে। বাঘের ভয়ে মন আড়ষ্ট—চারিদিক্ নিঝুম, নীরব। কচিৎ দুই-একটি হরিণ অরণ্যের মধ্যে চীৎকার করিতেছিল।

আমি কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম জানি না। অন্ধকার রাত্রি যেন আর পোহাইতে চাহে না। রাত্রিতে কয়েকবার নিদ্রাভঙ্গ হইল। অবশেষে রজনী-প্রভাতে সকলে গাত্রোত্থান করিলাম। হিসাব করিয়া দেখা গেল, আমরা সকলেই সশরীরে বর্ত্তমান আছি; রাত্রিতে কেহই ব্যাঘ্রকবলিত হই নাই। তবে আমাদের একজন কার্য্যবশে রাত্রিতে নৌকার বাহিরে গিয়া বসিয়াছিল; আর একটু হইলেই তাহাকে কাজী সাহেবের হাতে গুলী খাইতে হইত। শিকারী-নৌকার নিয়ম, রাত্রিতে বাহিরে যাইতে হইলে শিকারীদিগকে জানাইয়া যাইতে হয়; নতুবা বাহিরে কিছু দেখিলেই সন্দেহবশে তাহাকে গুলি করা বিচিত্র নহে। এখানে শিকারীগণ অতি সাবধানে সর্ব্বদা বন্দুকে টোটা পূরিয়া অবস্থিতি করেন।

প্রাতে ভ্রমণের জন্য আমরা বাহির হইলাম। আমাদের শিকারীযুগল তখন শিকারে গিয়াছিলেন। নৌকার দরজায়

তালাচাবি বন্ধ করিয়া রাখা হইল। এই বিজন বনভূমিতে দস্যু-তস্করের কোন ভয় ছিল না, কিন্তু বাঁদরেরা নৌকার মধ্যে অনধিকার-প্রবেশ করিয়া কোনরূপ বাঁদরামী না করে, সেই জন্যই আমাদের এই সাবধানতা। সম্মুখে বিস্তীর্ণ প্রান্তর, ইহাই "দুর্ব্বার চটির মাঠ"। তাহারই মধ্য দিয়া আমরা চলিলাম। স্থানে স্থানে হরিণ চলিবার সঙ্কীর্ণ পথ। হরিণগণ মানুষের মত সর্ব্বদা একই পথে গমনাগমন করে। এই পথকে "প'ট" বলে। প'টগুলি গ্রাম্য হাটুরিয়া রাস্তার মত আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে—দেখিতে বড়ই সুন্দর। প্রথমেই আমরা ফুলঝুরির বাওড়ে প্রবেশ করিলাম। ইহা অধিক বড় নহে; একটি মধ্যমাকার দীর্ঘিকার ন্যায়। জল শুকাইয়া গিয়াছে—মধ্যে ছোট ছোট গর্ত্ত, তাহাতে অল্প অল্প জল আছে। জলের নাম জীবন কেন, তাহা এই সামান্য নগণ্য জলাশয়ের চারিদিকে লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে। এই সুদূর সুন্দরবনের সমুদ্রোপকূলে এই জলটুকু সহস্র সহস্র লোকের জীবনরক্ষার কারণস্বরূপ হইয়া আছে। এ অঞ্চলে সুপেয় পানীয় জল পাইবার আর উপায় নাই। এদিকের সমুদ্রযাত্রী ও জঙ্গলের যাবতীয় লোক এই স্থান হইতে জল গ্রহণ করে। ইহার জল এত কম যে, অধিকদিন অনাবৃষ্টি হইলে বা অধিক পরিমাণে গৃহীত হইলে হয়ত ইহা শুকাইয়া যাইতে পারে; তাহা হইলে সহস্র সহস্র লোকের জীবন বিপন্ন হইবার আশঙ্কা। বাওড়ের দক্ষিণ পার্শ্বে একটি তাল বৃক্ষ! এ অঞ্চলে আর কোথায়ও তাল বা ঐ জাতীয় বৃক্ষ নাই। সমুদ্রকূলে দুর্ব্বার চটির মাঠের পার্শ্বে ফুলঝুরির বাওড়ের দক্ষিণ তীরে এই তালবৃক্ষটি চতুঃপার্শ্বের বহুদূর হইতে দৃষ্ট হয়, যেন সে যুগ যুগকাল এক পায়ে দণ্ডায়মান থাকিয়া

এই নির্জ্জন নিস্তব্ধ প্রান্তরে যোগনিমগ্ন সাধকের ন্যায় কি এক মহাধ্যানে নিরত আছে, আর ইঙ্গিতে তৃষ্ণার্ত্ত শ্রমক্লান্ত মানব-সাধারণকে এই স্থপের সলিলপূর্ণ জলাশয়ের সন্ধান বলিয়া দিতেছে।

আমরা ফুলঝুরির বাওড় বামদিকে রাখিয়া অল্প অল্প কাশবনের মধ্য দিয়া দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। প্রতিমুহূর্ত্তে বাঘের ভয়। হয়ত এই শীতের প্রভাতে শ্রীমান্ এই প্রান্তরের কোথাও শুইয়া দিব্য আরামে রৌদ্রসেবন করিতেছেন—এই সুখপ্রভাতে তাঁহার আরামের বিঘ্ন করা তিনি কিছুতেই ক্ষমা করিবেন না। আমাদের সঙ্গে এখন বন্দুক নাই,—কাহারও হাতে দা, কাহারও হাতে লাঠি; আমি একটি ছাতা লইয়া এই অভিযানের সহগামী। কাজী সাহেব আমাদের সেনাপতি। বর্ণিত তালগাছটির পার্শ্বে গেলেই দিগন্তবিস্তৃত বঙ্গোপসাগর আমাদের নয়নসমক্ষে ভাসিয়া উঠিল। তখন আমাদের পদনিম্নে বালুকাভূমি; তাহার মধ্যে চরণযুগল ডুবিয়া যাইতেছিল। মরুভূমি কখনও দেখি নাই; কিন্তু ইহা তাহারই একটি ক্ষুদ্র নমুনা বলিয়া মনে হইল। কোথায়ও বা উচ্চ উচ্চ বালুকার ঢিবি; কোথায়ও বা গর্ত্ত; বালুকাসমুদ্র এইভাবে যেন ঢেউ খেলিতে খেলিতে বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে।

আমরা ধীরে ধীরে সমুদ্রের সমীপবর্ত্তী হইলাম। তখন জোয়ার আসিতেছিল। জোয়ারের সময় বিনা বাতাসেই সমুদ্রে তুফান উঠে। তুফানের সঙ্গে সঙ্গে জল লাফাইয়া লাফাইয়া উপরে উঠিতে থাকে। এই তুফানের প্রকৃতি স্বতন্ত্র, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে জলরাশি প্রবল উচ্ছ্বাসের সহিত গর্জ্জন করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিল। আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, প্রতি ছয় সেকেণ্ড অন্তর এক-একটি

করিয়া তরঙ্গ প্রধাবিত হইয়া বেলাভূমিতে আছাড় খাইয়া লুটাইয়া পড়িতেছে। দেখিয়া মনে হইল, যেন প্রকৃতির একদল প্রবল সৈন্য বিশ্ব জয় করিবার জন্য সমর-উৎসাহে মাতোয়ারা হইয়া শ্রেণী-বদ্ধভাবে মার মার শব্দে অগ্রসর হইতেছে। ইহার সম্মুখে পড়িলে বুঝি পাষাণ-প্রাচীরও চূর্ণ হইয়া যায়! এই জোয়ারের তরঙ্গ একটি দেখিবার জিনিষ, উপভোগের সামগ্রী। দূরদূরান্তর হইতে ইহার গর্জ্জন শুনিতে পাওয়া যায়। বায়ুপ্রবাহ না থাকা সত্বেও আমরা নৌকা হইতে এই গর্জ্জন শুনিতে পাইয়াছিলাম। তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া পড়িতেছিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয়ের মধ্যেও এক আবেগ-তরঙ্গ খেলিতেছিল। দক্ষিণে অনন্ত সমুদ্র প্রশান্তভাবে দিগন্তবিস্তৃত; মধ্যে দুই-একটি পাখী উড়িতেছিল। চারিদিক্ কি গম্ভীর ভাবোদ্দীপক

আমরা বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সমুদ্রের তীর দিয়া ভ্রমণ করিতেছিলাম, আর জোয়ারের জল কি ভাবে ক্রমশঃ উপরে উঠিয়া আসিতেছিল, তাহা লক্ষ্য করিতেছিলাম। দূরদূরান্তর হইতে কত কি জিনিষ সমুদ্রতীরে আসিয়া লাগিয়াছে। দেখিলাম, বাঙ্গালার বিষম উৎপাত কচুরিপানা তীরে লাগিয়া শুকাইয়া আছে। হতভাগাদের কোন প্রতাপ এখানে খাটে নাই। বোধ হয় নোনা জল খাইয়া তাহারা হজম করিতে পারে নাই, তাই অকালে "কচুরি-লীলা" শেষ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

বিকালে আমরা আবার সমুদ্রতীর-ভ্রমণে বাহির হইলাম। সকলেরই হাতে এক একখানি লাঠি বা দা। বাঘ আসিলে ইহা লইয়াই যুদ্ধ করিতে হইবে। যথাপূর্ব্ব কাজী সাহেব আমাদের দলের সেনাপতি। দেখিলাম, একদল লোক ফুলঝুরির বাওড়

হইতে জল লইয়া নৌকা বোঝাই করিয়া সমুদ্রপথে মাণিকদা'র দিকে চলিয়া গেল। এই বিশাল বারিনিধি তাহার আশ্রিত মানবগণকে একবিন্দু পানীয় জল দিতেও অক্ষম। নৌকাখানি ধীরে ধীরে দূরসমুদ্রে মিশিয়া গেল। আমরা তখন সম্মুখের অনন্ত শোভা দেখিতেছিলাম; কিন্তু মন ছিল পিছনের দিকে। কি জানি, কখন শার্দ্দূলরাজ ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়েন!

ওদিকে পশ্চিম গগন রক্তিম হইয়া উঠিয়াছে। আকাশ নির্ম্মল; একখণ্ড সামান্য মেঘও কোন স্থানে দৃষ্ট হইতেছে না। দেখিতে দেখিতে কনক-তপন অস্তাচল-সমীপবর্ত্তী হইল। আর একটু পরেই সূর্য্যাস্ত। এ সুবর্ণসুযোগ কিছুতেই ত্যাগ করিতে সম্মত হইলাম না।

আমরা সকলে বড় বড় লাঠি হস্তে সূর্য্যাস্ত দেখিবার জন্য সেই সমুদ্রতীরে পশ্চিমাভিমুখী হইয়া ঊর্দ্ধনেত্রে দণ্ডায়মান; কেহ কেহ পিছন ফিরিয়া সতর্ক প্রহরীর ন্যায়, বাঘ আসে কিনা তাহা দেখিতে-ছিলেন। মুখে যাহাই বলি না কেন, জীবনের মমতা আমাদের কাহারও কম ছিল না; বিশেষতঃ জীবিত অবস্থায় বাঘ তাহার বড় বড় দাঁত দিয়া এই তাজা শরীরটাকে কামড়াইয়া কামড়াইয়া ছিঁড়িয়া খাইবে, ইহা কল্পনা করাও অসহ্য। সুতরাং আমরাও এক-একবার ব্যাঘ্র-মহারাজের শুভাগমন-সম্ভাবনায় ভয়-কণ্টকিত হইতেছিলাম। এমন দোটানা অবস্থায় প্রশান্তভাবে সৌন্দর্য্যের উপভোগ সম্ভবপর নহে। সত্যকথা বলিতে কি, তখন বাঘের কল্পনাই আমাদের মনে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চস্থান অধিকার করিয়া ছিল। চন্দ্রে যেমন গ্রহণ লাগে, ঠিক সেইভাবে সহসা সূর্য্যের নিম্নপার্শ্ব যেন সাগরজলে আবৃত হইয়া গেল তারপর ধীরে ধীরে ইহা নিম্নে

সলিলের অন্তরালে একটু একটু করিয়া অদৃশ্য হইতে লাগিল। সেই কনক-প্রতিমা কে যেন নির্দ্দয়ভাবে অতল সাগরে ডুবাইয়া দিয়া জগতের সমস্ত পদার্থের নশ্বরতা নীরবকণ্ঠে বিশ্বের কেন্দ্রে কেন্দ্রে ঘোষণা করিতে লাগিল। আমি তখন স্থির-ধীরভাবে পৃথিবীর স্থলভাগের এক প্রান্তসীমায়—সেই বঙ্গোপসাগরের তীরের একটি উচ্চস্থানে দণ্ডায়মান। পশ্চাতে মুক্ত প্রান্তর ও বহুদুর-প্রসারিত সুন্দরবন; সম্মুখে অনন্ত সাগর। আকাশের সুদূর পশ্চিম প্রান্তে যেন দিগন্তবিস্তৃত আগুনের খেলা। হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া মুক্ত-বিশ্বের এই সৌন্দর্য্য প্রাণ ভরিয়া আলিঙ্গন করিলাম। এই বিশাল সৌন্দর্য্য, প্রকৃতির এই অনন্ত মাধুর্য্য প্রাণের কানায় কানায় পূর্ণ করিয়া লইলাম। যে অনন্ত সম্পৎ, যে অতুলনীয় বৈভব আজ এখানে এই মুহূর্ত্তে লাভ করিলাম, জগতে তাহার তুলনা নাই—চিরদিন তাহা আমার হৃদয় সঞ্জীবিত রাখিবে, মন নূতন নূতন মাধুরীতে পূর্ণ করিয়া রাখিবে।

অপুর পাঠশালা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

* [বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৈতৃক বাস যশোহর জেলার অন্তর্গত ব্যারাকপুর গ্রামে। ১৩০৬ সালে (১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে) কাঁচড়াপাড়ার নিকটে মুরাতিপুর গ্রামে মাতুলালয়ে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে বি.এ. পাস করিয়া ইনি প্রথমে ভাগলপুরে কোন জমিদারীর ম্যানেজার হন, তাহার পর হইতে ইনি শিক্ষকতায় নিযুক্ত আছেন। 'পথের পাঁচালী,' 'অপরাজিত,' 'আরণ্যক,' 'আদর্শ হিন্দু হোটেল,' 'দৃষ্টিপ্রদীপ,' 'মেঘমল্লার' প্রভৃতি পুস্তক প্রণয়ন করিয়া ইনি বিশেষ যশস্বী হইয়াছেন।]

পৌষ মাসের দিন। অপু সকালে লেপ মুড়ি দিয়া রৌদ্র উঠিবার অপেক্ষায় বিছানায় শুইয়া ছিল, মা আসিয়া ডাকিল—"অপু ওঠো শিগ্‌গির ক'রে, আজ তুমি যে পাঠশালায় পড়তে যাবে। কেমন সব বই আনা হবে তোমার জন্যে, শেলেট্। হ্যাঁ ওঠো, মুখ ধুয়ে নাও, উনি তোমায় সঙ্গে নিয়ে পাঠশালায় দিয়ে আসবেন।"

পাঠশালার নাম শুনিয়া অপু সদ্যনিদ্রোত্থিত চোখ দুটি তুলিয়া অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার ধারণা ছিল যে, যাহারা দুষ্ট ছেলে, মায়ের কথা শোনে না, ভাইবোনদের সঙ্গে মারামারি করে, তাহাদেরই শুধু পাঠশালায়

পাঠানো হইয়া থাকে। কিন্তু সে তো কোনোদিন ওরূপ করে না, তবে সে কেন পাঠশালায় যাইবে?

খানিক পরে সর্ব্বজয়া পুনরায় আসিয়া বলিল—"ওঠো অপু, মুখ ধুয়ে নাও, তোমায় অনেক ক'রে মুড়ি বেঁধে দেবো এখন, পাঠশালায় ব'সে ব'সে খেও এখন, ওঠো লক্ষ্মী মাণিক।" মায়ের কথার উত্তরে সে অবিশ্বাসের সুরে বলিল—"ইঃ।" পরে সে মায়ের দিকে চাহিয়া জিভ্ বাহির করিয়া চোখ বুজিয়া এক প্রকার মুখভঙ্গী করিয়া রহিল, উঠিবার কোনো লক্ষণ দেখাইল না।

কিন্তু অবশেষে বাবা আসিয়া পড়াতে অপুর বেশী জারিজুরি খাটিল না, যাইতে হইল। মায়ের প্রতি অভিমানে তাহার চোখে জল আসিতেছিল, খাবার বাঁধিয়া দিবার সময় বলিল—"আমি কখ্খনো আর বাড়ী আস্‌চিনে দেখো।"

"ষাট্ ষাট্, বাড়ী আসবিনে কি। ওকথা বলতে নেই, ছিঃ"—পরে তাহার চিবুকে হাত দিয়া চুমু খাইয়া সর্ব্বজয়া বলিল—"খুব বিদ্যে হোক্, ভাল ক'রে লেখাপড়া শিখো, কোনো ভয় নেই; ওগো, তুমি গুরুমশায়কে ব'লে দিও যেন ওকে কিছু বলে না।"

পাঠশালায় পৌঁছাইয়া দিয়া হরিহর বলিল—"ছুটি হবার সময়ে আমি আবার এসে তোমাকে বাড়ী নিয়ে যাবো অপু, ব'সে ব'সে লেখো, গুরুমশায়ের কথা শুনো, দুষ্টুমি ক'রো না যেন।" খানিকটা পরে পিছন ফিরিয়া অপু চাহিয়া দেখিল, বাবা ক্রমে পথের বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

অকূল সমুদ্র। সে অনেকক্ষণ মুখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। পরে ভয়ে ভয়ে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, গুরুমহাশয় দোকানের মাচায় বসিয়া দাঁড়িতে সৈন্ধব লবণ ওজন করিয়া কাহাকে

দিতেছেন, কয়েকটি বড় বড় ছেলে আপন আপন চাটাইএ বসিয়া নানারূপ কু-স্বর করিয়া কি পড়িতেছে ও ভয়ানক ছুলিতেছে। তাহার অপেক্ষা আর একটু ছোট ছেলে দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া আপন মনে পাততাড়ির তালপাতা মুখে পুরিয়া চিবাইতেছে; আর একটি বড় ছেলে, তাহার গালে একটা বড় আঁচিল, সে দোকানের মাচার নীচে চাহিয়া কি লক্ষ্য করিতেছে। তাহার সাম্‌নে ছুজন ছেলে বসিয়া শ্লেটে একটা ঘর আঁকিয়া কি করিতেছিল। একজন চুপিচুপি বলিতেছিল, "আমি এই চ্যারা দিলাম"—অন্য ছেলেটি বলিতেছিল, "এই আমার গোল্লা"—সঙ্গে সঙ্গে তার শ্লেটে আঁক পড়িতেছিল এবং সে মাঝে মাঝে আড়চোখে বিক্রয়-রত গুরুমহাশয়ের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। অপু নিজের শ্লেটে বড় বড় করিয়া বানান লিখিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে ঠিক জানা যায় না, গুরুমহাশয় হঠাৎ বলিলেন—"এই ফণে, শেলেটে ওসব কি হচ্ছে রে?" সম্মুখের এই ছেলেছুটি অমনি শ্লেটখানা চাপা দিয়া ফেলিল; কিন্তু গুরুমহাশয়ের শ্যেনদৃষ্টি এড়ানো বড় শক্ত, তিনি বলিলেন—"এই সতে, ফণের শেলেটটা নিয়ে আয় তো।" তাঁহার মুখের কথা শেষ হইতে না হইতে বড় আঁচিলওয়ালা ছেলেটা ছোঁ মারিয়া শ্লেটখানা উঠাইয়া লইয়া গিয়া দোকানের মাচার উপর হাজির করিল।

"হুঁ, এসব কি খেলা হচ্ছে শেলেটে?—সতে, ধ'রে নিয়ে আয় তো ছুজনকে। কান ধ'রে নিয়ে আয়।"

যে ভাবে বড় ছেলেটা ছোঁ মারিয়া শ্লেট লইয়া গেল, এবং যে ভাবে বিষণ্ণমুখে সাম্‌নের ছেলেছুটি পায়ে পায়ে গুরুমহাশয়ের কাছে যাইতেছিল, তাহাতে হঠাৎ অপুর বড় হাসি পাইল,

সে ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। পরে খানিকটা হাসি চাপিয়া রাখিয়া সে আবার ফিক্‌ফিক্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

গুরুমহাশয় বলিলেন—"হাসে কে? হাস্‌চো কেন খোকা, এটা কি নাট্যশালা? অ্যাঁ, এটা নাট্যশালা নাকি?"

নাট্যশালা কি অপু তাহা বুঝিতে পারিল না, কিন্তু ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া গেল।

"সতে, একখানা থান ইট্ নিয়ে আয় তো তেঁতুলতলা থেকে, বেশ বড় দেখে।"

অপু ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া উঠিল, তাহার গলা পর্য্যন্ত কাঠ হইয়া গেল, কিন্তু ইট্ আনীত হইলে সে দেখিল, ইটের ব্যবস্থা তাহার জন্য নহে, ঐ ছেলেছুটির জন্য। বয়স্ অল্প বলিয়াই হউক বা নতুন ভর্ত্তি ছাত্র বলিয়াই হউক, গুরুমহাশয় সে যাত্রা তাহাকে রেহাই দিলেন।

পাঠশালা বসিত বৈকালে। সবশুদ্ধ আট দশটি ছেলেমেয়ে পড়িতে আসে। সকলেই বাড়ী হইতে ছোট ছোট মাতুর আনিয়া পাতিয়া বসে, অপুর মাতুর নাই, সে বাড়ী হইতে একখানা জীর্ণ কার্পেটের আসন আনে। যে ঘরটায় পাঠশালা হয়, তার কোনো দিকে বেড়া বা দেওয়াল কিছুই নাই, চারিধারে খোলা, ঘরের মধ্যে সারি দিয়া ছাত্রগণ বসে। পাঠশালা-ঘরের চারিপাশে বন, পিছন দিকে গুরুমহাশয়ের পৈতৃক আমলের বাগান। অপরাহ্ণের তাজা, গরম রৌদ্র বাতাবীলেবু, গাব, ও পেয়ারাতলী আম গাছটার ফাঁক দিয়া পাঠশালা-ঘরের বাঁশের খুঁটির পায়ে আসিয়া পড়িয়াছে। নিকটে অন্য কোনোদিকে কোনো বাড়ী নাই, শুধু বন ও বাগান, একধারে একটা সরু পথ।

আট দশটি ছেলেমেয়ের মধ্যে সকলেই বেত্রাব দুলিয়া ও নানারূপ স্বর করিয়া পড়া মুখস্থ করে ; মাঝে মাঝে গুরুমহাশয়ের গলা শুনা যায়—"এই ক্যাব্‌লা, ওর শেলেটের দিকে চেয়ে কি দেখ্‌চিস্‌? কান মলে ছিঁড়ে দেবো একেবারে। হুটু, তোর কথার নেতি ভিজুতে হবে? ফের্‌ যদি দেখি নেতি ভিজুতে উঠেচিস্‌—"

গুরুমহাশয় একটা খুঁটি হেলান দিয়া একখানা তালপাতার চাটাইএর উপর বসিয়া থাকেন। মাথার তেলে বাঁশের খুঁটির হেলান-দেওয়া অংশটা পাকিয়া গিয়াছে। বিকাল বেলা প্রায়ই গ্রামের দীনু পালিত কি রাজু রায় তাঁহার সহিত গল্প করিতে আসেন। পড়াশুনার চেয়ে এই গল্প শোনা অপুর অনেক বেশী ভাল লাগিত। রাজু রায় মহাশয় প্রথম যৌবনে বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস স্মরণ করিয়া কি করিয়া আষাড়ুর হাটে তামাকের দোকান খুলিয়াছিলেন সে গল্প করিতেন। অপু অবাক্‌ হইয়া শুনিত। বেশ কেমন নিজের ছোট্ট দোকানের ঝাঁপ্‌টা তুলিয়া বসিয়া দা দিয়া তামাক কাটা, তারপর রাত্রে নদীতে যাওয়া, ছোট্ট হাঁড়িতে মাছের ঝোল ভাত রাঁধিয়া খাওয়া, হয় মাঝে মাঝে তাদের সেই ছেঁড়া মহাভারতখানা, কি বাবার সেই দাশুরায়ের পাঁচালীখানা ম্যাটীর প্রদীপের সাম্‌নে খুলিয়া বসিয়া বসিয়া পড়া। বাহিরে অন্ধকার বর্ষারাতে টিপ্‌ টিপ্‌ বৃষ্টি পড়িতেছে, কেহ কোথাও নাই, পিছনের ডোবায় ব্যাঙ ডাকিতেছে—কি সুন্দর! —বড় হইলে সে তামাকের দোকান করিবে!

এই গল্পগুজব এক এক দিন আবার ভাব ও কল্পনার সর্ব্বোচ্চ স্তরে উঠিত—গ্রামের ওপাড়ার রাজকৃষ্ণ সান্ন্যাল মহাশয়

যে দিন আসিতেন। যে কোনো গল্প হউক, যত সামান্যই হউক না কেন, সেটি সাজাইয়া বলিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল অসাধারণ। সান্যাল মহাশয় দেশভ্রমণ-বাতিকগ্রস্ত ছিলেন। কোথায় দ্বারকা, কোথায় সাবিত্রী পাহাড়, কোথায় চন্দ্রনাথ—তাহা আবার একা দেখিয়া তাঁহার তৃপ্তি হইত না, প্রতিবারেই স্ত্রীপুত্র লইয়া যাইতেন এবং খরচপত্র করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ফিরিতেন।

একটা মোটা লাঠি হাতে তিনি লম্বা পা ফেলিয়া পাঠশালায় আসিয়া উপস্থিত হইতেন—"এই প্রসন্ন, কি রকম আছো? বেশ জাল পেতে বসেচ যে। কটা মাছি পড়লো?" নামতা মুখস্থ-রত অপু অমনি অসীম আহ্লাদে উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। সান্যাল মহাশয় যেখানে তালপাতার চাটাই টানিয়া বসিয়াছেন, সেদিকে হাতখানেক জমি উৎসাহে আগাইয়া বসিত। শ্লেট, বই মুড়িয়া একপাশে রাখিয়া দিত—যেন আজ ছুটি হইয়া গিয়াছে, আর পড়াশুনার দরকার নাই; সঙ্গে সঙ্গে তাহার ডাগর ও উৎসুক চোখদুটি গল্পের প্রত্যেকটি কথা যেন দুর্ভিক্ষের ক্ষুধার আগ্রহে গিলিত।

কুঠির মাঠের পথে যে জায়গাটাকে এখন নালতাকুড়ির জোল' বলে, ঐখানে আগে—অনেক কাল আগে—গ্রামের মতি হাজরার ভাই চন্দর্ হাজরা বনের গাছ কাটিতে গিয়াছিল। বর্ষাকাল—এখানে ওখানে বৃষ্টির জলের তোড়ে মাটি খসিয়া পড়িয়াছিল, হঠাৎ চন্দর্ হাজরা দেখিল এক জায়গায় যেন একটা পিতলের হাঁড়ির কাণামত মাটির মধ্য হইতে একটুখানি বাহির হইয়া আছে। তখনই সে খুঁড়িয়া বাহির করিল। বাড়ী আনিয়া দেখে এক হাঁড়ি সেকেলে আমলের টাকা। তাই পাইয়া চন্দর্

হাজ্‌রা দিনকত বাবুগিরি করিয়া বেড়াইল।—এসব সান্ন্যাল মহাশয়ের নিজের চোখে দেখা।

এক একদিন রেলভ্রমণের গল্প উঠিত। কোথায় সাবিত্রী পাহাড় আছে, তাহাতে উঠিতে তাঁহার স্ত্রীর কি রকম কষ্ট হইয়াছিল—গয়ায় পিণ্ড দিতে গিয়া পাণ্ডার সঙ্গে হাতাহাতি হইবার উপক্রম। কোথাকার এক জায়গায় একটা খুব ভাল খাবার পাওয়া যায়, সান্ন্যাল মহাশয় নাম বলিলেন—প্যাঁড়া। নামটা শুনিয়া অপুর ভারী হাসি পাইয়াছিল।—বড় হইলে সে "প্যাঁড়া" কিনিয়া খাইবে।

কোন্ দেশে সান্ন্যাল মহাশয় একজন ফকিরকে দেখিয়াছিলেন, সে এক অশ্বথ-তলায় থাকিত। এক ছিলিম গাঁজা পাইলে সে খুসি হইয়া বলিত—"আচ্ছা কোন্ ফল তোমরা খাইতে চাও, বল।" পরে ঈপ্সিত ফলের নাম করিলে সে সম্মুখের যে কোনো একটা গাছ দেখাইয়া বলিত—"যাও ওখানে গিয়া লইয়া আইস।" লোকে গিয়া দেখিত হয়ত আম গাছে বেদানা ফলিয়া আছে, কিংবা পেয়ারা গাছে কলার কাঁদি ঝুলিয়া আছে!

রাজু রায় বলিতেন—"ও সব মন্তর তন্তরের খেলা আর কি। সে বার আমার এক মামা—"

দীনু পালিত কথা চাপা দিয়া বলিতেন—"মন্তরের কথা যখন ওঠালে, তখন একটা গল্প বলি শোনো। গল্প নয়, আমার স্বচক্ষে দেখা। বেলেডাঙ্গার বুধো গাড়োয়ানকে তোমরা দেখেচো কেউ? রাজু না দেখে থাকো রাজকৃষ্ণ ভায়া তো খুব দেখেচো। কাঠের দড়ি বাঁধা এক ধরণের খড়ম পায়ে দিয়ে বুড়ো বরাবর নিতে কামারের দোকানে লাঙ্গলের ফাল পোড়াতে

আস্তো। একশ বছর বয়সে মারা যায়, মারাও গিয়েচে আজ পাঁচিশ বছরের ওপর। জোয়ান বয়সেও আমরা তার সঙ্গে হাতের কব্জির জোরে পেরে উঠতাম না। একবার—অনেক কালের কথা—আমার তখন সবে হয়েচে উনিশ কুড়ি বয়েস, চাকদা' থেকে গঙ্গাচান ক'রে গরুর গাড়ী ক'রে ফিরছি। বুধো গাড়োয়ানের গাড়ী—গাড়ীতে আমি, আমার খুড়ীমা, আর অনন্ত মুখুয্যের ভাইপো রাম। কানসোনার মাঠের কাছে প্রায় বেলা গেল, তখন ওসব দিকে কি রকম ভয়ভীত্ ছিল, তা রাজকৃষ্ণ ভায়া জানো নিশ্চয়। একে মাঠের রাস্তা, সঙ্গে মেয়েমানুষের দল, কিছু টাকাকড়িও আছে—বড্ড ভাবনা হোল। আজকাল যেখানে নতুন গাঁ খানা বসেচে—ওই বরাবর এসে হোল কি জানো? জন চারেক ষণ্ডামার্কগোছের মিশ্ কালো লোক এসে গাড়ীর পেছন দিকের বাঁশ দুদিক থেকে ধল্লে। এদিকে দুজন, ওদিকে দুজন। দেখে তো মশাই আমাদের মুখে আর রা-টা নেই। কোনো রকমে গাড়ীর মধ্যে ব'সে আছি, এদিকে তারাও গাড়ীর বাঁশ ধ'রে সঙ্গেই আস্চে, সঙ্গেই আস্চে, সঙ্গেই আস্চে। বুধো গাড়োয়ান দেখি পিট্ পিট্ ক'রে পেছন দিকে চাইচে। ইসারা ক'রে আমাদের কথা বলতে বারণ ক'রে দিলে। এদিকে গাড়ী একেবারে নবাবগঞ্জ থানার কাছাকাছি এসে পড়ল। বাজার দেখা যাচ্চে, তখন সেই লোক ক'জন বল্লে—'ওস্তাদজী, আমাদের ঘাট হয়েচে, আমরা বুঝতে পারিনি, ছেড়ে দাও।' বুধো গাড়োয়ান বল্লে—'সে হবে না ব্যাটারা। আজ সব থানায় নিয়ে গিয়ে বাঁধিয়ে দোব'—অনেক কাকুতি মিনতির পর বুধো বল্লে—'আচ্ছা যা ছেড়ে দিলাম এবার, কিন্তু কখ্খনো এরকম

আর করিস্‌নি!' তবে তারা বুধো গাড়োয়ানের পায়ের ধুলো নিয়ে চ'লে গেল। আমার স্বচক্ষে দেখা। ওই যে ওরা বাঁশ এসে ধরেচে, মন্তরের চোটে অমনি ধরেই র'য়েচে—আর ছাড়াবার সাধ্যি নেই—চলেচে গাড়ীর সঙ্গে। একেবারে পেরেক আঁটা হ'য়ে গিয়েচে। তা বুঝলে বাপু? মন্তর তন্তরের কথা—"

গল্প বলিতে বলিতে বেলা যাইত। পাঠশালার চারিপাশের বনজঙ্গলে অপরাহ্নের রাঙা রৌদ্র বাঁকা ভাবে আসিয়া পড়িত। কাঁটাল গাছের, জগ্‌গীডুমুর গাছের ডালে-ঝোলা গুলঞ্চ লতার গায়ে টুনটুনি পাখী মুখ উঁচু করিয়া বসিয়া দোল খাইত। পাঠশালা ঘরে বনের লতাপাতার গন্ধের সঙ্গে লতাপাতার চাটাই, ছেঁড়াখোঁড়া বই-দপ্তর, পাঠশালার মাটির মেজে, ও কড়া দা-কাটা তামাকের ধোঁয়া, সবশুদ্ধ মিলিয়া এক জটিল গন্ধের সৃষ্টি করিত।

সে গ্রামের ছায়াভরা মাটির পথে একটি মুগ্ধ গ্রাম্যবালকের ছবি আছে: বই-দপ্তর বগলে লইয়া সে তাহার দিদির পিছনে পিছনে সাজিমাটি দিয়া কাচা, সেলাই করা কাপড় পরিয়া পাঠশালা হইতে ফিরিতেছে, তাহার ছোট্ট মাথাটির অমন রেশমের মত নরম, চিক্কণ, সুখ-স্পর্শ চুলগুলি তাহার মা যত্ন করিয়া আঁচড়াইয়া দিয়াছে—তাহার ডাগর ডাগর সুন্দর চোখদুটিতে কেমন যেন অবাক্‌ ধরণের চাহনি—যেন তাহারা এ কোন্‌ অদ্ভুত জগতে নতুন চোখ মেলিয়া চাহিয়া চাহিয়া দিশাহারা হইয়া উঠিয়াছে! গাছপালায় ঘেরা এইটুকুই কেবল তার পরিচিত দেশ—এখানেই মা রোজ হাতে করিয়া খাওয়ায়, চুল আঁচড়াইয়া দেয়, দিদি কাপড় পরাইয়া দেয়, এই গণ্ডীটুকু ছাড়াইলেই তাহার চারিধার ঘিরিয়া অপরিচয়ের অকূল জলধি! তাহার শিশু-মন থৈ পায় না।

একদিন পাঠশালায় এমন একটি ঘটনা হইয়াছিল, যাহা তাহার জীবনের একটি নতুন অভিজ্ঞতা।

সেদিন বৈকালে পাঠশালায় অন্য কেহ উপস্থিত না থাকায় কোন গল্পগুজব হইল না, পড়াশুনা হইতেছিল—সে পড়িতেছিল 'শিশুবোধক'—এমন সময় গুরুমহাশয় বলিলেন—"দেখি, শেলেট নেও, শ্রুতিলিখন লেখো—"

মুখে মুখে বলিয়া গেলেও অপু বুঝিয়াছিল গুরুমহাশয় নিজের কথা বলিতেছেন না, মুখস্থ বলিতেছেন,—সে যেমন দাশুরায়ের পাঁচালী ছড়া মুখস্থ বলে, তেমনি।

শুনিতে শুনিতে তাহার মনে হইল অনেকগুলি অমন সুন্দর কথা একসঙ্গে পর পর সে কখনো শোনে নাই। ও সকল কথার অর্থ সে বুঝিতেছিল না, কিন্তু অজানা শব্দ ও ললিত পদের ধ্বনি, ঝঙ্কার জড়ানো এক অপরিচিত শব্দসঙ্গীত, অনভ্যস্ত শিশু-কর্ণে অপূর্ব্ব ঠেকিল এবং সব কথার অর্থ না বোঝার দরুনই কুহেলি-ঘেরা অস্পষ্ট শব্দ-সমষ্টির পিছন হইতে একটা অপূর্ব্ব দেশের ছবি বার বার উঁকি মারিতেছিল।

বড় হইয়া স্কুলে পড়িবার সময় সে বাহির করিয়াছিল ছেলেবেলাকার এই মুখস্থ শ্রুতিলিখন কোথায় আছে—

"এই সেই জনস্থান-মধ্যবর্ত্তী প্রস্রবণ গিরি। ইহার শিখরদেশ আকাশপথে সতত-সমীর-সঞ্চরমান-জলধর-পটল-সংযোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত......অধিত্যকা প্রদেশ ঘন-সন্নিবিষ্ট বনপাদপ-সমূহে সমাচ্ছন্ন থাকাতে স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়...... পাদদেশে প্রসন্ন-সলিলা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া......।"

সে ঠিক বলিতে পারে না, বুঝাইতে পারে না, কিন্তু সে

জানে—তাহার মনে হয়, অনেক সময়েই মনে হয়। সেই যে সে বছর-দুই আগে কুঠির মাঠে সরস্বতী পূজার দিন নীলকণ্ঠ পাখী দেখিতে গিয়াছিল, সেদিন মাঠের ধার বাহিয়া একটা পথকে দূরে কোথায় যাইতে দেখিয়াছিল। পথটার দুধারে কত কি অচেনা পাখী, অচেনা গাছপালা, অচেনা বনঝোপ। সে জানিত পথটা গিয়াছে রামায়ণ-মহাভারতের দেশে।

শ্রুতিলিখন শুনিতে শুনিতে সেই দুই বছর আগে দেখা পথটার কথাই তাহার মনে হইয়া গেল।

ঐ পথের ওধারে অনেক দূরে কোথায় সেই জনস্থান-মধ্যবর্ত্তী প্রস্রবণ পর্ব্বত। সেই স্বপ্নলোকের ছবি তাহাকে অবাক্ করিয়া দিল। কতদূরে সেই প্রস্রবণ গিরির উন্নত শিখর?—সে বড় হইলে যাইয়া দেখিবে।

কিন্তু সে বেতসীকণ্টকিত তট, সে বিচিত্রপুলিনা গোদাবরী, সে শ্যামল জনস্থান, নীল মেঘমালায় ঘেরা সে অপূর্ব্ব শৈলপ্রস্থ, রামায়ণে বর্ণিত কোনো দেশে ছিল না। কেবল অতীত দিনের কোনো পাখী-ডাকা গ্রাম্য সন্ধ্যায় এক মুগ্ধমতি গ্রাম্যবালকের অপরিণত শিশু-কল্পনার দেশে তাহারা ছিল বাস্তব, একেবারে খাঁটি, অতি সুপরিচিত।

পঞ্চাংশ

ভ্রাতৃভক্তি

কৃত্তিবাস ওঝা

[নদীয়া জেলার ফুলিয়া গ্রামে প্রসিদ্ধ মুখোপাধ্যায় বংশে কবিবর কৃত্তিবাস ওঝা সম্ভবতঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া গৌড়েশ্বরের সভায় উপস্থিত হন। এই গৌড়েশ্বর সম্ভবতঃ রাজা গণেশ। ইনি কবির রচিত শ্লোক-পঞ্চকের অপূর্ব্ব কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া কবিকে অভিনন্দন করেন, এবং বাল্মীকির রামায়ণ বাঙ্গালায় অনুবাদ করিতে আদেশ করেন। এই আদেশ-পালনের ফল বঙ্গের অপূর্ব্ব ভাষা-রামায়ণ, যাহার অফুরন্ত রস সুদীর্ঘ পাঁচ শত বৎসর যাবৎ বঙ্গীয় নরনারীর হৃদয় সরস করিয়া রাখিয়াছে। কৃত্তিবাসের পিতামহ ছিলেন মুরারি ওঝা এবং তাঁহার পিতার নাম বনমালী ও মাতার নাম মালিনী। কৃত্তিবাস অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই স্বর্গারোহণ করেন।]

শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর জনকের বালা।
বসতি করেন নির্ম্মাইয়া পর্ণশালা॥
তার দ্বারে বসিয়া আছেন রঘুবীর।
জানকী তাহার মধ্যে, লক্ষ্মণ বাহির॥
হেন কালে ভরত শত্রুঘ্ন দীনবেশে।
শ্রীরামের আশ্রমেতে যাইয়া প্রবেশে॥
গলবস্ত্র ভরত নয়নে বহে নীর।
পথ-পর্য্যটনে অতি মলিন শরীর॥
পড়িলেন শ্রীরামের চরণ-কমলে।
আনন্দে শ্রীরাম তাঁরে লইলেন কোলে॥

ভরত কহেন ধরি' রামের চরণ।
"কার বাক্যে রাজ্য ছাড়ি' বনে আগমন?
বামা জাতি স্বভাবতঃ বামা-বুদ্ধি ধরে।
তার বাক্যে কে কোথা গিয়াছে দেশান্তরে?
অপরাধ ক্ষমা কর, চল প্রভু দেশ।
সিংহাসনে বসিয়া ঘুচাও মনঃক্লেশ॥
অযোধ্যাভূষণ তুমি অযোধ্যার সার।
তোমা বিনা অযোধ্যা দিবসে অন্ধকার॥
চল প্রভু, অযোধ্যার লহ রাজ্যভার।
দাসবৎ কর্ম্ম করি আজ্ঞা-অনুসার॥"
শ্রীরাম বলেন, "তুমি ভরত পণ্ডিত।
না বুঝিয়া কেন বল, এ নহে উচিত॥
মিথ্যা অনুযোগ কেন কর বিমাতার।
বনে আইলাম আমি আজ্ঞায় পিতার
চতুর্দ্দশ বৎসর পালিয়া পিতৃবাক্য।
অযোধ্যা যাইব আমি দেখিবে প্রত্যক্ষ॥"
শ্রীরামেরে বলেন বশিষ্ঠ মহাশয়।
"ভরতের প্রতি রাম কি অনুজ্ঞা হয়॥
তোমা বিনা ভরতের আর নাহি গতি।
বুঝিয়া ভরতে রাম, কর অনুমতি॥"
শ্রীরাম বলেন, "মুনি, হইলাম সুখী।
প্রাণের অধিক আমি ভরতেরে দেখি॥
ভরতে আমাতে নাহি করি অন্য ভাব।
ভরতের রাজত্বে আমার রাজ্যলাভ॥

যাও ভাই ভরত, ত্বরিত অযোধ্যায়।
মন্ত্রিগণ লয়ে রাজ্য করহ তথায়॥
সিংহাসন শূন্য আছে, ভয় করি মনে।
কোন্ শত্রু আপদ্ ঘটাবে কোন্ ক্ষণে॥
তোমারে জানাব কত, আছ যে বিদিত।
বিবেচনা করিবা সর্ব্বদা হিতাহিত॥
চতুর্দ্দশ বৎসর জানহ গত-প্রায়।
চারি ভাই একত্র হইব অযোধ্যায়॥"

যোড়হাতে ভরত বলেন সবিনয়।
"কেমনে রাখিব রাজ্য, মম কার্য্য নয়॥
তোমার পাদুকা দেহ, করি গিয়া রাজা।
তবে সে পারিব রাম, পালিবারে প্রজা॥
তোমার পাদুকা যদি থাকে রাম, ঘরে।
ত্রিভুবনে আমার কি করে কার ডরে?"
শ্রীরাম বলেন, "হে ভরত, প্রাণাধিক।
পাদুকা লইয়া যাও, কি কব অধিক॥
নন্দীগ্রামে পাট করি' কর রাজকার্য্য।
সাবধান হইয়া পালিহ পিতৃরাজ্য॥

শ্রীরামের পাদুকা ভরত শিরে ধরে।
ভাবে পুলকিত অঙ্গ প্রফুল্ল অন্তরে॥
পাদুকার অভিষেক করিয়া তথায়।
চলিলেন ভরত শ্রীরামের আজ্ঞায়॥

বাৎসল্য

চণ্ডীদাস

[চণ্ডীদাস বাঙ্গালা-সাহিত্যের একজন প্রধান গীতি-কবি। রাধাকৃষ্ণের লীলাই ইঁহার কবিতার মুখ্য বিষয়। অনেকের মতে ইনি পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জীবিত ছিলেন।]

বেশ বনাইছে মায়।
চাঁচর চিকুর বনাই সুন্দর
চূড়াটি বাঁধিল তায়॥
ময়ূর-শিখণ্ড দিয়া তার 'পর
বিনি বায়ে দেখ উড়ে।
ফুলের সৌরভে অলিকুল যত
উড়িয়া উড়িয়া পড়ে॥
দুদিকে দুকানে কদম্বের ফুল
কি শোভা পেয়েছে দেখি।
নীলমণি যেন হেন লয় মন,
নবঘন কিসে পোঁখি?
কপালে মলয়- চন্দন-তিলক
তাহে গোরোচনা-ফোঁটা।
শ্রীমুখ ঝলকে যেমন অলকে
পূর্ণিমা-চাঁদের ঘটা॥

অধর-বান্ধুলি যেন রাতা গুলি[১]
কি জানি হিঙ্গুলে দলি।
নয়ন-চাতক তাহাতে কাজল
অতি সে শোভন ভালি॥
বাহে[২] তাড়[৩] বালা গলে বনমালা
কটীতে ঘুঙ্গুর বায়[৪]।
করেতে মুরলী শোভে দেখ ভালি
রতন-নূপুর পায়॥
চণ্ডীদাসে কয় নটবর-রূপ
সদাই দেখিয়ে থাকি।
হেন মনে হয় নীল নবঘন
হিয়াতে ভরিয়া রাখি॥

---

১ রাতা গুলি—লাল রঙের গুটিকা বা গুলি বা বড়ি।
২ বাহে—বাহুতে (প্রাচীন বাঙ্গালা 'বাহ'='বাহু')।
৩ তাড়—তাড়ক, অনন্ত বা তাগা।
৪ বায়—বাজে।

মাতৃস্নেহ

যাদবেন্দ্র

[যাদবেন্দ্র জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। বীরভূম জেলার শিউড়ীর নিকটবর্ত্তী হারিশপুর গ্রামে ইঁহার বাস ছিল। ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে জীবিত ছিলেন। বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে বাৎসল্য রসের কবিতা রচনা করিয়া ইনি খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।]

"আমার শপতি লাগে না ধাইও ধেনুর আগে
পরাণের পরাণ নীলমণি।
নিকটে রাখিও ধেনু, পূরিও মোহন বেণু,
ঘরে ব'সে আমি যেন শুনি॥
বলাই খাইবে আগে, আর শিশু বামভাগে,
শ্রীদাম সুদাম সব পাছে।
তুমি তার মাঝে ধাইও, সঙ্গ-ছাড়া না হইও,
মাঠে বড় রিপু[1]-ভয় আছে॥
ক্ষুধা পেলে চাঞা খাইও, পথ পানে চাহি' যাইও—
অতিশয় তৃণাঙ্কুর পথে।
কারু বোলে বড় ধেনু ফিরাইতে না যাইও কানু,—
হাত তুলি' দেহ মোর মাথে॥
থাকিও তরুর ছায়, মিনতি করিছে মায়,
রবি যেন না লাগয়ে গায়।
তৃষা হ'লে চেয়ো বারি, বলাই ধরিবে ঝারি,
না নামিও যেন যমুনায়।
যাদবেন্দ্রে সঙ্গে লইও, বাধা পানই[2] হাতে থুইও,
বুঝিয়া যোগাবে রাঙা পায়॥"

---

১ রিপু—কংস-চর। ২ বাধা পানই—পাদুকা।

গুরুভক্তি

কাশীরাম দাস

[বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত সিঙ্গি গ্রামে কাশীরাম দাস জন্মগ্রহণ করেন। ইঁনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন ; ইঁহাদের পদবী ছিল "দেব"। শুনা যায়, কথকের মুখে মূল মহাভারত শুনিয়া ইঁনি বাঙ্গালা পদ্যে মহাভারত রচনা করেন। কিন্তু এ বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। কাশীরাম সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগের লোক। ইঁহার মহাভারত গত কয়েক শতাব্দী ধরিয়া বঙ্গের ঘরে ঘরে অপরিসীম শ্রদ্ধার সহিত পঠিত হইয়া আসিতেছে।]

অবন্তীনগরে দ্বিজ ছিল একজন।
তাঁর স্থানে শিষ্যগণ করে অধ্যয়ন॥
এক শিষ্যে দ্বিজ গাভী কৈল সমর্পণ।
গুরু-আজ্ঞা পেয়ে তারে করেন রক্ষণ॥
কতদিনে বলে গুরু, "কহ শিষ্যবর।
বড় পুষ্ট দেখি যে তোমার কলেবর॥
কিবা খাও, কোথা পাও, কহ সত্যবাণী।"
শুনিয়া বলেন শিষ্য করি' যোড়পাণি॥
"গাভীগণ-দোহনান্তে পিয়ে বৎসগণ।
পশ্চাতে খাই যে আমি করিয়া দোহন॥"
গুরু বলে, "এত দিনে সব জানা গেল।
এই হেতু বৎসগণ দুর্ব্বল হইল॥
আর কভু তুমি না করিহ হেন কাজ।
গাভী দুহি' খাও তুমি—নাহি ভয় লাজ?"
গুরু-আজ্ঞা শুনি দ্বিজ গেল গাভী লৈয়া।
কত দিনে পুনঃ বিপ্র কহিল ডাকিয়া॥

22—1840 B.T.

"উচিত কহিতে শিষ্য, না হইও রুষ্ট।
পুনশ্চ তোমারে বড় দেখি হৃষ্টপুষ্ট ॥
গাভী-দুগ্ধ পুনঃ বুঝি তুমি কর পান ?"
শিষ্য বলে, "গোসাঞি, করহ অবধান ॥
যেই দিন হইতে তুমি করিলা বারণ।
ভিক্ষা করি' নিত্য করি উদর-পূরণ ॥"
গুরু বলে, "ভিক্ষা করি' পূরহ উদরে।
এবে ভিক্ষা করি' সব আনি দিও মোরে ॥"
এত শুনি' গাভী ল'য়ে গেল দ্বিজবর।
পুনঃ জিজ্ঞাসিল কত দিবস-অন্তর ॥
"কহ শিষ্য, বড় পুষ্ট দেখি তব কায়।
কি খাইয়া আছ এবে কহিবা আমায় ?"
শিষ্য বলে, "গাভী রাখি অরণ্য-ভিতর।
রক্ষক রাখিয়া আমি যাই যে নগর ॥
দিবসেতে যত ভিক্ষা দিই তব ঘরে
সন্ধ্যাতে মাগিয়া ভিক্ষা ভরি যে উদরে ॥"
হাসিয়া বলিল গুরু, "এ কোন্ বিচার।
শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা রাত্রে তুমি কর আপনার ॥
রাত্রি-দিবা যত পাও আনি' দিও মোরে
এত শুনি' গাভী ল'য়ে গেল বন ঘোরে ॥
ক্ষুধায় আকুল তনু ভ্রমে বনে-বন।
অর্কের কোমল পত্র করয়ে ভক্ষণ ॥
বড়ই দুর্ব্বল হৈল শীর্ণ হইল কায়।
দেখিতে না পায় তবু গোধন চরায় ॥

ভ্রমিতে ভ্রমিতে দেখ দৈবের লিখন।
নিরুদক কূপ-মধ্যে পড়িল ব্রাহ্মণ॥
সমস্ত দিবস গেল হৈল সন্ধ্যাকাল।
গৃহেতে আইল যত গোধনের পাল॥
শিষ্যে না দেখিয়া গুরু দুঃখিত-অন্তর।
অন্বেষণে গেল দ্বিজ অরণ্য-ভিতর॥
"কোথা গেলে উপমন্যু, ডাকে দ্বিজবর।
উপমন্যু বলে, আমি কূপের ভিতর॥"
গুরু বলে, "কূপ-মধ্যে পড়িলা কিমতে?"
উপমন্যু বলে, "চক্ষে না পাই দেখিতে॥
অর্কপত্র খাইয়া নয়ন অন্ধ হইল।"
শুনিয়া আচার্য্য তবে উপদেশ কৈল॥
"দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমার দুইজন।
শীঘ্র কর দ্বিজবর তাঁদের স্মরণ॥"
এত শুনি' দ্বিজ বহু স্তবন করিল।
ততক্ষণে দুই চক্ষু নির্ম্মল হইল॥
কূপ হৈতে উঠিয়া ধরিল গুরুপদ।
সন্তুষ্ট হইয়া গুরু কৈল আশীর্ব্বাদ॥
"চারি বেদ যত শাস্ত্র জানহ সকলে।
যাহ দ্বিজ নিজ গৃহে পরম কুশলে॥"
আজ্ঞা পেয়ে গেল দ্বিজ আহ্লাদিত মনে।
সর্ব্বশাস্ত্রে জ্ঞান হৈল গুরুর বচনে॥

কালকেতু

মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী

[মুকুন্দরাম ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য ভাগে বর্দ্ধমান জেলার দামুন্যা গ্রামে জন্ম-গ্রহণ করেন। ইনি মেদিনীপুর জেলার আড়রা গ্রামের রাজা বাঁকুড়া রায়ের পুত্র রঘুনাথ রায়ের শিক্ষক ও সভাকবি ছিলেন এবং রাজসম্মান-স্বরূপ 'কবিকঙ্কণ' উপাধি লাভ করেন। ইনি 'চণ্ডী-মঙ্গল' গ্রন্থ রচনা করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন।]

দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু ;
জিনিয়া মাতঙ্গ-গতি, যেন নব রতি-পতি
সবার লোচন-সুখ-হেতু।
নাক মুখ চক্ষু কান, কুন্দে যেন নিরমাণ,
দুই বাহু লোহার শাবল ;
গুণ, শীল রূপ বাড়া, যেন সে শালের কোঁড়া,
জিনি' শ্যাম-চামর কুন্তল।
বিচিত্র কপাল-তটী, গলায় জালের কাঁঠী,
কর-যুগে লোহার শিকলী ;
বুক শোভে বাঘ-নখে, অঙ্গে রাঙ্গা ধূলি মাখে,
তনু-মাঝে শোভিছে ত্রিবলী।
কপাট-বিশাল বুক, জিনি' ইন্দীবর মুখ,
আকর্ণ-দীঘল বিলোচন ;
গতি জিনি' গজরাজ, কেশরী জিনিয়া মাঝ,
মোতি-পাঁতি জিনিয়া দশন।

দুই চক্ষু জিনি' নাটা,[১] ঘুরে যেন কুঁচ-ভাঁটা,[২]
কানে শোভে স্ফটিক-কুণ্ডল,
পরিধান বীর-ধড়ি,[৩] মাথায় জালের দড়ি
শিশু-মাঝে যেমন মণ্ডল।
লইয়া কাউড়া[৪] ডেলা যার সঙ্গে করে খেলা,
তার হয় জীবন-সংশয়,—
যে জনে আঁকড়ি' ধরে পাড়য়ে ধরণী 'পরে;
ভয়ে কেহ নিকটে না রয়।
সঙ্গে শিশুগণ ফিরে, তাড়িয়া শশারু[৫] ধরে,
দূরে গেলে ছুবায়[৬] কুকুরে,
বিহঙ্গ বাঁটুলে বিন্ধে, লতায় জড়িয়া বান্ধে,
কান্ধে ভার বীর আইসে ঘরে।

---

১ নাটা—একপ্রকার রক্তাভ কৃষ্ণবর্ণ ফল, আকারে চোখের মত।

২ কুঁচ-ভাঁটা—কুঁচ বা গুঞ্জা ফলের মত লাল ও কাল রঙের ভাঁটা বা গোলা।

৩ ধড়ি—ধটী, ছোট মাপের কাপড়; বীর বা মালের মত মাল-কোঁচা করিয়া পরা।

৪ কাউড়া—কাবড়া, ছোট লাঠি বা ডাণ্ডা।

৫ শশারু—খরগোস ('শশক-রূপ')।

৬ ছুবায়—ছুঃ ছুঃ করিয়া লেলাইয়া দেয়।

অন্নদার আত্মপরিচয়

ভারতচন্দ্র রায়

[রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় হুগলী জেলার পেঁড়ো-বসন্তপুর গ্রামে ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ঐ গ্রামের জমীদার রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের চতুর্থ পুত্র। অতি অল্প বয়সেই বর্দ্ধমানাধিপতির কোপদৃষ্টিতে পড়িয়া ভারতচন্দ্রকে জন্মভূমি ত্যাগ করিতে হয়। পরে নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ইঁহার গুণপনা ও কবিত্বশক্তির কথা লোকমুখে শুনিয়া ইঁহাকে ৪০৲ টাকা বেতনে আপনার সভাসদ্-পদে নিযুক্ত করেন। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' এবং 'বিদ্যাসুন্দর' মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশ-অনুসারে এই সময়ে রচিত হয়। ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ৪৮ বৎসর বয়সে ভারতচন্দ্র পরলোক-গমন করেন। ইঁহার রচিত 'অন্নদামঙ্গল,' 'বিদ্যাসুন্দর,' 'মানসিংহ' প্রভৃতি বঙ্গ-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্।]

অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গনীর তীরে।
"পার কর" বলিয়া ডাকিলা পাটনীরে॥
সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী।
ত্বরায় আনিল নৌকা বামাস্বর শুনি'॥
ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটনী।
"একা দেখি কুলবধূ, কে বট আপনি?
পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার।
ভয় করি, কি জানি কে দিবে ফেরফার॥"

ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী।
"বুঝহ ঈশ্বরী, আমি পরিচয় করি॥
বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি।
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী॥
গোত্রের প্রধান পিতা মুখ্যবংশজাত
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্যবংশখ্যাত॥
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম।
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম॥
অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন॥
কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ।
গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।
জীবনস্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি॥
ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে।
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে॥
অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই।
যে মোরে আপন ভাবে তারি ঘরে যাই॥"

পাটনী বলিছে, "মা গো, বুঝিনু সকল।
যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কোন্দল॥
শীঘ্র আসি নায়ে চড়, দিবা কিবা বল।"
দেবী কন, "দিব, আগে পারে লয়ে চল॥"

যার নামে পার করে ভব-পারাবার।
ভাল ভাগ্য, পাটনী তাহারে করে পার॥

বসিয়া নায়ের ধারে নামাইয়া পদ।
কিবা শোভা—নদীতে ফুটিল কোকনদ॥
পাটনী বলিছে, "মা গো, বৈস ভাল হয়ে
পায়ে ধরি কি জানি কুমীরে যাবে লয়ে॥"
ভবানী কহেন, "তোর নায়ে ভরা জল।
আলতা ধুইবে, পদ কোথা থুব বল্?"
পাটনী বলিছে, "মা গো, শুন নিবেদন।
সেঁউতী উপরে রাখ ও রাঙ্গা চরণ॥"
পাটনীর বাক্যে মাতা হাসিয়া অন্তরে।
রাখিলা দুখানি পদ সেঁউতী উপরে॥
বিধি বিষ্ণু ইন্দ্র চন্দ্র যে পদ ধেয়ায়।
হৃদে ধরি' ভূতনাথ ভূতলে লুটায়॥
সে পদ রাখিলা দেবী সেঁউতী উপরে।
তাঁর ইচ্ছা বিনা ইথে কি তপ সঞ্চরে?
সেঁউতীতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে।
সেঁউতী হইল সোনা দেখিতে দেখিতে॥
সোণার সেঁউতী দেখি পাটনীর ভয়।
এ মেয়ে ত মেয়ে নয়—দেবতা নিশ্চয়॥

মাতৃভূমি ও মাতৃভাষা

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

[চব্বিশ-পরগনার অন্তর্গত কাঁচ্‌ড়াপাড়া গ্রামে ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন সাত বৎসর বয়ঃক্রম কালেই ইনি মুখে মুখে কবিতা রচনা করিতে পারিতেন এবং যৌবনের প্রারম্ভেই সখের ও পেশাদারী কবির দলের গান রচনা করিয়া যশস্বী হন। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি 'সংবাদ-প্রভাকর' নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বাহির করিতে আরম্ভ করেন। এই সংবাদপত্র ব্যতীত 'সংবাদ-রত্নমালা,' 'পাষণ্ডপীড়ন' এবং 'সাধুরঞ্জন' নামক অপর তিনখানি সংবাদপত্রও ইনি সম্পাদন করিয়া'ছলেন। 'প্রবোধ-প্রভাকর' এবং 'হিত-প্রভাকর' নামক দুইখানি কবিতাপুস্তক ইনি রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইহা ছাড়া 'বোধেন্দুবিকাশ,' 'কলিনাটক,' 'শকুন্তলা' প্রভৃতি কয়েকখানি নাটকও ইনি রচনা করেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ৪৭ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়।]

জান না কি জীব তুমি, জননী জনম-ভূমি,
যে তোমায় হৃদয়ে রেখেছে ;
থাকিয়া মায়ের কোলে, সন্তানে জননী ভোলে,
কে কোথায় এমন দেখেছে !
ভূমিতে করিয়া বাস, ঘুমেতে পূরাও আশ,
জাগিলে না দিবা-বিভাবরী,
কত কাল হরিয়াছ, এই ধরা ধরিয়াছ,
জননী-জঠর পরিহরি।

প্রসূতি তোমার যেই, তাঁহার প্রসূতি এই,
বসুমাতা মাতা সবাকার,
কে বুঝে ক্ষিতির রীতি, জননীর স্নেহ-প্রীতি
সকলের উপরে তাঁহার।
কত শস্য ফল মূল, না হয় যাহার মূল
হীরকাদি রজত কাঞ্চন।
বাঁচাতে জীবের অসু, বক্ষেতে বিপুল বসু,
বসুমতী করেন ধারণ।
প্রকৃতির পূজা ধর, পুলকে প্রণাম কর,
প্রেমময়ী পৃথিবীর পদে,
বিশেষতঃ নিজ দেশে, প্রীতি রাখ সবিশেষে,
মুগ্ধ জীব যার মোহ-মদে।
ইন্দ্রের অমরাবতী, ভোগেতে না হয় মতি,
স্বর্গভোগ উপসর্গ সার,
শিবের কৈলাসধাম, শিবপূর্ণ বটে নাম,
শিবধাম স্বদেশ তোমার।
মিছা মণি মুক্তা হেম, স্বদেশের প্রিয় প্রেম,
তার চেয়ে রত্ন নাহি আর,
সুধাকরে কত সুধা?— দূর করে তৃষ্ণা ক্ষুধা,
স্বদেশের শুভসমাচার।
স্বদেশের প্রেম যত, সে-ই মাত্র অবগত,
বিদেশেতে অধিবাস যার,
ভাব-তুলি ধ্যানে ধ'রে, চিত্তপটে চিত্র করে
স্বদেশের সকল ব্যাপার।

ভ্রাতৃভাব ভাবি' মনে, দেখ দেশবাসিগণে
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া—
কতরূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।
স্বদেশের শাস্ত্রমতে, চল সত্য-ধর্ম্ম-পথে,
সুখে কর জ্ঞান-আলোচন,
পুষ্ট কর মাতৃভাষা, পূরাও মায়ের আশা,
দেশে কর বিদ্যা-বিতরণ।

মেঘনাদ ও বিভীষণ

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

[যশোহর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে ২৫এ জানুয়ারী মধুসূদন দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন এবং অনতিকাল পরেই খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া 'মাইকেল' নাম গ্রহণ করেন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ইনি হিন্দু কলেজ পরিত্যাগ করিয়া বিশপ্‌স্ কলেজে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। ইহার চার বৎসর পরে ইনি মাদ্রাজে গমন করিয়া তথাকার নানা ইংরেজী সংবাদপত্রের লেখক ও সম্পাদকের কার্য্য করেন। অতঃপর ইনি মাদ্রাজে প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। মাদ্রাজে থাকিতেই ইনি 'ক্যাপটিভ্ লেডি' নামক ইংরেজী কাব্য লিখিয়া কবি-প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া ইনি সংস্কৃত 'রত্নাবলী' নাটকের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন এবং তৎপরে 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটক প্রণয়ন করেন। অনন্তর একনিষ্ঠভাবে মাতৃভাষার চর্চ্চা আরম্ভ করিয়া ইনি 'তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য,' 'পদ্মাবতী নাটক,' 'বীরাঙ্গনা কাব্য,' 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য,' 'কৃষ্ণকুমারী নাটক,' 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রভৃতি প্রণয়ন করেন। মধুসূদন বাঙ্গালায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তক; 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' ছাড়া ইহার প্রায় সমস্ত কাব্যই অমিত্রাক্ষর ছন্দে বিরচিত। তদ্রচিত 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' বঙ্গভাষায় বিলাতী সনেটের অনুকরণে লিখিত।

য়ুরোপে যাইয়া মধুসূদন ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন এবং কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ইঁহার শেষ-জীবন দারিদ্র্য, ব্যাধি ও মানসিক অশান্তির ইতিহাস। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে আলিপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'মেঘনাদবধ কাব্য'ই শ্রেষ্ঠ। ইনি ঊনবিংশ শতাব্দীর যুগপ্রবর্ত্তক কবি।]

"এতক্ষণে"—অরিন্দম কহিলা বিষাদে,—
"জানিনু, কেমনে আসি' লক্ষ্মণ পশিল
রক্ষঃপুরে! হায়, তাত, উচিত কি তব
এ কাজ? নিকষা সতী তোমার জননী।—
সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ!—শূলীশম্ভুনিভ
কুম্ভকর্ণ!—ভ্রাতৃ-পুত্র বাসব-বিজয়ী!
নিজগৃহ-পথ, তাত, দেখাও তস্করে?
চণ্ডালে বসাও আনি' রাজার আলয়ে?
কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা, গুরুজন তুমি
পিতৃতুল্য। ছাড় দ্বার, যাব অস্ত্রাগারে;—
পাঠাইব রামানুজে শমন-ভবনে;—
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে।"

উত্তরিলা বিভীষণ,—"বৃথা এ সাধনা,
ধীমান্! রাঘব-দাস আমি; কি প্রকারে
তাঁহার বিপক্ষ কাজ করিব, রক্ষিতে
অনুরোধ?" উত্তরিলা কাতরে রাবণি,—
"হে পিতৃব্য, তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে!
রাঘবের দাস তুমি?—কেমনে ও মুখে
আনিলে এ কথা, তাত, কহ তা' দাসেরে!
স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে;
পড়ি' কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি
ধূলায়? হে রক্ষোরথি, ভুলিলে কেমনে—
কে তুমি? জনম তব কোন্ মহাকুলে?—
কে বা সে অধম রাম? স্বচ্ছ সরোবরে

করে কেলি রাজহংস পঙ্কজ-কাননে ;
যায় কি সে কভু, প্রভু, পঙ্কিল সলিলে,
শৈবাল-দলের ধাম ?—মৃগেন্দ্র-কেশরী,
কবে, হে বীর-কেশরি, সম্ভাষে শৃগালে
মিত্র-ভাবে ? অজ্ঞ দাস, বিজ্ঞতম তুমি ;
অবিদিত নহে কিছু তোমার চরণে।
ক্ষুদ্র-মতি নর, শূর, লক্ষ্মণ ; নহিলে
অস্ত্রহীন যোধে কি সে সম্বোধে সংগ্রামে ?
কহ, মহারথি, এ কি মহারথি-প্রথা ?
নাহি শিশু লঙ্কাপুরে, শুনি' না হাসিবে
এ কথা। ছাড়হ পথ ; আসিব ফিরিয়া
এখনি। দেখিব আজি, কোন্ দেব-বলে,
বিমুখে সমরে মোরে সৌমিত্রি কুমতি !
দেব-দৈত্য-নর-রণে, স্বচক্ষে দেখেছ,
রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, পরাক্রম দাসের। কি দেখি'
ডরিবে এ দাস হেন দুর্ব্বল মানবে ?
নিকুম্ভিলা-যজ্ঞাগারে প্রগল্‌ভে পশিল
দম্ভী ; আজ্ঞা কর দাসে, শাস্তি নরাধমে
তব জন্মপুরে, তাত, পদার্পণ করে
বনবাসী !—হে বিধাতঃ, নন্দন-কাননে
ভ্রমে দুরাচার দৈত্য ! প্রফুল্ল কমলে
কীট-বাস !—কহ, তাত, সহিব কেমনে
হেন অপমান আমি—ভ্রাতৃ-পুত্র তব ?—
তুমিও, হে রক্ষোমণি, সহিছ কেমনে ?"

মহামন্ত্র-বলে যথা নম্রশিরঃ ফণী,
মলিন-বদন লাজে, উত্তরিলা রথী
রাবণ-অনুজ, লক্ষ্যি' রাবণ-আত্মজে,—
"নহি দোষী আমি, বৎস; বৃথা ভৎস মোরে
তুমি। নিজ কর্ম্ম-দোষে, হায়, মজাইলা
এ কনক-লঙ্কা রাজা, মজিলা আপনি।
বিরত সতত পাপে দেবকুল; এবে
পাপ-পূর্ণ লঙ্কা-পুরী; প্রলয়ে যেমতি
বসুধা, ডুবিছে লঙ্কা এ কাল-সলিলে।
রাঘবের পদাশ্রয়ে রক্ষার্থে আশ্রয়ী
তেঁই আমি। পর-দোষে কে চাহে মজিতে?"
রুষিলা বাসব-ত্রাস। গম্ভীরে যেমতি
নিশীথে অম্বরে মন্দ্রে জীমূতেন্দ্র কোপি',
কহিলা বীরেন্দ্র বলী,—"ধর্ম্মপথগামী,
হে রাক্ষসরাজানুজ, বিখ্যাত জগতে
তুমি;—কোন্ ধর্ম্ম-মতে, কহ দাসে, শুনি,
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি,—এ সকলে দিলা
জলাঞ্জলি? শাস্ত্রে বলে, গুণবান্ যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন,—তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পরঃ সদা!
এ শিক্ষা, হে রক্ষোবর, কোথায় শিখিলে?
কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোমা। হেন সহবাসে,
হে পিতৃব্য, বর্ব্বরতা কেন না শিখিবে?—
গতি যা'র নীচ-সহ, নীচ সে দুর্ম্মতি।"

বঙ্গভূমির প্রতি

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

রেখো মা দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে.
সাধিতে মনের সাধ,
ঘটে যদি পরমাদ,—
মধুহীন ক'রো না গো তব মনঃ-কোকনদে।
প্রবাসে দৈবের বশে
জীবতারা যদি খসে
এ দেহ-আকাশ হ'তে, নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হবে,—
অমর কে কোথা কবে ?
চিরস্থির কবে নীর, হায়রে, জীবন-নদে ?
কিন্তু যদি রাখ মনে,
নাহি, মা, ডরি শমনে,—
মক্ষিকাও গলে না গো, পড়িলে অমৃত-হ্রদে !
সেই ধন্য নরকুলে,
লোকে যা'রে নাহি ভুলে
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্ব্বজন
কিন্তু কোন্ গুণ আছে,
যাচিব যে তব কাছে,
হেন অমরতা আমি, কহ গো শ্যামা জন্মদে !

তবে যদি দয়া কর,
ভুল দোষ, গুণ ধর,
অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে!
ফুটি যেন স্মৃতিজলে,
মানসে, মা, যথা ফলে
মধুময় তামরস—কি বসন্ত, কি শরদে।

দেশপ্রেম

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

[রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার বাকুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে 'পদ্মিনী-উপাখ্যান,' ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে 'কর্ম্মদেবী' এবং ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে 'শূরসুন্দরী' নামে তিনখানি কাব্য প্রকাশ করেন। ইনি 'কুমারসম্ভব' কাব্যের বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন। ইঁহার স্বদেশপ্রীতি ও বীরত্বের প্রশংসা-মূলক রচনানিচয় একসময়ে বাঙ্গালার ঘরে ঘরে আদৃত হইত।]

স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়?—
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল, কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায়?
কোটিকল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,
নরকের প্রায়;
দিনেকের স্বাধীনতা, স্বর্গ-সুখ তায় হে,
স্বর্গ-সুখ তায়।
এ কথা যখন হয় মানসে উদয় হে,
মানসে উদয়,
নিবাইতে সে অনল বিলম্ব কি সয় হে,
বিলম্ব কি সয়?

অই শুন, অই শুন, ভেরীর আওয়াজ হে,
ভেরীর আওয়াজ,—
সাজ সাজ সাজ বলে, সাজ সাজ সাজ হে,
সাজ সাজ সাজ।
আমাদের মাতৃভূমি রাজপুতানার হে,
রাজপুতানার
সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া ঝরে রুধিরের ধার হে,
রুধিরের ধার।
সার্থক জীবন আর বাহুবল তার হে,
বাহুবল তার,
আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে,
দেশের উদ্ধার।

বাল্মীকির কবিত্বলাভ

বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী

[বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার নিমতলা পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল' কাব্য অপূর্ব্ব সুন্দর সুমিষ্ট গীতি-কবিতা। ইহা বাঙ্গালা ১২৮১ সালে 'আর্য্যদর্শন' পত্রে প্রকাশিত হয়; ইহাই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা। ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় এই শ্রেণীর কাব্য আর প্রণীত হয় নাই। পরে 'বঙ্গসুন্দরী,' 'সাধের আসন,' বন্ধুবিয়োগ,' 'প্রেমপ্রবাহিণী,' 'নিসর্গসুন্দরী,' 'মায়াদেবী' ও বহু সঙ্গীত রচনা করিয়া, ইনি যশ অর্জ্জন ক'রিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালা ১৩০১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে কবিবর বিহারীলাল দেহত্যাগ করেন। রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনায় ইঁহার প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়।]

অম্বরে অরুণোদয়, তলে দুলে দুলে যায়
তমসা তটিনী-রাণী কুলকুল-স্বনে;
নিরখি' লোচন-লোভা পুলিন-বিপিন-শোভা,
ভ্রমেন বাল্মীকি মুনি ভাবভোলা মনে।

শাখি-শাখে মন-সুখে ক্রৌঞ্চ-ক্রৌঞ্চী মুখে মুখে
কতই আদর করে বসি' দু'জনায়;
হানিল শবরে বাণ, নাশিল ক্রৌঞ্চের প্রাণ,
রুধিরে আপ্লুত পাখা ধরণী লুটায়।

ক্রৌঞ্চী, প্রিয় সহচরে ঘেরে' ঘেরে' শোক করে,
অরণ্যপূরিল তার কাতর ক্রন্দনে—

চক্ষে করি' দরশন, জড়িম-জড়িত-মন
করুণ-হৃদয় মুনি বিহ্বলের প্রায়;
সহসা ললাট-ভাগে, জ্যোতির্ম্ময়ী কন্যা জাগে,
জাগিল বিজলী যেন নীল নবঘনে।

কিরণ-মণ্ডলে বসি' জ্যোতির্ম্ময়ী স্বরূপসী,
যোগীর ধ্যানের ধন ললাটিকা মেয়ে
নামিলেন ধীর ধীর, দাঁড়ালেন হ'য়ে স্থির,
মুগ্ধনেত্রে বাল্মীকির মুখপানে চেয়ে।

করুণ ক্রন্দন-রোল, উত উত উতরোল,
চমকি' বিহ্বলা বালা চাহিলেন ফিরে;
হেরিলেন রক্তমাখা মৃত ক্রৌঞ্চ ভগ্ন-পাখা,
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে ক্রৌঞ্চী উড়ে ঘিরে' ঘিরে'।

একবার সে ক্রৌঞ্চীরে আরবার বাল্মীকিরে,
নেহারেন ফিরে' ফিরে' যেন উন্মাদিনী;
কাতরা করুণাভরে, গা'ন সকরুণ স্বরে,
ধীরে ধীরে বাজে করে বীণা বিষাদিনী।

সে শোক-সঙ্গীত-কথা শুনে কাঁদে তরু-লতা,
তমসা আকুল হ'য়ে কাঁদে উভরায়;
নিরখি' নন্দিনীচ্ছবি গদ্গদ আদি কবি,
অন্তরে করুণা-সিন্ধু উথলিয়া ধায়।

পরশমণি

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

[হুগলী জেলার গুলিটা গ্রামে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। ছাত্রাবস্থায় বহু কষ্ট করিয়া ইঁহাকে লেখাপড়া শিখিতে হইয়াছিল। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি 'কলিকাতা ট্রেনিং' স্কুলে মাসিক ৫০৲ টাকা বেতনে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন; ইহার পরে বি.এল্. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি এক বৎসর মুন্সেফের কার্য্য করেন। তৎপরে হাইকোর্টের উকীল হইয়া ইনি দীর্ঘকাল সরকারী উকীলের কার্য্য করেন। হেমচন্দ্রের প্রভূত অর্থাগম হইত, কিন্তু ইনি সঞ্চয়ী লোক ছিলেন না; এ জন্য, বার্দ্ধক্যে হঠাৎ অন্ধ হইয়া পড়াতে, ইনি দুর্দ্দশার চরম-সীমায় উপনীত হন। তখন ইঁহাকে গভর্নমেন্টের সামান্য বৃত্তি ও সাধারণের দয়ার উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল। পঠদ্দশাতেই ইনি কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন; ঐ সময়ে ইঁহার 'চিন্তা-তরঙ্গিণী' লিখিত হয়। তৎপরে 'ভারত-সঙ্গীত' প্রভৃতি কবিতা প্রকাশের পর ইঁহার যশ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। এই সময়ে ইঁহার "কবিতাবলী,' 'ছায়াময়ী,' 'আশাকানন,' 'দশমহাবিদ্যা' প্রভৃতি কাব্য প্রকাশিত হয়। 'বৃত্রসংহার' কাব্য ইঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।]

(১)

কে বলে পরশমণি অলীক স্বপন ?
অই যে অবনীতলে, পরশ-মাণিক জ্বলে
বিধাতা-নির্ম্মিত চারু মানব-নয়ন !

পরশমণির সনে, লৌহ অঙ্গ-পরশনে
সে লৌহ কাঞ্চন হয় প্রবাদ বচন,—
এ মণি পরশে যায় মাণিক ঝলসে তায়
বরিষে কিরণ-ধারা নিখিল ভুবন।

কবির কল্পিত নিধি, মানবে দিয়াছে বিধি ;
ইহারি পরশ-গুণে মানব-বদন
দেবতুল্য রূপ ধরি' আছে ধরা আলো করি',—
মাটীর অঙ্গেতে মাখা সোনার কিরণ।

(২)

পরশ-মাণিক যদি অলীক হইত,
কোথা বা এ শশধর, কোথা বা ভানুর কর,
কোথা বা নক্ষত্র-শোভা গগনে ফুটিত ?

কে রাখিত চিত্র ক'রে চাঁদের জ্যোৎস্না ধ'রে
তরঙ্গে মেঘের অঙ্গে সুখেতে মাখায়ে ?
কেবা এই সুশীতল বিমল গঙ্গার জল
ভারত-ভূষণ করি রাখিত ছড়ায়ে ?

কে দেখাত তরুকুল, নানা রঙ্গে নানা ফুল,
মরাল হরিণ মৃগে পৃথিবী শোভিয়া ?
ইন্দ্রধনু-আলো তুলে', সাজায়ে বিহঙ্গ-কুলে
কে রাখিত শিখিপুচ্ছে শশাঙ্ক আঁকিয়া ?

(৩)

দিয়াছে বিধাতা যাই এ পরশমণি,
স্বর্গের উপমা-স্থল হয়েছে এ মহীতল
সুখের আকর তাই হয়েছে ধরণী !

কি আছে ধরণী-অঙ্গে, নয়ন-মণির সঙ্গে
না হয় মানব-চিত্তে আনন্দদায়িনী ?
নদী-জলে মীন খেলে, বিটপীতে পাতা হেলে,
চরেতে বালুকা ফুটে, তৃণেতে হিমানী।

পক্ষি-পাখা উড়ে যায়, পিপীলি শ্রেণীতে ধায়,
কঙ্করে তুষার পড়ে, ঝিনুকে চিক্কণী !
তাতেও আনন্দ হয়— অরণ্য কুঁঝাটিময়,
জলন্ত বিদ্যুৎলতা, তমিস্রা রজনী।

(৪)

ইহাই পরশমণি পৃথিবী-ভিতরে ;
ইহারি পরশ বলে সখায় সখার গলে
পরায় প্রেমের হার প্রফুল্ল অন্তরে,

শিখায়ে প্রেমের বেদ ঘুচায় মনের ভেদ,
প্রণয় আহ্নিক করে সুখের সাগরে।
ধন্য এই ধরাতল ! প্রেম-ভোগবতী-জল
পবিত্র করেছে যারে খুলিয়া নিঝরে,

যুগল নক্ষত্র দুটি যে স্থানে বেড়ায় ছুটি',
সখারূপে মনসুখে পৃথিবী উপরে।
কোন্ পুণ্যে হেন নিধি মানবে পায় রে বিধি!—
গেল চ'লে চিরদিন অই আশা ধ'রে।

(৫)

অপূর্ব্ব মাণিক এই পরশ-কাঞ্চন।
স্নেহ-রূপ কত ফুল ফুটায় মণি অতুল,
ইহার পরশে ধরা আনন্দ-কানন—
জননী বদন-ইন্দু, মরি, কি করুণা-সিন্ধু!
দয়াল পিতার মুখ, জায়ার বদন,
শত শশি-রশ্মি মাখা, চারু ইন্দীবর আঁকা
পুত্রের অধর-ওষ্ঠ নলিন-আনন;

সোদরের সুকোমল স্বসা-মুখ নিরমল
পবিত্র প্রণয়পাত্র হীরক কাঞ্চন—
এই মণি পরশনে, হয় সুখ দরশনে,
মানব-জনম সার, সফল জীবন!—
কে বলে পরশমণি অলীক স্বপন?

যক্ষের আলয়

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

[মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সাহিত্য, দর্শন ও অঙ্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। ইনি 'স্বপ্নপ্রয়াণ' নামক রূপক-কাব্য লিখিয়া বিখ্যাত হন। ইনি বহু রঙ্গ-কবিতাও রচনা করিয়াছিলেন। 'কাব্যমালা,' 'রেখাক্ষর-বর্ণমালা,' 'প্রবন্ধমালা' প্রভৃতি ইঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ। ইনি সাহিত্যে হাস্য-রসের সহিত গম্ভীর-রসের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ করিয়া গিয়াছেন। 'সার-সত্যের আলোচনা' ইঁহার অপূর্ব্ব প্রবন্ধ। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে ৮৭ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইনি অতি সাত্ত্বিক-প্রকৃতি, সদানন্দ, জ্ঞানতপস্বী ছিলেন। ইঁহার বিশ্বমৈত্রী ও স্বদেশপ্রেম প্রবল ছিল।]

কুবের-আলয় ছাড়ি' উত্তরে আমার বাড়ী,
গিয়া তুমি দেখিবে তথায়,
সম্মুখে বাহির-দ্বার, শোভা কেবা দেখে কার,
ইন্দ্র-ধনু যেন শোভা পায়!

পার্শ্বে এক সরোবরে, জল থই-থই করে,
শোভে তাহে নলিনীর হাট;
উহার একটি ধারে, অপরূপ দেখিবারে,
রমণীয় মণিময় ঘাট।

সরসীর স্বচ্ছ জলে, ইতস্ততঃ দলে দলে,
ভ্রমে হংস-হংসী অবিশ্রামে।
যাইতে মানস-সরে, কারো না মানস সরে—
আছে তারা এমনি আরামে।

উঁচা ভূমি একধারে, গিরিসম দেখিবারে,
নীলকান্তি শিখরে বিরাজে ;
সুবর্ণ-কদলী যত, চারি ধারে শোভে কত,—
মেঘে যেন সৌদামিনী সাজে।

মাধবী-মণ্ডপ 'পরে কুরুবক শোভা করে,
ফুল-গন্ধে ছোটে অলিকুল ;
লতায় পাতায় ঘেরা, আছয়ে সবার সেরা,
দুটি গাছ অশোক-বকুল।

তাদের মাঝেতে আর, ময়ূরের বসিবার,
সোনার একটি আছে দাঁড়—
শিখী যথা কেকাভাষী সন্ধ্যাকালে বসে আসি'
আনন্দেতে উঁচা করি ঘাড়।

এ সকল নিদর্শনে, চিনিবে মুহূর্ত্তক্ষণে,
দেখে' মাত্র মোর বাড়ী-পানে ;
এবে উহা শূন্য-প্রায়, কমল না শোভা পায়,
কখনও দিবা-অবসানে।

লক্ষ্মণ-বর্জ্জন

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

[কলিকাতা বাগবাজারে বসুপাড়ায় ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্র ঘোষের জন্ম হয়। গৃহে অধ্যয়ন করিয়া ইনি ইংরেজী সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তরুণ বয়সে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধর্ম্মদাস সুর প্রভৃতি বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া ইনি বাগবাজারে 'সধবার একাদশী' নাটক অভিনয় করেন। ক্রমশঃ রঙ্গমঞ্চে অভিনয়-কৌশলের জন্য ইনি বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন এবং "বঙ্গদেশের গ্যারিক" বলিয়া পরিচিত হন। ইঁহার রচিত প্রায় ৭০ খানি নাটক আছে; তন্মধ্যে 'বিল্বমঙ্গল,' 'প্রফুল্ল,' 'অশোক,' 'বুদ্ধদেব,' 'শঙ্করাচার্য্য,' 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস,' 'পাণ্ডবগৌরব,' 'চৈতন্যলীলা,' 'জনা,' 'দক্ষযজ্ঞ,' 'কালাপাহাড়,' 'বলিদান,' 'শাস্তি কি শান্তি,' 'চণ্ড,' 'পূর্ণচন্দ্র,' 'হারানিধি,' 'বিষাদ,' 'মুকুল-মুঞ্জরা,' 'সিরাজদ্দৌলা,' 'মীরকাসিম,' 'ছত্রপতি শিবাজী,' 'গৃহলক্ষ্মী' 'ম্যাকবেথ,' প্রভৃতি নাটকে ইনি ইঁহার প্রতিভার বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন এবং তাহার ফলে ইনি বঙ্গদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন; নাট্যজগতে ইঁহার প্রতিভা ও প্রভাব চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।]

রামচন্দ্র। ধরি' দেহ দুখ-সুখ সহিষ্ণু সকলি।
মেদ-অস্থি-নির্ম্মিত এ কলেবর,
রোগ-শোকাগার অন্য দেহ সম,
মর্ম্মে বাজে মম ব্যথা,
কিন্তু প্রেমে জয় রিপু মম;—
তাপপূর্ণ দেহ সুধাগার প্রেমে।

শিখিলাম প্রেম-খেলা,
প্রেমাকর জনক-জননী-কোলে ;
বিতরিনু কণা মাত্র তা'র অনুজে আমার,
পাইলাম প্রাণের লক্ষ্মণ ভাই—
উৎসব-সঙ্কট-সাথী।
হে সুধীর,
সেই প্রেমে তুমিও কিনিবে,
অনুজ লক্ষ্মণ তব।
বিলাইনু সে প্রেম সবারে,—
গুরুজনে, ব্রাহ্মণ-চরণে,
মিনতি শিখিনু ;
পরদুঃখে শিখিলাম দুখ,
তেঁই নহিনু বিমুখ তপোবনে,
গর্জ্জিল বিমানে যবে তাড়কা ভীষণা।
বুঝিলাম প্রেমের প্রভাব,—
সে প্রেম-প্রভাবে, ধরিনু হৃদয়ে,
প্রেমময়ী জনকনন্দিনী,
বিজন-সঙ্গিনী মম।
প্রেমে পিতৃসত্য হেতু গমন গহনে,—
হারাইনু জানকীরে,
রে নিন্দুক, তবু না নিন্দিনু বিধি।
সহেছ কি কভু,
রাজ্য ত্যজি' সীতাহারা শোক ?
প্রেমের সন্ন্যাসী, প্রেমে কপিসেনা সাথী,

প্রেমে শিলা ভাসে জলে, ম'লে প্রাণ মেলে,
প্রেমে দশানন-জয়ী খ্যাতি,
প্রেমের শাসনে রামরাজ্য অযোধ্যায়,
প্রেম-হেতু সীতা ত্যজি—
লঙ্ঘি' অলঙ্ঘ্য সাগর,
দুষ্কর সমর করিলাম যা'র লাগি'।
রাম-রাজ্য আদর্শ জগতে ত্যাগ-গুণে!
জানকী-বিরহ,—
পাষাণ বিদরে তাপে,—
আছি স্থির প্রেমের আশ্রয়ে।
ভবার্ণবে প্রেম ভেলা,—
পাবে দুঃখ এ শিক্ষা ভুলিলে।
পুনঃ হের সত্য-পূর্ণ ভার,
লক্ষ্মণ-বর্জ্জন যাচে বিধি-দাতা বিধি।

বশিষ্ঠের প্রবেশ)

পুরোহিত, প্রণমি চরণে,
যাচে বিধি লক্ষ্মণ-বর্জ্জন।

বশিষ্ঠ। বৎস! ধ্যানযোগে আছি অবগত।

রাম। কহ হিতবাণী বিধান-সঙ্গত।

বশিষ্ঠ। শিবময় হে সম্পদ্-দাতা,
কোন্ বিধি অগোচর তব?
কিন্তু যদি বাড়া'লে হে মান,
যথাজ্ঞান নিবেদি চরণে,—
সত্যের সম্মান রাখ লক্ষ্মণ-বর্জ্জনে!

রাম। হায় মুনিবর!
বিলাস-বঞ্চিত বাস গহন মাঝারে,
তপে শীর্ণ কলেবর তব,
কেমনে হে বুঝাব তোমায়
গৃহীর অন্তর-ব্যথা!
জান না লক্ষ্মণে তুমি,
তেঁই এ নিষ্ঠুর বাণী
কহ মোরে, মুনিবর।
কিশোরে অনুজ মম বাল্য-ক্রীড়া ত্যজি'
নির্ভয়ে চলিল সাথে
তাড়কা-তাড়িত বনে
ভ্রূভঙ্গে হেরিনু,
অটল-প্রতিজ্ঞা বীর-বালক শরীরে,—
না ছাড়িবে পাশ মম রাক্ষসী-সমরে।
গর্জ্জিলা তাড়কা সিংহনাদে,—
স্থাবর জঙ্গম কাঁপে;—
বুঝি আমি প্রাণের লক্ষ্মণ হেতু!
প্রলয়-ঝলকে উঠিল গর্জ্জিয়া বাণ,
পড়িল রাক্ষসী, সুমেরুশিখর যেন,
টলিল ভুবন ভারে,—
অটল প্রাণের ভাই পাশে!
রাজ্য-হারা, চলিলাম বনবাসে,
সত্যাশ্রয়,—শূন্যময় ধরা
পাছে ছায়া-সম ভাই মম!

জননী কাঁদিছে—না চায় ফিরিয়া ভাই,
না সম্ভাষে ক্রন্দমানা প্রেয়সীরে,
মম মুখ চায়, আঁখি ভেসে যায়,—
ভয় পাছে নাহি করি সাথী !
ধনুধারী প্রহরী আমার,
অনাহারে অনিদ্রায় বঞ্চিল বিপিনে,
চতুর্দ্দশ বিজন বৎসর !
কভু না সুধিনু আমি,
খাইল কি না খাইল ভাই ;
তবু শক্তিশেল পাতি' নিল বুকে !
জাগি মহীতলে মহীরাজ-ঘরে,
পাশে শুয়ে ভাই মম !—
পাশে ছত্র করে অযোধ্যার সিংহাসনে
জানকী-বর্জ্জনে লক্ষ্মণ সারথি রথে !
আহা শক্তিধর ! লইল কলঙ্ক মাথা পাতি'
ভ্রাতৃপ্রেমে গুণধাম
কোথা পাব এ দোসর, কোথা ভাসাইব
কেমনে বাঁধিব প্রাণ ?—
ন্যায়বান্ কে ক'বে আমারে,
কে আর হইবে জ্যেষ্ঠ-অনুগামী ভবে ?

বশিষ্ঠ। তব ন্যায়-স্রোত বহে অন্তরে অন্তরে,
যেবা তব চরণ সেবিবে,
তোমারে বুঝিবে,
কি ভার তাহার, প্রভু,

সত্য-হেতু ত্যজিতে তোমায় ?
ত্রেতাযুগে সত্য লোপ একপদ,
তবু সত্যাশ্রয়ী মানব সম্পদ্
দেখা'বে বর্জ্জন-গুণে ;
এ সম্পদে চাহ চির-অনুগত জনে
বঞ্চিতে হে দয়াময় ?
একি ন্যায় তব ন্যায়বান্ ?
গৌরব বাড়াতে গতি যা'র তব পদে,
হে বিপুল-গৌরব !
বিপুল গৌরব দান হে অনুজে তব !

রাম। শূল—শূল—শূল, হে শঙ্কর !—
পিনাক ভুবন-ক্ষয় !
কোদণ্ডে না হবে, কোদণ্ড নারিবে
বিঁধিতে কঠিন প্রাণ ।—
কহ, নর, নহি ন্যায়বান্ ?—
বিন্ধি প্রাণ তোর তরে।
রে লক্ষ্মণ ! এ দেহে না পাব তোরে আর !

বীরের শোক

নবীনচন্দ্র সেন

[চট্টগ্রামের নওয়াপাড়া গ্রামে ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে কবিবর নবীনচন্দ্র সেন জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বি.এ. পাশ করিয়া ইনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হন। 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্য লিখিয়া ইনি তদানীন্তন কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া গণ্য হন। ইঁহার রচনা সরল, অনাড়ম্বর ও কবিত্বময়। 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্য ব্যতীত ইনি 'অবকাশ-রঞ্জিনী,' 'রঙ্গমতী,' 'কুরুক্ষেত্র,' 'রৈবতক,' 'প্রভাস,' 'অমিতাভ,' 'অমৃতাভ,' 'খৃষ্ট,' 'ভানুমতী,' 'আমার জীবন' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ২৩এ জানুয়ারী ইঁহার মৃত্যু হয়।]

উত্তীর্ণ সমর-ক্ষেত্র। নক্ষত্রের বেগে
চলিতে লাগিল রথ। দেখিলা অদূরে
দুই জনে নিরানন্দ পাণ্ডব-শিবির
আভাহীন, শোভাহীন, বিজয়া-প্রদোষে
যেন শূন্য পূজাগৃহ নিরানন্দময়।
আকুল হৃদয়ে পার্থ কহিলা,—"কেশব!
বাজে না মঙ্গলতূরী, দুন্দুভি, পটহ;
নীরব মুরজ বীণা। নাশি' সংশপ্তকে
আসিতেছি,—কই, নাহি গায় বন্দিগণ
অগ্রসরি' স্তুতিপূর্ণ মঙ্গল-সঙ্গীত!
পুরনারীগণ নাহি গবাক্ষ-দুয়ারে
দাঁড়াইয়া শিবিরের দেয় হুলুধ্বনি,

করে পুষ্প বরিষণ! কই, পুত্রগণ
কই, অভিমন্যু কই আসে না ছুটিয়া,
প্রীতি-পূর্ণ মুখে করি' প্রীতি-সম্ভাষণ!
নারায়ণ!"—অর্জ্জুনের ভিজিল নয়ন,—
"পাণ্ডব-শিবির দেখ শূন্য নিরজন!"

চক্রব্যূহ মহাক্ষেত্র দেখিলা বিস্ময়ে
শোভিছে অদূরে মহাদুর্গের মতন,
শবের প্রাচীরে উচ্চ। জন-স্রোত বেগে
ছুটিয়াছে এক স্রোতে সেই দুর্গ-পানে;—
ছুটিল বিদ্যুৎবেগে রথ সেই দিকে।
কহিলা কেশব,—"পার্থ! চক্রব্যূহ করি'
আজি যুঝিলেন দ্রোণ, সেই চক্রব্যূহ
হইয়াছে শব-ব্যূহ দেখ কি ভীষণ!
স্তরে স্তরে পড়ি শব—অশ্ব, গজ, নর—
রথের উপরে রথ, শব তদুপর,
দুর্ভেদ্য প্রাচীর-মত শোভিছে কেমন!
কোন্ বীরমণি আজি জগত-বিস্ময়
এ অক্ষয় কীর্ত্তিমালা পরিল গলায়!
দেখিয়াছি বহু যুদ্ধ, করিয়াছি রণ
আজীবন, এ বীরত্ব দেখিনি কখন।"—
আর চলিল না রথ; পড়িলা ভূতলে
লম্ফ দিয়া দুই জন; করিয়া লঙ্ঘন
ঊর্দ্ধশ্বাসে সে প্রাচীর, ছুটিলা সত্রাসে,—
হাহারবে সৈন্যগণ উঠিল কাঁদিয়া।

দেখিলেন কুরুক্ষেত্র শোকের সাগর।
শব-চক্র মহাবেলা; প্রশস্ত প্রাঙ্গণ
ব্যাপিয়া পাণ্ডব-সৈন্য, উর্ম্মির মতন
উদ্বেলিত মহাশোকে, কাঁদে অধোমুখে,—
গুণহীন ধনু, পৃষ্ঠে শরহীন তূণ।
রথি-মহারথিগণ বসিয়া ভূতলে
কাঁদিতেছে অধোমুখে, যেন আভাহীন
সিক্ত রত্নরাজি পড়ি' রত্নাকর-তলে।
বাণ-বিদ্ধ-মীন-মত পাণ্ডব সকল
করিতেছে গড়াগড়ি পড়িয়া ভূতলে।
মূর্চ্ছিত বিরাটপতি—স্তম্ভিত প্রাঙ্গণ—
কেন্দ্র-স্থলে অভিমন্যু শরের শয্যায়,—
সিদ্ধকাম মহাশিশু ক্ষত-কলেবর
রক্তজবা-সমাবৃত, সস্মিত বদন
মায়ের পবিত্র অঙ্কে করিয়া স্থাপিত,
—সন্ধ্যাকাশে যেন স্থির নক্ষত্র উজ্জ্বল—
নিদ্রা যাইতেছে সুখে।। বক্ষে সুলোচনা
মূর্চ্ছিতা; মূর্চ্ছিতা পদে পড়িয়া উত্তরা,
সহকার-সহ ছিন্ন ব্রততীর মত!
কেবল দুইটি নেত্র শুষ্ক, বিস্ফারিত,
এই মহা শোকক্ষেত্রে; কেবল অচল
এই মহা শোকক্ষেত্রে একটি হৃদয়;—
সেই নেত্র, সেই বুক, মাতা সুভদ্রার!
চাপি' মৃত-পুত্র-মুখ মায়ের হৃদয়ে

দুই করে, বিস্ফারিত নেত্রে প্রীতিময়,
যোগস্থা জননী চাহি' আকাশের পানে,—
আদর্শ বীরত্ব বক্ষে, প্রীতির প্রতিমা !—
নীরব বিস্তৃত ক্ষেত্র। থাকিয়া থাকিয়া
কেবল কাঁপিয়া ধীরে মায়ের অধর
গাইতেছে কৃষ্ণ-নাম। মূর্চ্ছিত অর্জ্জুন
পড়িতে, ধরিলা কৃষ্ণ বাহু প্রসারিয়া।
উচ্ছ্বাসে কহিলা কৃষ্ণ,—"অর্জ্জুন ! অর্জ্জুন !
আমরা বীরের জাতি, বীর-ধর্ম্ম রণ !
অযোগ্য এ শোক তব। এই বীরক্ষেত্র
করিও না কলঙ্কিত করিয়া বর্ষণ
এক বিন্দু শোক-অশ্রু। বীরর্ষভ তুমি,
বীর-শোক অশ্রু নহে, অসির ঝঙ্কার।"

বর্ষা

রাজকৃষ্ণ রায়

[১২৫৬ সালে (১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে) রাজকৃষ্ণ রায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি শতাধিক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। ইঁহার কৃত সংস্কৃত রামায়ণ ও মহাভারতের সুললিত পদ্যানুবাদ এবং 'ভারতকোষ' নামে পৌরাণিক অভিধান ইঁহার অসামান্য কৃতিত্বের পরিচায়ক। শুধু 'অবসর-সরোজিনী' প্রভৃতি কবিতা-গ্রন্থ নহে, নাট্য-গ্রন্থও ইঁহার অনেক আছে। 'বামন-ভিক্ষা,' 'প্রহ্লাদ-চরিত্র,' 'নরমেধ-যজ্ঞ,' 'লৌহ-কারাগার,' 'বনবীর,' 'অনলে বিজলী,' 'লয়লা-মজনু,' 'বেনজীর্ বদরেমুনীর্,' 'চতুরালী,' প্রভৃতি নাট্যগ্রন্থ এবং 'হিরণ্ময়ী,' 'কিরণ্ময়ী,' 'অদ্ভুত ডাকাত' প্রভৃতি উপন্যাস লিখিয়া ইনি যশস্বী হইয়াছিলেন। হাস্য-রসাত্মক রচনায়ও ইনি সুনিপুণ ছিলেন। পারস্য-ভাষার সহিত ইঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল। ১৩০০ সালে (১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে) ইঁহার মৃত্যু হয়।]

অনন্তর রামচন্দ্র করি' সম্বোধন
কহিলেন লক্ষ্মণেরে,—"অনুজ লক্ষ্মণ!
বর্ষাকাল উপস্থিত এই ত এক্ষণে;
বসুধা নূতন হৈল বর্ষা-পরশনে।

"পর্ব্বত প্রমাণ মেঘে আচ্ছন্ন আকাশ;
শীতল হ'য়েছে জলে গ্রীষ্মের বাতাস।
মৃদুমন্দ হইয়াছে বায়ু অতিশয়,
কর্পূর-জলের মত শীতলতাময়

"অর্জ্জুন কেতকী ফুল ফুটেছে ভূধরে।
অভিষিক্ত হইতেছে বৃষ্টিবারিধারে।
পর্ব্বতের মেঘরূপ অসিত অজিন,
ধারারূপ যজ্ঞসূত্র অতি সমীচীন:

"গুহারূপ মুখখান হ'তেছে ধ্বনিত,
পাঠশীল বিপ্র-সম হয় অনুমিত।
বিদ্যুত-কনক-কশা প্রহারে গগন
অশ্ব-সম মেঘরবে করি'ছে গর্জ্জন।

"ওই দেখ, কুটজ-কুসুম গিরিচূড়ে
বিকসিত হ'য়ে আছে, পরিমল উড়ে।
পৃথিবীর উষ্মায় আবৃত যেন হ'য়ে,
কুটজ-কুসুম তুষ্ট বর্ষা পরশিয়ে।

"কোথাও নাহিক ধূলি; সমীর শীতল;
গ্রীষ্মের উত্তাপ-দোষ নহেক প্রবল।
সমর-যাত্রায় ক্ষান্ত এবে রাজগণ;
প্রবাসীরা নিজ দেশে করি'ছে গমন।

"এক্ষণে মানস-সরোবর-বাস-তরে
চক্রবাক চলিয়াছে প্রিয়া সঙ্গে ক'রে।
এক্ষণে কর্দ্দমে পূর্ণ হইয়াছে পথ,
এই সে কারণে নাহি চলে যান-রথ।

"যে সকল নদীতে অন্যান্য ঋতু ভোগ কালে নৌচালনোপযোগী জল থাকে না, এক্ষণে বর্ষার অনুগ্রহে তৎসমুদয়ে যথেষ্ট জল; সুতরাং প্রবাসিগণের স্বদেশে যাইবার বিশেষ সুবিধা ঘটে।"—রাজকৃষ্ণ রায়ের টিপ্পনী।

"কোথাও আকাশ বেশ, কোথা মেঘাবৃত,
শৈল-বদ্ধ সিন্ধু-সম হয় অনুমিত।
গিরি-নদী খরবেগ এবে অতিশয়,
প্রবাহে ভাসি'ছে সর্জ্জ কদম্ব নিচয়।

"ধাতুযোগে রক্তবর্ণ হইয়াছে জল,
কেকারব করিতেছে ময়ূর সকল।
ভৃঙ্গ-সম জম্বুফল ওই রসান্বিত,
বায়ুবেগে আম্র ভূমে হ'তেছে পতিত।

"বিদ্যুৎ-স্বরূপ ধ্বজা, বকশ্রেণী-হার,
ধরি' শোভে মেঘ ওই গিরিশৃঙ্গাকার।
রণস্থির-করি-সম গরজে গভীর,
ঝর ঝর করি' তাহে ঝরিতেছে নীর।

"ময়ূরীর সনে সুখে নাচি'ছে ময়ূর;
চাতক চাতকী সনে ডাকি'ছে মধুর।
জলভারে পূর্ণ হ'য়ে জলধরগণ
গিরির অত্যুচ্চ চূড়ে ঠেকি' ঘন ঘন
চলিয়া যেতেছে করি' গভীর গর্জ্জন।

"বক-শ্রেণী ঘন-মেঘে আসক্তি-আবেশে
সানন্দে উড্ডীন হ'য়ে বিশাল আকাশে,
পবন-চালিত পদ্মমালার মতন
শোভা পাইতেছে কিবা, দেখ, রে লক্ষ্মণ।"

আকাশ হইতে সমুদ্র-দর্শন

নবীনচন্দ্র দাস

[নবীনচন্দ্র দাস, কবিগুণাকর, এম্ এ., বি.এল্., চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি 'রঘুবংশ,' 'কুমারসম্ভব,' 'কিরাতার্জ্জুনীয়' প্রভৃতি সংস্কৃত কাব্য বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ করেন; ইঁহার অনুবাদে মূলের প্রকৃত মর্ম্ম ও শব্দসম্পদ্ সুন্দররূপে রক্ষিত হইয়াছে।]

পুষ্পরথে বিষ্ণুরূপী রাম রঘুবর
উঠিলা আকাশপথে মনোরথ-গতি;
অধোদেশে নিরখিয়া অতল সাগর
কহিলা বিরলে প্রভু জানকীর প্রতি,—

"হের, প্রিয়ে, সেতু মম মলয়-শিখরী
স্পর্শি' দূরে বিভাগিল ফেনিল সাগর;
শোভে যথা ছায়াপথ দ্বিখণ্ডিত করি'
তারকামণ্ডিত চারু শারদ অম্বর!

"কপিল যজ্ঞের অশ্ব লইল পাতালে—
এ ভাবিয়া সগরের অসংখ্য কুমার
অশ্ব-অন্বেষণে ধরা খনে পুরাকালে,
হ'ল তাহে সাগরের অসীম বিস্তার।

"শান্ত ক্ষুব্ধ তরঙ্গিত অসীম সাগর
বিরাজিছে মহিমায় ব্যাপি' দিগন্তর,
সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ-গুণে কেশব যেমতি,—
নিরূপে স্বরূপ তাঁর কাহার শকতি ?

"নাশি' বিশ্ব যোগ-নিদ্রাবশে হৃষীকেশ
যুগান্তে এ সিন্ধুজলে করেন শয়ন,
নাভিপদ্মে পদ্মযোনি করি' উপবেশ
করেন তাঁহার স্তুতি সৃষ্টির কারণ।

"গিরিকুল-পক্ষ ইন্দ্র কাটিলা যখন
কত গিরি এ সাগরে লইল আশ্রয়,
যথা শত্রু-উপদ্রুত নৃপতি-নিচয়
রাজচক্রবর্ত্তি-পদে লভে হে শরণ।

"রসাতল হ'তে বিষ্ণু সৃজন-প্রয়াসে
উদ্বহিলা নববধূ ধরারে যখন,
এ স্বচ্ছ সাগর-জল প্রলয়-উচ্ছ্বাসে
হ'য়েছিল ক্ষণ তাঁর মুখাবগুণ্ঠন।

"ভীমকায় তিমি-মৎস্য জলযন্ত্রাকারে
নদীমুখে মেলি' মুখ করিছে গ্রহণ
মৎস্য সহ জলরাশি, মুদিয়া বদন
শির-রন্ধ্রে উর্দ্ধে জল ফেলিছে ফুৎকারে !

"উঠিছে কুম্ভীরকুল যেন মত্ত-করী
দ্বিভাগিয়া ফেনরাশি, সলিল উপরি;
ক্ষণতরে শ্বেত ফেনা লাগিয়া কপোলে
ধবল চামর-প্রায় কর্ণ-মূলে দোলে।

"তরঙ্গের রেখা-প্রায় ভুজঙ্গনিকর
বিচরিছে তীরদেশে বায়ুপান-আশে,
সর্প বলি' চেনা যায় মণির প্রকাশে
ঝলে যবে রবি-কর ফণার উপর।

"তব রক্তাধরনিভ প্রবাল উপরে
পড়িছে তরঙ্গাঘাতে শ্বেত শঙ্খকুল,
প্রবাল-কণ্টক মুখে ফুটিয়া আকুল—
ক্লেশে মুক্ত হ'য়ে শঙ্খ পলাইছে ধীরে।

"নভ হ'তে গিরি সম ওই মেঘবর
লম্বমান সিন্ধু-বক্ষে জলপান তরে,
ঘুরিছে আবর্ত্তবেগে; ধরিয়া মন্দরে
পুন যেন দেবাসুরে মথিছে সাগর!

"শোভিছে লবণসিন্ধু শ্যামকলেবর
লৌহচক্র প্রায়, দেখ, ব্যাপি' দিগন্তর;
সুদূর গগনপ্রান্তে সূক্ষ্ম নীলিমায়
শোভে তীর-বনরাজি পরিধির প্রায়

শেষ

নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

[১২৬৬ সালে (১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে) নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। শিশু-পাঠ্য সাহিত্য রচনায় ইনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। ইঁহার 'শিশু-রঞ্জন রামায়ণ,' 'ছবির ছড়া,' 'ছেলে-খেলা,' 'রং চং' প্রভৃতি পুস্তকগুলি এই কথার প্রমাণ। বঙ্কিমচন্দ্র ইঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন; তাঁহার 'প্রচার' পত্রে নবকৃষ্ণের রচনা নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইত। ১৩৪৬ সালে ইঁহার মৃত্যু হয়।]

গোকুলে মধু ফুরায়ে গেল, আঁধার আজি কুঞ্জবন,
(আর) গাহে না পাখী, ফুটে না কলি, নাহিক অলি-গুঞ্জরণ।
দুলাতে মৃদু লতিকা বনে, খেলিতে নব-কলিকা সনে,
মধুরতর নাহি সে আর সমীর-ধীর-সঞ্চরণ।

কাননে ঢালি' জোছনারাশি ভাসে না চাঁদ গোকুলে আসি',
নাহি সে হাসি প্রমোদ-রাশি, নাহি সে সুখ-সম্মিলন।
জলদে শশী-মাধুরী ঢাকা, বিষাদ যেন সকলে মাখা,
শ্রীহীন তরু, শ্রীহীন লতা, শ্রীহীন চারু পুষ্পবন।

অমিয় স্বর-লহরে মাখি' স্তব্ধ করি' পশু-পাখী,
মধুরভাষী আর সে বাঁশী গাহে না গীত সম্মোহন।
যমুনা-পানে চাহিলে ফিরে, কপোল ভাসে নয়ন-নীরে,
পরাণে শুধু উছলি' উঠে সুনীল জলে সন্তরণ।

নিবিড় বনে তমাল-ছায়, কোকিল-বধূ গীত না গায়,
সারিকা-শুক বিরস-মুখ বিগত প্রেম-সম্ভাষণ।
অধীর ব্রজ-বালকদল, না খায় ধেনু তৃণ কি জল,
সজল আঁখি উরধ-মুখে করিছে কি যে অন্বেষণ।

প্রেমিক কে সে মধুরভাষী বধিয়ে গেল গোকুলবাসী,
ব্রজে কি আর বাঁশরী তার গা'বে না গীত সঞ্জীবন?
অধীর প্রাণে বিষম ক্লেশ, কেমনে করি এ দুখ শেষ—
বিনে শ্রীহরি কেমনে করি নয়ন-বারি সংবরণ।

ধৈর্য্য ধর

গোবিন্দচন্দ্র দাস

[গোবিন্দচন্দ্র দাস ঢাকা জেলার ভাওয়ালের অন্তর্গত জয়দেবপুর গ্রামে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার জীবন দারুণ দারিদ্র্য, অত্যাচার ও নির্য্যাতন সহ্য করিয়া অতিবাহিত হয়। ইনি অধিক লেখাপড়া শিখিবার সুযোগ পান নাই। ইনি অত্যন্ত স্বদেশ-প্রেমিক ছিলেন। ইঁহার রচনার মধ্যে একটি নির্ভীক আত্মপ্রকাশ ছিল—ইনি যাহা ভাবিতেন, তাহা লিখিতে দ্বিধা-বোধ করিতেন না। 'প্রেম ও ফুল,' 'কুঙ্কুম,' 'অগুরু,' 'কস্তুরী,' 'চন্দন,' 'ফুলরেণু,' 'বৈজয়ন্তী' প্রভৃতি কবিতাপুস্তক প্রকাশ করিয়া ইনি অশেষ যশ অর্জ্জন করেন।]

ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর, বাঁধ বাঁধ বুক,
শত দিকে শত দুঃখ আসুক—আসুক!
এ সংসার কর্ম্মশালা,
জ্বলন্ত কালান্ত-জ্বালা,
কলঙ্ক দহিতে হবে থাকে যতটুক!
অযুত আঘাতে নিত্য
গড়িতে হইবে চিত্ত,
যুদ্ধ-জয়েচ্ছুক;
দিতে হবে বজ্র-শাণ,
উজ্জ্বল করিতে প্রাণ,
তবে সে উজ্জ্বল হবে মুখ।

ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর, বাঁধ বাঁধ বুক,
অনন্ত বিপদ্ দাও—আসিবে, আসুক!
রুদ্ধ করি ব্যূহ-পথ,
থাক্ শত জয়দ্রথ,
অমরের প্রিয় সে যে সমর-কৌতুক;
সে অনন্ত কুরু-সৈন্য,
ভীরুর দৌর্ব্বল্য-দৈন্য,
ডরে না জম্বুক!
সাগর-তরঙ্গ ঠেলি',
তিমিঙ্গিল করে কেলি,
কূপে কাঁপে কূপের মণ্ডুক!

ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর, বাঁধ বাঁধ বুক,
শিরোপরি শত বজ্র গর্জ্জিবে—গর্জ্জুক!
রহ হিমাদ্রির মত,
হইও না অবনত,
পতঙ্গের পদাঘাতে তৃণ অধোমুখ!
হ'লে হও খণ্ড খণ্ড,
সৃষ্টি করি' লণ্ড ভণ্ড
ব্রহ্মাণ্ড কাঁপুক!
গম্ভীর গৌরব-ভরা,
মহাদণ্ডে ভেঙ্গে পড়া—
কি আনন্দ! কি প্রচণ্ড সুখ!

ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর, বাঁধ বাঁধ বুক,
অনন্ত মরণ যদি আসিবে—আসুক!
স্থাপ' তুমি জয়স্তম্ভ,
কর' আত্ম-অবলম্ব,
দাও অস্থি মেদ মজ্জা, লাগে যতটুক;
শত সূর্য্য করি' গুড়া,
গড়' সে উজ্জ্বল চূড়া—
দেবতা দেখুক!
বাধা-বিঘ্ন ঠেলি' পদে,
সিংহ ফিরে বীরমদে,
আত্মগুপ্ত সভয়ে শম্বুক!

মা ও ছেলে

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

[১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৮ই আগষ্ট ইঁহার জন্ম এবং ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই আগষ্ট ইঁহার মৃত্যু হয়। ইনি কলিকাতা বহুবাজারের সুপ্রসিদ্ধ অক্রূর দত্তের বংশীয় নরেশচন্দ্র দত্তের পত্নী ছিলেন। ইনি বহু কবিতা লিখিয়া বঙ্গসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। ইঁহার 'অশ্রুকণা,' 'ভারত-কুসুম,' 'শিখা,' 'অর্ঘ্য,' 'সিন্ধু-গাথা,' 'আভাষ,' 'সন্ন্যাসিনী,' 'কবিতাহার' প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গালার মহিলা-কবিদিগের মধ্যে ইনি একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন।]

ফুট্‌ফুটে জ্যোছনায় ধব্‌ধবে আঙ্গিনায়
একখানি মাদুর পাতিয়ে,
ছেলেটি শুয়ায়ে কাছে জননী শুইয়া আছে
গৃহকাজে অবসর পেয়ে'।

সাদা সাদা মুখ তুলি' যুঁই-শেযালিকাগুলি
উঠানের চৌদিকে ফুটিয়ে,
প্রাচীরেতে সুশোভিতা রাধিকা ঝুমুকালতা
দুলিতেছে চন্দ্র-করে নেয়ে'।

মৃদু ঝুরু ঝুরু বায় বসন কাঁপায়ে যায়,
ঝরে' পড়ে কামিনীর ফুল;
প্রশান্ত মুখের 'পরে কালো কেশ উড়ে' পড়ে,
আলসেতে আঁখি ঢুলঢুল।

মাতা মৃদু ধীর হাতে আঘাতে শিশুর মাথে,
গায় ঘুমপাড়ানিয়া গান ;
মোহিয়া সুস্বর ভাষে, আকুল কি ফুলবাসে
পিঞ্জরে ধরেছে পাখী তান।

শিয়রেতে জেগে' শশী যেন সে সৌন্দর্য্যরাশি
নেহারিছে মগ্ন হয়ে' ভাবে।
ছেলে ডাকে 'আয় চাঁদ,' মা বলিছে 'আয় চাঁদ,'
কি করিবে চাঁদ মনে ভাবে।

মা নাহি ঘরেতে যা'র, ছেলে কোলে নাই যা'র,
যত কিছু সব তা'র মিছে।
চাঁদে চাঁদে হাসাহাসি, চাঁদে চাঁদে মেশামেশি,
স্বর্গে মর্ত্ত্যে প্রভেদ কি আছে।

পূজারিণী

(অবদানশতক)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নৃপতি বিম্বিসার।
নমিয়া বুদ্ধে মাগিয়া লইয়া
পাদ-নখ-কণা তাঁর,
স্থাপিয়া নিভৃত প্রাসাদ-কাননে,
তাহারি উপরে রচিলা যতনে
অতি অপরূপ শিলাময় স্তূপ—
শিল্পশোভার সার।
সন্ধ্যাবেলায় শুচিবাস পরি'
রাজবধূ রাজবালা
আসিতেন ফুল সাজায়ে ডালায়,
স্তূপ-পদমূলে সোনার থালায়
আপনার হাতে দিতেন জ্বালায়ে
কনক প্রদীপমালা।

অজাতশত্রু রাজা হ'ল যবে,
পিতার আসনে আসি',
পিতার ধর্ম্ম শোণিতের স্রোতে
মুছিয়া ফেলিল রাজপুরী হ'তে
সঁপিল যজ্ঞ-অনল-আলোতে
বৌদ্ধ-শাস্ত্ররাশি।

কহিলা ডাকিয়া অজাতশত্রু
রাজপুরনারী সবে,—
"বেদ ব্রাহ্মণ রাজা ছাড়া আর
কিছু নাই ভবে পূজা করিবার,—
এই ক'টি কথা জেনো মনে সার—
ভুলিলে বিপদ হবে।"

সে দিন শারদ দিবা-অবসান,—
শ্রীমতী নামে সে দাসী
পুণ্য-শীতল সলিলে নাহিয়া,
পুষ্প-প্রদীপ থালায় বাহিয়া,
রাজমহিষীর চরণে চাহিয়া
নীরবে দাঁড়াল আসি'।
শিহরি' সভয়ে মহিষী কহিলা,—
"এ কথা নাহি কি মনে,
অজাতশত্রু করেছে রটনা—
স্তূপে যে করিবে অর্ঘ্যরচনা
শূলের উপরে মরিবে সে জনা
অথবা নির্ব্বাসনে!"৮

সেথা হ'তে ফিরি' গেল চলি' ধীরি
বধূ অমিতার ঘরে।
সমুখে রাখিয়া স্বর্ণ-মুকুর
বাঁধিতেছিল সে দীর্ঘ চিকুর,
আঁকিতেছিল সে যত্নে সিঁদূর
সিঁথির সীমার 'পরে

শ্রীমতীরে হেরি' বাঁকি' গেল রেখা,
　　কাঁপি' গেল তার হাত,—
কহিল,—"অবোধ, কি সাহস-বলে
এনেছিস্ পূজা, এখনি যা চলে',
কে কোথা দেখিবে, ঘটিবে তা হ'লে
　　বিষম বিপৎপাত।"

অস্ত-রবির রশ্মি-আভায়
　　খোলা জানালার ধারে
কুমারী শুক্লা বসি' একাকিনী,
পড়িতে নিরত কাব্য-কাহিনী,
চমকি' উঠিল শুনি' কিঙ্কিণী,
　　চাহিয়া দেখিল দ্বারে।

শ্রীমতীরে হেরি' পুঁথি রাখি' ভূমে
　　দ্রুতপদে গেল কাছে।
কহে সাবধানে তার কানে কানে,—
"রাজার আদেশ আজি কে না জানে,
এমনি ক'রে কি মরণের পানে
　　ছুটিয়া চলিতে আছে?"
দ্বার হ'তে দ্বারে ফিরিল শ্রীমতী
　　লইয়া অর্ঘ্য-থালি।
"হে পুরবাসিনী!"—সবে ডাকি কয়,—
"হয়েছে প্রভুর পূজার সময়!"—
শুনি' ঘরে ঘরে কেহ পায় ভয়,
　　কেহ দেয় তারে গালি।

দিবসের শেষ আলোক মিলা'ল
নগর-সৌধ 'পরে।
পথ জনহীন আঁধারে বিলীন,
কলকোলাহল হ'য়ে এল ক্ষীণ,
আরতিঘণ্টা ধ্বনিল প্রাচীন
রাজ-দেবালয় ঘরে।
শারদ নিশির স্বচ্ছ তিমিরে
অগণ্য তারা জ্বলে।
সিংহদুয়ারে বাজিল বিষাণ,
বন্দীরা ধরে সন্ধ্যার তান,
"মন্ত্রণাসভা হ'ল সমাধান।"
—দ্বারী ফুকারিয়া বলে।

এমন সময়ে হেরিলা চমকি'
প্রাসাদে প্রহরী যত—
রাজার বিজন কানন-মাঝারে
স্তূপ-পদমূলে গহন আঁধারে
জ্বলিতেছে কেন, যেন সারে সারে
প্রদীপমালার মত!

মুক্তকৃপাণে পুররক্ষক
তখনি ছুটিয়া আসি'
শুধা'ল,—"কে তুই ওরে দুর্ম্মতি,
মরিবার তরে করিস্ আরতি?"
মধুরকণ্ঠে শুনিল,—"শ্রীমতী,
আমি বুদ্ধের দাসী।"

সেদিন শুভ্র পাষাণ-ফলকে
পড়িল রক্ত-লিখা।
সে দিন শারদ স্বচ্ছ নিশীথে
প্রাসাদ-কাননে নীরবে নিভৃতে
স্তূপ-পদমূলে নিবিল চকিতে
শেষ-আরতির শিখা!

দুর্ভাগা দেশ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যা'দের করেছ অপমান
অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যা'রে,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান,
অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান।

মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে,
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।
বিধাতার রুদ্ররোষে দুর্ভিক্ষের দ্বারে ব'সে
ভাগ ক'রে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান।
অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান।

তোমার আসন হ'তে যেথায় তা'দের দিলে ঠেলে,
সেথায় শক্তিরে তব নির্ব্বাসন দিলে অবহেলে।
চরণে দলিত হ'য়ে ধূলায় সে যায় ব'য়ে,
সেই নিম্নে নেমে এস, নহিলে নাহি রে পরিত্রাণ।
অপমানে হ'তে হবে আজি তোরে সবার সমান।

যা'রে তুমি নীচে ফেল, সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে।
পশ্চাতে রেখেছ যা'রে, সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।
অজ্ঞানের অন্ধকারে আড়ালে ঢাকিছ যা'রে,
তোমার মঙ্গল ঢাকি' গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান।
অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান।

শতেক শতাব্দী ধ'রে নামে শিরে অসম্মানভার,
মানুষের নারায়ণে তবুও কর না নমস্কার।
তবু নত করি' আঁখি, দেখিবারে পাও না কি—
নেমেছে ধূলার তলে হীন পতিতের ভগবান্?
অপমানে হ'তে হবে সেথা তোরে সবার সমান।

দেখিতে পাও না তুমি মৃত্যুদূত দাঁড়ায়েছে দ্বারে,
অভিশাপ আঁকি' দিল তোমার জাতির অহঙ্কারে!
সবারে না যদি ডাক, এখনো সরিয়া থাক,
আপনারে বেঁধে রাখ চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান—
মৃত্যুমাঝে হবে তবে চিতাভস্মে সবার সমান।

ভারত-তীর্থ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে জাগো রে ধীরে—
এই ভারতের মহা-মানবের সাগর-তীরে।
হেথায় দাঁড়ায়ে দু-বাহু বাড়ায়ে নমি নর-দেবতারে,
উদার ছন্দে পরমানন্দে বন্দন করি তাঁ'রে।
ধ্যান-গম্ভীর এই যে ভূধর,
নদী-জপমালা-ধৃত প্রান্তর,
হেথায় নিত্য হের পবিত্র ধরিত্রীরে,
এই ভারতের মহা-মানবের সাগর-তীরে।

কেহ নাহি জানে—কা'র আহ্বানে কত মানুষের ধারা
দুর্ব্বার স্রোতে এলো কোথা হ'তে, সমুদ্রে হ'ল হারা।
হেথায় আর্য্য, হেথা অনার্য্য, হেথায় দ্রাবিড়, চীন,
শক, হূন-দল, পাঠান, মোগল—এক দেহে হ'ল লীন।
পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার,
সেথা হ'তে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে,
এই ভারতের মহা-মানবের সাগর-তীরে।

রণধারা বাহি' জয়গান গাহি' উন্মাদ কলরবে—
ভেদি' মরুপথ গিরি-পর্ব্বত যা'রা এসেছিল সবে,
তা'রা মোর মাঝে সবাই বিরাজে,—কেহ নহে নহে দূর,
আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে তা'র বিচিত্র সুর।
হে রুদ্রবীণা, বাজো, বাজো, বাজো,
ঘৃণা করি' দূরে আছে যা'রা আজো,
বন্ধ নাশিবে, তা'রাও আসিবে, দাঁড়াবে ঘিরে,—
এই ভারতের মহা-মানবের সাগর-তীরে।

হেথা একদিন বিরামবিহীন মহা-ওঙ্কারধ্বনি
হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিল রণরণি'।
তপস্যা-বলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট্ হিয়া।
সেই সাধনার—সে আরাধনার
যজ্ঞশালার খোলো আজি দ্বার,
হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনত শিরে,—
এই ভারতের মহা-মানবের সাগর-তীরে।

সেই হোমানলে হের আজি জ্বলে দুখের রক্তশিখা,
হবে তা' সহিতে, মর্ম্মে দহিতে,—আছে সে ভাগ্যে লিখা।
এ দুখ বহন করো মোর মন, শোনো রে একের ডাক।
যত লাজ ভয় করো করো জয়, অপমান দূরে যাক।

দুঃসহ ব্যথা হ'য়ে অবসান,
জন্ম লভিবে কি বিশাল প্রাণ।
পোহায় রজনী, জাগিছে জননী বিপুল নীড়ে,
এই ভারতের মহা-মানবের সাগর-তীরে।

এসো হে আর্য্য, এসো অনার্য্য, হিন্দু, মুসলমান
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খ্রীষ্টান
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি' মন ধরো হাত সবাকার;
এস হে পতিত, হোক অপনীত সব অপমানভার।
মা'র অভিষেকে এসো এসো ত্বরা,
মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা
সবার পরশে পবিত্র-করা তীর্থ-নীরে,
আজি ভারতের মহা-মানবের সাগর-তীরে।

আত্মত্রাণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিপদে মোরে রক্ষা করো, এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখ-তাপে ব্যথিত চিতে নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।
সহায় মোর না যদি জুটে নিজের বল না যেন টুটে,
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি লভিলে শুধু বঞ্চনা
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়॥

আমারে তুমি করিবে ত্রাণ, এ নহে মোর প্রার্থনা,
তরিতে পারি শকতি যেন রয়।
আমার ভার লাঘব করি' নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
বহিতে পারি এমনি যেন হয়।
নম্র শিরে সুখের দিনে তোমারই মুখ লইব চিনে,
দুখের রাতে নিখিল ধরা যে দিন করে বঞ্চনা
তোমারে যেন না করি সংশয়॥

হিমাচলে

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

[ইনি ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ২৭শে সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রত্নতত্ত্ব- ও গবেষণা-মূলক অনেক পুস্তক ও প্রবন্ধ বাঙ্গালা ও ইংরেজী উভয় ভাষায় লিখিয়া যশ অর্জ্জন করিয়াছেন। 'ভারতী,' 'প্রবাসী' প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের পত্রিকাসমূহে ইঁহার অনেক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ ও কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। ইনি ওড়িয়া ভাষাতেও সুপণ্ডিত। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ছিলেন। মধ্যপ্রদেশের সম্বলপুরে ওকালতী ব্যবসায় করিয়া ইনি প্রভূত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু চক্ষু-হারা হইয়া ইঁহাকে ওকালতী ছাড়িয়া দিতে হয়। অন্ধ অবস্থাতেও ইনি অবিশ্রান্তরূপে সাহিত্যের সেবা করিতেছেন। 'জীবন-বাণী,' 'কালিদাস,' 'থেরীগাথা,' 'হেঁয়ালি,' 'ছিটে-ফোঁটা,' 'যজ্ঞভস্ম,' 'খেলাধূলা,' 'Elements of Social Anthropology,' 'Aborigines of Central India,' 'Orissa in the Making,' 'History of the Bengali Language' প্রভৃতি গ্রন্থ ইঁহার রচিত।]

অলে   শৈলে সূর্য্য-কিরণ-বিম্ব—
        দলিত ছিন্ন কুজ্ঝটি ;
যেন   তুষারে ধবলগিরির শৃঙ্গ—
        ধেয়ান-মগ্ন ধূর্জ্জটি।
ঐ   সানুর সোপান-মালার ঊর্দ্ধে
        শৃঙ্গ-চরণ-রঞ্জিকা,
শোভে   অভ্র-সুষমা, যেন রে শুভ্রা
        গৌরকান্তি অম্বিকা। ৮

তথা অৰ্দ্ধ-ধূসর ভূধর-খণ্ড
দাঁড়ায়ে প্রান্তে গৌরবে,—
যেন নন্দীর মত রুদ্রপ্রহরী
দলিছে চরণে রৌরবে ;
সেথা স্তব্ধ চপল বাসনা মানসে,
হত লালসার উগ্রতা,
রাজে মৌন মুক্ত শঙ্কর-পদে
তাপসীর চারু শুভ্রতা !

ঘুমন্ত শিশু

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

[দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কৃষ্ণনগরের মহারাজের দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র। ১২৭০ সালে (১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে) ৪ঠা শ্রাবণ ইঁহার জন্ম হয়। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এম্.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কৃষিবিদ্যা-শিক্ষার্থ ষ্টেট্ স্কলার্শিপ্ লইয়া ইনি বিলাতযাত্রা করেন। সেখানে সিসেষ্টার (Cirencester) কৃষি-বিদ্যালয়ে অধ্যয়নান্তে দেশে ফিরিয়া আসিয়া ইনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হন। নানাপ্রকার গুরুতর রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও দ্বিজেন্দ্রলাল অক্লান্তভাবে বঙ্গসাহিত্যের সেবা করিয়া গিয়াছেন। হাসির গান রচনায় ইনি অতুলনীয়। এক সময়ে ইঁহার রচিত বিবিধ নাটক বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চসমূহের প্রধান অবলম্বন-স্বরূপ হইয়াছিল। ইঁহার রচিত পুস্তকগুলির মধ্যে 'কল্কি অবতার,' 'আর্য্যগাথা,' 'মন্দ্র,' 'হাসির গান,' 'আষাঢ়ে,' 'ত্র্যহস্পর্শ,' 'বিরহ,' 'পাষাণী,' 'তারাবাই,' 'রাণাপ্রতাপ,' 'দুর্গাদাস,' 'নূরজাহান,' 'সাজাহান,' 'মেবার-পতন,' 'চন্দ্রগুপ্ত,' 'সীতা,' 'সিংহল-বিজয়,' 'পরপারে' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।]

১

হেমন্তে,—নিস্তব্ধ স্নিগ্ধ শান্ত দুপুর বেলা,
বকুল-তলায় ঘাসের উপর, একান্ত একেলা,
ধূলা নিয়ে আপন মনে খেলা ক'রে খানিক,
ঘুমিয়ে গেছে যাদু আমার, ঘুমিয়ে গেছে মাণিক।

২

ধূলার প্রাসাদ তৈরি ক'রে বাছার গরব ভারি;
নিজের বাহাদুরিটুকু ক'রতে যেন জারি,
বাজাচ্ছিল কাঠি দিয়ে কাঠের বাক্স ভাঙা,
হাস্যে আরও মিষ্টি ক'রে ওষ্ঠ দুটি রাঙা,
আপন মনে তৈরি সুরে আপন মনে গেয়ে;—
এমন সময় ঘুমটি এল নয়ন দুটি ছেয়ে,
অঙ্গ এল অবশ হয়ে, খেলা গেল চুকে',
হাতের কাঠি রৈল হাতে, মুখের হাসি মুখে,
চক্ষু দুটি মুদে' এল;—শীতল শান্ত দুপর,
সোনার বাছা ঘুমিয়ে গেল শ্যামল ঘাসের উপর।

৩

মন্দীভূত ক'রে আরো শীতের সূর্য্যতাপে
বহে বাতাস,—চুলগুলি তা'র সেই বাতাসে কাঁপে;
মর্ম্মরিয়া রৌদ্রতন্দ্রে তরুর পত্র নড়ে,
ঝিকিমিকি কিরণ বাছার মুখে এসে পড়ে;
উপর দিকে ঘনশ্যামল চন্দ্রাতপ রাজে;
নীচের শাখে ঘুঘু ডাকে পাতার কুঞ্জ মাঝে;
ঘেরে তা'রে চারিধারে, হরিৎক্ষেত্র হেন,—
রবির করে ছবির মতন,—নড়েনাক' যেন;
বৎস-সঙ্গে চরে ধেনু দূরে দলে দলে;
বাজায় বেণু রাখাল-বালক আম্রগাছের তলে।

সিঁচোয় বারি কৃষকনারী আলুর ক্ষুদ্র মাঠে;
সুদূর জলায় পুরুষগুলি শীতের ধান্য কাটে;
পথের গায়ে ইক্ষুছায়ে হরিণ ব'সে থাকে;
যাচ্ছে ঘরে গ্রাম্যবধূ পূর্ণকুম্ভ কাঁখে;
—চারিদিকে এমন শান্ত, নীরব, মধুর ছবি;
ধূ ধূ করে ধূসর আকাশ, কিরণ দিচ্ছে রবি;
তার মাঝেতে, সবার সেরা, সবার মধ্যস্থলে,
ঘুমিয়ে গেছে বাছা আমার বকুলগাছের তলে।

৪

ওগো, তোরা কতই জিনিষ দেখেছিস্, না জানি,
দেখেছিস্ কেউ কোনখানে এমন ছবিখানি?
একা একা—না হ'তে তা'র সাঙ্গ ধূলাখেলা,
এমন স্থানে, এমন নিদ্রা, এমন দুপর বেলা,—
পায়ের তলে ফেটে পড়ে তরুণ স্বর্ণপ্রভা;
ঘুমিয়ে দুইটি মুঠোর ভিতর দুইটি রক্ত জবা;
দুইটি গণ্ড-'পরে দুইটি রক্তপদ্ম ফোটে;
অরুণ-লেখা লেপেছে কে দুইটি রাঙা ঠোঁটে;
বৃক্ষমূলে হেলান দিয়ে, বুকে রেখে মাথা;
বিরল দুইটি ভুরুর নীচে আঁখির দুইটি পাতা;
বকুলগাছটি চৌকি দিচ্ছে মাথায় ধ'রে ছাতি;
মাটির উপর দিয়েছে কে শ্যামল শয্যা পাতি';
চরণে তা'র গড়ায় পৃথ্বী, উপরে নীল গগন,—
মাঝখানে তা'র যাদু আমার গভীর নিদ্রামগন।

শরৎকালের পূর্ণশশী বড়ই মধুর বটে,
তারায় যখন ঘিরে' থাকে নীল আকাশের পটে;
দেখ্‌তে মধুর—শৈবালেতে ঘেরা শতদলে,
একটি যখন ফুটে থাকে সুনীল স্বচ্ছ জলে;
—নাইক কিন্তু বিশ্বে কিছু এমন মনোলোভা,
শ্যামল বনের মাঝে যেমন আমার বাছার শোভা।
তাহার শুধু শোভার জন্য সবার সৃষ্টি হেন;
গরবিনী পৃথ্বী তা'রে বক্ষে ধ'রে যেন;
দেখ্‌তে সবাই পিছে যেন সারি বেঁধে দাঁড়ায়,—
বসুন্ধরা নিয়ে তা'রে ঘুমটি কেমন পাড়ায়।

৬

একি খেয়াল বাছারে তোর? গাছের তলে, ভূঁয়ে,
কেবল ছুটো ঘাস-বিছানো ধূলার উপর শুয়ে?
মৌরুসি তোর মায়ের কোলে, বাপের বুকে, হেন
ছেড়ে এসে, বাছারে তুই হেথায় শুয়ে কেন?
আয় রে আমার ননীর পুতুল, আয় রে আমার পাখী,
—ধূলায় কেন? আয় রে তোরে বুকে ক'রে রাখি।

৭

না না;—ঘুমা এমনি করে'—আহা মরি, একি
মধুর ছবি!—ঘুমা, আমি নয়ন ভরে' দেখি!

এমন বকুল-তলায়, এমন শান্ত বনভূমে,
আরো খানিক থাক্ রে যাদু, মগ্ন গাঢ় ঘুমে।
চিত্রকরটি হ'তাম যদি, তোরে এমন দেখে',
রেখে দিতাম যত্ন ক'রে সোনার পটে এঁকে।
ঘুমা এমনি মুগ্ধ হ'য়ে, দেখি আমি খানিক,
ঘুমা আমার সোনার যাদু, ঘুমা আমার মাণিক!

ভারতবর্ষ

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

ভারত আমার, ভারত আমার, যেখানে মানব মেলিল নেত্র;
মহিমার তুমি জন্মভূমি মা, এসিয়ার তুমি তীর্থক্ষেত্র।
দিয়াছ মানবে জগৎ-জননী, দর্শন-উপনিষদে দীক্ষা;
দিয়াছ মানবে জ্ঞান ও শিল্প, কর্ম্ম-ভক্তি ধর্ম্ম-শিক্ষা।

ভগবদ্গীতা গায়িল স্বয়ং ভগবান্ যেই জাতির সঙ্গে;
ভগবৎ-প্রেমে নাচিল গৌর যে দেশের ধূলি মাখিয়া অঙ্গে।
সন্ন্যাসী সেই রাজার পুত্র প্রচার করিল নীতির মর্ম্ম;
যাঁদের মধ্যে তরুণ-তাপস প্রচার করিল 'সোঽহং' ধর্ম্ম।

আর্য্য ঋষির অনাদি গভীর উঠিল যেখানে বেদের স্তোত্র;
নহ কি মা তুমি সে ভারতভূমি, নহি কি আমরা তাঁ'দের গোত্র!
তাঁ'দের গরিমা-স্মৃতির বর্ম্মে, চ'লে যাব শির করিয়া উচ্চ—
যাঁ'দের গরিমাময় এ অতীত, তাঁ'রা কখনই নহে মা তুচ্ছ।

ভারত আমার, ভারত আমার, সকল মহিমা হউক খর্ব্ব;
দুঃখ কি যদি পাই মা তোমার পুত্র বলিয়া করিতে গর্ব্ব;
যদি বা বিলয় পায় এ জগৎ, লুপ্ত হয় এ মানব-বংশ,
যাঁ'দের মহিমাময় এ অতীত, তাঁ'দের কখন হবে না ধ্বংস!

চ'খের সাম্‌নে ধরিয়া রাখিয়া অতীতের সেই মহা আদর্শ,
জাগিব নূতন ভাবের রাজ্যে রচিব প্রেমের ভারতবর্ষ!
এ দেবভূমির প্রতি তৃণ 'পরে আছে বিধাতার করুণা-দৃষ্টি,
এ মহাজাতির মাথার উপরে করে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি!

ভারত আমার, ভারত আমার, কে বলে তুমি মা কৃপার পাত্রী?
কর্ম্ম-জ্ঞানের তুমি মা জননী, ধর্ম্ম-ধ্যানের তুমি মা ধাত্রী।

মা

রজনীকান্ত সেন

[পাবনা জেলার ভাঙ্গাবাড়ী গ্রামে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে রজনীকান্ত সেনের জন্ম হয়। বঙ্গদেশে কবিতা এবং গান রচনা করিয়া যাঁহারা যশস্বী হইয়াছেন, রজনীকান্ত তাঁহাদের অন্যতম। ইনি রাজসাহীতে ওকালতী করিতেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার রচিত 'বাণী' ও 'কল্যাণী' এই দুইখানি গানের বই বঙ্গসাহিত্যে বিশেষ আদর লাভ করিয়াছে।]

স্নেহ-বিহ্বল, করুণা-ছলছল,

শিয়রে জাগে কা'র আঁখি রে !

মিটিল সব ক্ষুধা, সঞ্জীবনী-সুধা

এনেছে, অশরণ লাগি' রে !

শ্রান্ত অবিরত যামিনী জাগরণে,

অবশ কৃশ তনু মলিন অনশনে

আত্মহারা, সদা বিমুখা নিজ সুখে,

তপ্ত তনু মম করুণা-ভরা বুকে

টানিয়া লয় তুলি', যাতনা-তাপ ভুলি',

বদন-পানে চেয়ে থাকি রে !

করুণে বরষিছে মধুর সান্ত্বনা,
শান্ত করি' মম গভীর যন্ত্রণা ;
স্নেহ-অঞ্চলে মুছায়ে আঁখিজল
ব্যথিত মস্তক চুম্বে অবিরল,
চরণ-ধূলি সাথে, আশীষ রাখে মাথে,
সুপ্ত হৃদি উঠে জাগি' রে।
আপনি মঙ্গলা, মাতৃরূপে আসি',
শিয়রে দিল দেখা পুণ্য-স্নেহ-রাশি,
বক্ষে ধরি' চির-পীযূষ-নির্ঝর,
নিরাশ্রয়-শিশু-অসীম-নির্ভর।
নমো নমো নমঃ, জননি দেবি মম!
অচলা মতি পদে মাগি রে।

শ্রাবণে

অক্ষয়কুমার বড়াল

[কলিকাতা চোরবাগানে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে অক্ষয়কুমার বড়ালের জন্ম হয়। ইঁহাদের আদি নিবাস কয়াসডাঙ্গা। 'প্রদীপ,' 'কনকাঞ্জলি,' 'ভুল,' 'এষা,' 'শঙ্খ' প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর কবিতাগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ইনি বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।]

সারাদিন একখানি জল-ভরা কালো মেঘ
রহিয়াছে ঢাকিয়া আকাশ ;
ব'সে জানালার পাশে, সারাদিন আছি চেয়ে—
জীবনের আজি অবকাশ !

গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ে, তরুগুলি হেলে-দোলে,
ফুলগুলি পড়েছে খসিয়া,
লতাদের মাথাগুলি মাটিতে পড়েছে লুটি',
পাখীগুলি ভিজিছে বসিয়া।

কোথা সাড়া-শব্দ নাই পথে লোক-জন নাই,
হেথা-হোথা দাঁড়ায়েছে জল ;
ভিজা ঘাস-ঝাড় হ'তে লাফায় ফড়িং কভু,
জলায় ডাকিছে ভেকদল।

চাতক, ঝাড়িয়া পাখা, ডাকিয়া 'ফটিক-জল,'
ছাড়ি' নীড়, উঠিছে আকাশে ;
কদম্ব-কেতকী-বাস কাঁপিছে বাতাসে ধীরে ;
গেছে ধরা ঢেকে' শ্যাম ঘাসে।

দীঘিটি গিয়াছে ভরে', সিঁড়িটি গিয়াছে ডুবে',
কানায় কানায় কাঁপে জল ;
বৃষ্টি-ভরে—বায়ু-ভরে নুয়ে পড়ে বার বার
আধ-ফোটা কুমুদ-কমল !

তীরে নারিকেল-মূলে থল্-থল্ করে জল ;
ডাহুক-ডাহুকী কূলে ডাকে ;
সারি দিয়া মরালীরা ভাসিছে তুলিয়া গ্রীবা,
লুকাইছে কভু দাম-ঝাঁকে।

পাড়ে পাড়ে চকা-চকী ব'সে আছে দু'টি দু'টি';
বলাকা মেঘের কোলে ভাসে ;
কচিৎ গ্রামের বধূ শূন্য কুম্ভ ল'য়ে কাঁখে,
তরু-তল দিয়া ধীরে আসে।

কচিৎ অশ্বত্থ-তলে ভিজিছে একটি গাভী ;
টোকা-মাথে যায় কোন চাষী ;
কচিৎ মেঘের কোলে মুমূর্ষুর হাসি-সম
চমকিছে বিজলীর হাসি।

মাঠে নবশ্যাম ক্ষেতে কচি কচি ধান-গাছ
মাথাগুলি জাগাইয়া আছে—
কোলে লুটিতেছে জল টল্‌-মল্‌ থল্‌-থল্‌,
বুকে বায়ু থর-থর নাচে।

সুদূরে মাঠের শেষে জ'মে আছে অন্ধকার,
কোথা যেন হ'তেছে প্রলয়,
কুটীরে বসিয়া গৃহী পুত্র-পরিবার-সহ
কত দুর্য্যোগের কথা কয়।

চেয়ে আছি শূন্যপানে, কোন কাজ হাতে নাই—
কোন কাজে নাহি বসে মন,
তন্দ্রা আছে, নিদ্রা নাই; দেহ আছে, মন নাই—
ধরা যেন অস্ফুট স্বপন!

এই উঠি, এই বসি; কেন উঠি, কেন বসি!
এই শুই, এই গান গাই!
কি গান—কাহার গান! কি সুর—কি ভাব তার—
ছিল কভু আজ মনে নাই!

জীবন-সোপান

অক্ষয়কুমার বড়াল

গৃহচূড়ে নর যথা সোপান বাহিয়া
উঠে ধীরে ধীরে,
এই জগতে নিরন্তর বাহি' শোকদুঃখস্তর
উঠে কি মানব-আত্মা তোমার মন্দিরে?

পদে পদে পরাজয়, অতি অসহায়,
অদৃষ্ট নির্ম্মম!
এই অশ্রু, এই শ্বাস করে কি জড়তা নাশ?
দেয় কি নবীন আশ, নবীন উদ্যম?

এই দর্প, অহঙ্কার, কু-চক্র, কু-আশা—
এ কি আরাধনা?
এই কাম, এই ক্রোধ দিতেছে কি আত্মবোধ?
লোভে ক্ষোভে হ'তেছে কি তোমার ধারণা?

জগৎ-ভিতর দিয়া জগতের জীব
বুঝে কি তোমায় ?
এই পড়ে, এই উঠে, এই হাহাকারে ছুটে,
পাপে অনুতাপে লভে দেব-মহিমায় ?

প্রবীণ জনক যথা শিশু-ক্রীড়া হেরি'
হাসিয়া আকুল,—
অমনি কি দেহ-শেষে আমিও উঠিব হেসে,
স্মরি' নর-জনমের সুখ-দুঃখ-ভুল ?

জগতের পাপতাপ জগতেই শেষ ?
কহ দয়াময় !
উঠিয়া পর্ব্বতচূড়ে ধরণীরে হেরি' দূরে—
পথের ত দুঃখ-ক্লেশ ভ্রম মনে হয় !

অন্তর্য্যামী

চিত্তরঞ্জন দাশ

[১২৭৭ সালে (১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে) ২০এ কার্ত্তিক কলিকাতায় চিত্তরঞ্জন দাশের জন্ম হয়। ১৩৩২ সালে (১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে) ২রা আষাঢ় ইনি ইহলোক ত্যাগ করেন। ইনি একজন অতি-প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ছিলেন এবং এই ব্যবসায়ে উন্নতির উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন। পরে রাজনীতিক আন্দোলনে যোগ দিয়া ইনি ব্যারিষ্টারী পেশা একেবারে ছাড়িয়া দেন, এবং দেশহিতকর কার্য্যে তাঁহার সমস্ত অর্থ ও সম্পত্তি দান করেন। এই জন্ত দেশবাসী ইঁহাকে "দেশবন্ধু" আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। মাতৃভাষার প্রতি ইঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল। ইনি 'নারায়ণ' নামে একখানি নূতন ধরনের মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। ইঁহার রচিত 'মালঞ্চ,' 'সাগর-সঙ্গীত,' 'মালা,' 'অন্তর্য্যামী' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে ইঁহার কবি-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।]

নাহি মেঘ, তবু যেন ছুটাছুটি করে
অপূর্ব্ব আলোক-ছায়া মেঘেরি মতন!
নাহি চন্দ্র, নাহি সূর্য্য, কি যে স্বপ্ন-ভরে
উজলি রেখেছে তারে, সে কোন্ গগন!
নাহি শব্দ, তবু যেন মধুর গম্ভীর
ঝরিতেছে নিরন্তর কার গীত-ধার।
প্রশান্ত আনন্দ ভরা ধীর অতি ধীর!
কে যেন বন্দনা করে কোন্ দেবতার!
বর্ণাতীত বর্ণে ঢাকা আনন্দ গম্ভীর
ওই ছায়া-লোকে ভাসে নিভৃত মন্দির!

আশার স্বপন

কামিনী রায়

['আলো ও ছায়া' লিখিয়া বঙ্গসাহিত্যে কামিনী রায় প্রভূত যশ অর্জন করিয়াছিলেন। ইনি বিখ্যাত সাহিত্যিক চণ্ডীচরণ সেনের কন্যা এবং সিভিলিয়ান কেদারনাথ রায়ের পত্নী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইঁহাকে "জগত্তারিণী" স্বর্ণ-পদক পুরস্কার দিয়া ইঁহার কবি-প্রতিভাকে সম্মানিত করিয়াছেন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ইনি পরলোক-গমন করেন।]

তোরা শুনে যা আমার মধুর স্বপন,
    শুনে যা আমার আশার কথা,
আমার নয়নের জল রয়েছে নয়নে
    প্রাণের তবুও ঘুচেছে ব্যথা।

এই নিবিড় নীরব আঁধারের তলে,
    ভাসিতে ভাসিতে নয়নের জলে,
কি জানি কখন কি মোহন বলে,
    ঘুমায়ে ক্ষণেক পড়িনু তথা।

আমি শুনিনু জাহ্নবী যমুনার তীরে
    পুণ্য দেবস্তুতি উঠিতেছে ধীরে,
কৃষ্ণা-গোদাবরী-নর্ম্মদা-কাবেরী
    পঞ্চনদকূলে একই প্রথা।

আর দেখিনু যতেক ভারত-সন্তান,
একতায় বলী, জ্ঞানে গরীয়ান্,
আসিছে যেন গো তেজো মূর্ত্তিমান্,
অতীত সুদিনে আসিত যথা।

ঘরে ভারত-রমণী সাজাইছে ডালি,
বীরশিশুকুল দেয় করতালি,
মিলি' যত বালা গাঁথি' জয়মালা,
গাহিছে উল্লাসে বিজয়-গাথা।

চাহিবে না ফিরে'

কামিনী রায়

পথে দেখে', ঘৃণাভরে কত কেহ গেল স'রে,
উপহাস করি' কেহ যায় পায়ে ঠেলে';
কেহ বা নিকটে আসি' বরষি' গঞ্জনা রাশি,
ব্যথিতেরে ব্যথা দিয়া যায় শেষে ফেলে'।

পতিত মানব-তরে নাহি কি গো এ সংসারে
একটি ব্যথিত প্রাণ, দু'টি অশ্রুধার ?
পথে প'ড়ে অসহায়, পদে তা'রে দ'লে যায়,—
দু'খানি স্নেহের কর নাহি বাড়া'বার ?

সত্য, দোষে আপনার চরণ স্খলিত তা'র,
তাই তোমাদের পদ উঠিবে ও শিরে ?
তাই তা'র আর্ত্তরবে সকলে বধির হবে,
যে যাহার চ'লে যাবে—চাহিবে না ফিরে' ?

বর্ত্তিকা লইয়া হাতে, চলেছিল একসাথে
পথে নিবে' গেছে আলো, পড়িয়াছে তাই ;
তোমরা কি দয়া ক'রে, তুলিবে না হাতে ধ'রে ?—
অর্দ্ধ দণ্ড তা'র লাগি' থামিবে না ভাই ?

তোমাদের বাতি দিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া নিয়া,
তোমাদেরি হাত ধরি' হোক্ অগ্রসর,
পঙ্ক মাঝে অন্ধকারে ফেলে' যদি যাও তা'রে,
আঁধার রজনী তা'র রবে নিরন্তর।

———

সাধক

মানকুমারী বসু

[যে সকল মহিলা-কবি কবি-প্রতিভায় আপনাদিগকে বাঙ্গালা-সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, মানকুমারী বসু তাঁহাদের অন্যতমা। ইঁনি মাইকেল মধুসূদনের ভ্রাতুষ্পুত্রী। ইঁহার বাড়ী যশোহর সাগরদাঁড়ি গ্রামে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইঁহাকে "ভুবনমোহিনী দাসী" স্বর্ণ-পদক পুরস্কার দিয়া সম্মানিতা করিয়াছেন।]

১

আমি চাই মহতের মহৎ পরাণ,
মুকুতা-মাণিক্য-নিধি
আমারে দিও না বিধি !
চাহিনে এ জগতের রাজত্ব সম্মান ;
বাঞ্ছিত পরাণ পেলে',
প্রাণটুকু দিয়া ঢেলে',
মেগে' নেব মনুষ্যত্ব—শ্রেষ্ঠ উপাদান,
প্রাণের সাধক আমি, সাধনীয় প্রাণ।

২

আমি চাই শিশু হেন উলঙ্গ পরাণ,
মুখে মাখা সরলতা,
কয় না সাজানো কথা,
জানে না যোগাতে মন করি' নানা ভাণ ;

প্রাণ খোলা মন খোলা,
আপনি আপনা ভোলা,
তা'র স্নেহ-প্রীতি সব-ই হৃদয়ের টান!
আমি চাই স্বরগের উলঙ্গ পরাণ।

৩

আমি চাই মনোহর সুন্দর পরাণ
পবিত্র—উষার রবি,
কোমল—ফুলের ছবি,
মধুর—বসন্ত-বায়ু, পাপিয়ার গান;
আনন্দে—শারদ ইন্দু,
গাম্ভীর্য্যে—অতল সিন্ধু,
পূর্ণ—বরষার বিল ভরা কানেকান,
আমি চাই মনোহর সুন্দর পরাণ।

৪

আমি চাই বীরত্বের তেজস্বী পরাণ,
পায়ে ঠেলে তোষামোদ,
নীচতার অনুরোধ,
তা'র ব্রত—সত্য-রক্ষা, সত্যানুসন্ধান;
চাহে না নিজের ইষ্ট,
অতুল কর্ত্তব্যনিষ্ঠ,
ধরা প্রতিকূল হ'লে নহে কম্পমান;
জীবন-সংগ্রামে নিত্য
বিজয়ী তাহার চিত্ত,
অনন্তে উড়িছে তা'র বিজয়-নিশান।
আমি চাই বীরত্বের তেজস্বী পরাণ।

৫

আমি চাই বিশ্বেদর উদার পরাণ,
জ্ঞান সত্য নীতি পূজ্জ,
দলাদলি নাহি বুঝে,
সে জানে সকলে এক মায়ের-ই সন্তান;
মরমে মহত্ত্ব পূর্ণ,
হীনতা করেছে চূর্ণ,
হৃদয়ের ভাব সব উদার মহান্;
ন্যায় তরে প্রিয়ত্যাগী,
প্রীতিতে পরানুরাগী,
সমাদরে রাখে জ্ঞানী-গুণীর সম্মান;
অনুতপ্ত অশ্রুধার
কখন সহে না তা'র,
অনুতাপী পাপী পেলে' পুণ্য করে দান;
বিশ্বের উন্নতি আশা,
বিশ্বময় ভালবাসা,
বিশ্বের মঙ্গল সাধে করি' আত্মদান;
মরতে সে দেবোপম,
উপাস্য নমস্য মম,
বসুধা কৃতার্থ তা'রে কোলে দিয়ে স্থান।
আমি সাধি সাধনা—সে দেবতার প্রাণ।

কাল-বৈশাখী

প্রিয়ংবদা দেবী

[ইনি বিচারপতি স্যর আশুতোষ চৌধুরীর ভগিনী মহিলা-কবি প্রসন্নময়ী দেবীর কন্যা। 'রেণু' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ লিখিয়া ইনি খ্যাতিলাভ করিয়া গিয়াছেন।]

নটরাজ! সাজিলে কি তাণ্ডব-নর্ত্তনে?
আন্দোলিয়া দ্রুমদল, গম্ভীর গর্জ্জনে
বাজাইয়া প্রলয়-পিনাক ঝটিকার?
ওড়ে ধূলি, ঘোরে পত্র ছিন্ন লতিকার—
প্রাণপণ আগ্রহের একান্ত বন্ধন;
জ্বালামুখী বিদ্যুতের অসহ্য দহন,
পাংশু পুঞ্জীভূত মেঘে আচ্ছন্ন অম্বর!
ভয়ার্ত্ত বসুধা-বক্ষে কাঁপিছে ভূধর!
উঠিতেছে পড়িতেছে উত্তাল স্পন্দনে
সিন্ধু-বক্ষে লক্ষ ঊর্ম্মি ব্যাকুল ক্রন্দনে।
তোমার চরণ বেষ্টি' ভুজঙ্গের মত
উদ্ধত অশ্বত্থ-শাখা জটা-সমুদ্ধত!
জাগিছে ঈশান-কোণে রক্ত ভয়ঙ্কর,—
তোমার ললাট-দীপ্তি, ওগো দিগম্বর!

বল, বল, বল সবে

অতুলপ্রসাদ সেন

[১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম ও ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ২৭শে আগষ্ট মৃত্যু হয়। ইনি একজন ব্যারিষ্টার ছিলেন, এবং লক্ষ্ণৌ সহরে অবস্থিতি করিতেন। গান-রচনায় এবং তাহাতে সুর-দানে ইনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ইনি 'উত্তরা' নামক একখানি মাসিকা পত্রিকা সম্পাদন করিতেন। ইঁহার 'কয়েকটি গান' ও 'গীতিকুঞ্জ' নামক গীত-পুস্তক এবং (সাহানা দেবীর সহযোগে লিখিত) 'কাকলি' নামক স্বরলিপি-পুস্তক সঙ্গীত-রসিক-সমাজে সুবিখ্যাত।]

বল, বল, বল সবে, শত বীণা-বেণু-রবে,
ভারত আবার জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।
ধর্ম্মে মহান্ হবে, কর্ম্মে মহান্ হবে,
নব-দিনমণি উদিবে আবার পুরাতন এ পূরবে।

আজও গিরিরাজ রয়েছে প্রহরী,
ঘিরি তিন দিক নাচিছে লহরী,
যায়নি শুকায়ে গঙ্গা গোদাবরী,
এখনও অমৃতবাহিনী।

প্রতি প্রান্তর, প্রতি গুহা-বন,
প্রতি জনপদ, তীর্থ অগণন,
কহিছে গৌরব-কাহিনী।

বল, বল, বল সবে,....................এ পূরবে॥

বিদুষী মৈত্রেয়ী-খনা-লীলাবতী
সতী সাবিত্রী-সীতা-অরুন্ধতী—
বহু বীরবালা বীরেন্দ্র-প্রসূতি—
আমরা তাঁ'দেরই সন্ততি

অনলে দহিয়া রাখে যা'রা মান,
পতি-পুত্র তরে সুখে ত্যজে প্রাণ—
আমরা তাঁ'দেরই সন্ততি।

বল, বল, বল সবে.....................এ পূরবে

ভোলেনি ভারত, ভোলেনি সে কথা;
অহিংসার বাণী উঠেছিল হেথা;
নানক, নিমাই করেছিল ভাই
সকল ভারত-নন্দনে।

ভুলি' ধর্ম্ম-দ্বেষ জাতি-অভিমান,
ত্রিশ কোটী দেহ হবে এক প্রাণ,
এক জাতি প্রেম-বন্ধনে।

বল, বল, বল সবে,.....................এ পূরবে

মোদের এ দেশ নাহি রবে পিছে,
ঋষি-রাজকুল জন্মেনি মিছে ;
দুদিনের তরে হীনতা সহিছে,
জাগিবে, আবার জাগিবে ;

আসিবে শিল্প-ধন-বাণিজ্য,
আসিবে বিদ্যা-বিনয়-বীর্য্য
আসিবে, আবার আসিবে।

বল, বল, বল সবে,……………………এ পূরবে ॥

এস হে কৃষক কুটীরনিবাসী,
এস অনার্য্য গিরিবনবাসী,
এস হে সংসারী, এস হে সন্ন্যাসী,
মিল হে মায়ের চরণে।

এস অবনত, এস হে শিক্ষিত,
পরহিত ব্রতে হইয়া দীক্ষিত,
মিল হে মায়ের চরণে।

এস হে হিন্দু, এস মুসলমান,
এস হে পারসী, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টিয়ান,
মিল হে মায়ের চরণে।

বল, বল, বল সবে,……………………এ পূরবে

বেলা যায়

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

[ময়মনসিংহ-সন্তোষের বিখ্যাত জমিদার-বংশে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর জন্ম হয়। ইনি একজন সুকবি। ইঁহার 'পদ্মা,' 'গৌরাঙ্গ,' 'গৈরিক,' 'গীতিকা' প্রভৃতি কাব্য-গ্রন্থ সর্ব্বত্র সমাদৃত। ইঁহার রচিত কয়েকখানি নাটক এবং অনেকগুলি গানও সাহিত্যে সুপরিচিত।]

একদা কোনও এক রজকের ঘরে
ডাকিছে বালিকা অতি সোহাগের স্বরে,
নিদ্রিত পিতারে,—'ওঠ বাবা, বেলা যায়!'
তখন গ্রামের সূর্য্য অস্তে যায় যায়,
বালিকার কণ্ঠস্বর চঞ্চল পবনে
সঞ্চারিল স্তব্ধতায়। শিবিকারোহণে
অদূরে গৃহের পথে ফিরিছেন যথা
লালাবাবু কর্ম্মস্থল হ'তে, দুটি কথা
চ'লে গেল সেথা! নিস্তব্ধ শিবিকা হ'তে
'থামাও থামাও,'—প্রৌঢ় বলে মধ্যপথে,—
'ওরে বেলা যায়!' বিস্মিত বাহকগণ
রাখিল শিবিকা। লালা কম্পিতচরণ
দাঁড়াইয়া জীবনের প্রশান্ত সন্ধ্যায়
আপনারে উঠিলা ডাকিয়া,—'বেলা যায়!'

বহুমূল্য বেশ-বাস ফেলিলেন খুলে,
ভৃত্যগণে দিলেন বিদায়। বক্ষে তুলে'
লইলেন জীবনের কুজ্ঝটিকা হ'তে
প্রজ্ঞার আলোক!
অ-দোসর, বিশ্বস্রোতে
ঝাঁপায়ে পড়িল বেগে। জ্বলে হুতাশন
ছলছল নেত্রপ্রান্তে; কি জানি দাহন
অনুতপ্ত উচ্চ হৃদয়ের! ঊর্দ্ধে চাহি'
নিঃশ্বসিলা। কোথা হ'তে উঠিলা কে গাহি'
সেই দুটি কথা,—'বেলা যায়!'—'বেলা যায়!'
বিশাল অনন্ত প্লাবি' গম্ভীর সন্ধ্যায়!
সাবধানী তিরস্কার, মঙ্গল-শাসন,
স্নেহ-রোষে ইঙ্গিতে কি জানা'ল গগন?

হু হু করি' সান্ধ্য বায়ু ফেলিয়া নিঃশ্বাস,
নেমে এল শূন্য হ'তে; ত্যজি' দিবাবাস
মহাবেগে ব্যোমচর ধাইছে অম্বরে;
অকিঞ্চন রশ্মিলেশ কম্পিত অন্তরে
যাইতেছে হারাইয়া!
কোথা গেল রবি
দিগন্তের প্রান্তে নেমে? মুছে' গেছে ছবি
দৃপ্ত দিবসের! ফিরে' আসে গাভীগুলি
অর্দ্ধভুক্ত তৃণ ফেলি'; হেরিয়া গোধূলি

কর্ম্মব্যস্ত কৃষাণেরা লইল বিদায়
ধান্যপূর্ণ ক্ষেত্র-পাশে রুদ্ধ-বেদনায় !
হেরিলা অধীরে প্রৌঢ়, চারি-দিক্-ভরা
কেবল বিদায়-যাত্রা ; মুক্ত, মায়াহরা
ত্যাগের ঘোষণা !

ছুটিলা তৃষিত মনে

কা'র ছদ্ম করুণার শুভ আকর্ষণে !
লক্ষকোটি নভ-আঁখি সাক্ষী হ'ল তা'র,
নীরবে দেখা'ল পথ নাশি' অন্ধকার !
পুরাতন পরিচিত, বহু উচ্চারিত
'বেলা যায়'—এই দুটি কথা, রোমাঞ্চিত
অন্তরের অন্তঃকর্ণে লাগিলা শুনিতে
সম্মোহন কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত নিশিতে !

আয়

শেখ ফজ্‌লল্‌ করিম

[ইনি আধুনিক কালের একজন সুকবি। বালক-বালিকাদের উপযোগী কবিতা-রচনায় ইঁহার বিশেষ দক্ষতা দেখা যায়। বহু পত্রিকায় ইঁহার কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে।]

ধানের ক্ষেতে বাতাস নেচে যায়—দামাল ছেলের মত;
ডাক দে' বলে, "আয় রে তোরা আয়, ডাক্‌ব তোদের কত!
মুক্ত মাঠের মিষ্টি হাওয়া জোটে না যা' ভাগ্যে পাওয়া,
হারাসুনে ভাই অবহেলায় রে,—দিন যে হ'লো গত।"
ধানের ক্ষেতে বাতাস নেচে যায়—চপল ছেলের মত!

ছোট্ট নদী কোন্ সুদূরে ধায়, বক্ষে রজত-ধারা;
ডাক দে' বলে, "আয় রে ছুটে' আয়, কৃপণ, সাহস-হারা!
লাগ্‌লে মাথায় বৃষ্টি-বাতাস উল্টে' কি যায় সৃষ্টি-আকাশ,
রোদের ভয়ে থাক্‌লে শুয়ে' রে,—নৌকা বাইবে কা'রা?"
ছোট্ট নদী কোন্ সুদূরে ধায়, বক্ষে রজত-ধারা!

সবুজ বনের শীতল কোলের কাছে একটি খ'ড়ো ঘর;
ডাক দে' বলে, "ভুলেছ ভাই মোরে, তাই ভেবেছ পর!
ইটের পাজায় চক্ষু বুজে' নিত্য নূতন অভাব খুঁজে'—
শেষ হ'বে তোর জীবন-ধারা যে,—থাক্‌বে বালুচর।"
সবুজ বনের শীতল কোলের কাছে একটি খ'ড়ো ঘর!

সাত-সকালে ঝাঁপি-মাথায় চাষী মাঠের দিকে ধায়,
ডাক দে' বলে, "এই ত তা'দের পথ, বাঁচ্‌তে যা'রা চায়।
পেটের ক্ষিদে মেটে না যা'র এই ধরাতে ঠাঁই কোথা তা'র?
বাঁচ্‌তে হ'লে লাঙল ধর রে, আবার এসে গাঁয়।"
সাত-সকালে ঝাঁপি-মাথায় চাষী মাঠের দিকে যায়!

মহাপ্রয়াণে আশুতোষ

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

['ঝরাফুল,' শান্তিজল' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের লেখক করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় আধুনিক কবিগণের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইঁহার নিবাস শান্তিপুর।]

জাগিল ঝঞ্ঝা কাল-বৈশাখী, বাংলা অন্ধকার!
নাহি আর সেই স্নেহ-অবতার, পুরুষ বজ্র-সার;
চরিত্র যাঁ'র চির-পবিত্র, রাখিয়া ন্যায়ের মান
জন-সমুদ্র মন্থন ক'রে—যান তিনি চলে' যান।
ব্যক্তিত্বেরই মহারথে যিনি অপ্রতিহত-গতি,
অদ্ভুত যাঁ'র মেধা ক্ষুরধার, নাই সে শ্রেষ্ঠ রথী।
কত আশা ক'রে যাঁ'র মুখ 'পরে চেয়েছিল সারা দেশ,
হা রে অদৃষ্ট! এল সে শিবের শব-দেহ,—সব শেষ!

ওঠে হাহাকার আকাশের ঐ গম্বুজ বিদারিয়া,
শ্মশানের নীল-পিঙ্গল-জ্বালা ঝলসিয়া দেয় হিয়া!
বৈতরণীর পারের পথিক, গিয়াছ কি সব ভুলে'?
লক্ষ-যুগের জীবন-ভোলান' আলোর মোহানা-কূলে!
মিলিয়াছে তব চির-বাঞ্ছিত-তীর্থের পথ-রেখা,
একলা-যাওয়ার শেষ-পথে আজি যাত্রা করেছ একা।
পঁহুছে কি সেথা মর্ত্ত্যের ব্যথা, অশ্রুর সুরধুনী?
চলে' যাও গুণী, বিদায়-বিধুর বিলাপের সুর শুনি'।

ছিলে আশুতোষ আশুতোষ-সম বরাভয়-হাসি-মুখে,
ছিলে ছাত্রের পরমাত্মীয়, কেঁদেছ তা'দের দুখে।
তা'দের জ্ঞানের, তা'দের ধ্যানের—ধ্রুব আদর্শ তুমি,
তোমার তপের 'আকাশ-প্রদীপে' দীপ্ত আর্য্য-ভূমি;
জননী তোমার ইষ্ট-দেবতা, মায়ের ভক্ত ছেলে,
গরীয়সী যাঁ'র আশীর্ব্বাণীতে দৈবী শকতি পেলে।
নির্ম্মল তব বিবেক-বুদ্ধি, মুক্ত তোমার প্রাণ,
মায়ের পূজায় পূজিয়াছ সেই জাগ্রৎ ভগবান্।

হ'য়ে আগুয়ান, ওড়ালে নিশান সজ্জিত চতুরঙ্গে,
দেশ-লক্ষ্মীর রক্ষা-কবচ ঝল্‌মলে তব অঙ্গে
সংগ্রামে তব গর্জ্জেনি তোপ,—দেশ-কাল-বিজয়ীর
যশশ্ছটায় ভাস্বর তব অটলোন্নত শির
ক'রেছিলে তুমি রণ-পণ্ডিত চাণক্য-সম পণ,
ভ্রূক্ষেপে যাঁ'র হ'ত টল্‌মল্ রাজার সিংহাসন।

কীর্ত্তি তোমার বাংলার এই বিশ্ববিদ্যালয়,—
নব-ভারতের গৌরব-চূড়া অবিনাশ অক্ষয়;
বঙ্গবাণীর আরতি-ডঙ্কা বাজালে হেথায় তুমি,
মুখর করিলে মাভৈঃ-মন্ত্রে বিদ্যার পীঠভূমি।
জ্ঞান-রাজসূয়-যজ্ঞ-বেদীতে দেব-ঋষিদের সনে,
অর্পিছ আজি পূর্ণ-আহুতি সত্যের হুতাশনে।

তৃপ্ত তোমার আত্মার তৃষা অমৃত-শান্তি-নীরে,
বিরাম লভিছ লোকান্তরের অলকনন্দা-তীরে।
এনেছে বহিয়া এ ভাগ্যহীন তোমার পূজার ডালা,
বাংলার ফুল পদ্ম-বকুল-চাঁপার সুরভি-ঢালা;
এস বরেণ্য, এস মোর ধ্যানে, লহ অঞ্জলি মোর,
তোমার গুণের অনুকীর্ত্তনে বিগলিত আঁখিলোর;

খেয়া-ডিঙি

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

[নদীয়া জেলার যমসেরপুরের সম্ভ্রান্ত বাগচী-পরিবারে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে যতীন্দ্র-মোহন বাগচীর জন্ম। ইনি বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া অবধি সাহিত্য-সেবায় ব্রতী আছেন। আধুনিক বঙ্গীয় কবিগণের মধ্যে ইনি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইঁহার 'লেখা,' 'রেখা,' 'অপরাজিতা,' 'নাগকেশর,' 'নীহারিকা,' মহাভারতী,' 'কাব্যমালঞ্চ' প্রভৃতি অনেকগুলি পুস্তক কাব্যামোদীর প্রিয়।]

পাটের ক্ষেতের ভিতর দিয়ে ঘাটের ডিঙা বাই—
তবু আমার হাটের সাথে কোন বাঁধন নাই ;
শিরা-ওঠা ফাটা হাতে হালের গোড়া ধরি'
আমি শুধু আপন মনে এপার-ওপার করি।

তোমরা ভাবো ক্ষেত আর ফসল, বৃষ্টি বাদল বান,
ডুবল কত, বাঁচল কত ভরা ভাদুই ধান,
আমার কিন্তু সে সব দিকে খেয়াল-খবর নাই—
আমি আমার নিয়ম মতন ঘাটের ডিঙা বাই।

ভাদর আসে মরা গাঙে ভরা বন্যা নিয়ে—
রাঙা জলে এপার ওপার একসা করে' দিয়ে ;
লগির গোড়া পায়না তলা, মিলেনা আর থই,
দিনে রাতে তবু আমার ঘাটের ডিঙা বই।

হঠাৎ যেদিন বানের জলে ছাপিয়ে উঠে মাঠ,
হাঁটু-নাগাল ধানের জমি, গলা-নাগাল পাট,
কানাকানি বানের জলে ধানের আগা দোলে,
টল্‌মলিয়ে ডিঙা আমার চলে তারি কোলে।

কোথায় বা সে আলের রেখা, কোথায় বা সে বাঁধ,
বাবলা গাছের বেড়া নিয়ে কোথায় বা বিবাদ!
বাঁধন-হারা বানের মুখে বিধি-বিধান নাই—
সীমাবিহীন সাঁতার-ক্ষেতে ঘাটের ডিঙা বাই।

কোমর-জলে দাঁড়িয়ে বসে' কাস্তে চালায় চাষী,
ধানের শীষের সোঁদা গন্ধ হাওয়ায় উঠে ভাসি';
কাজল-কটা পানের ডগা নুইয়ে জলের তলে
মস্‌মসিয়ে তারি মাঝে ডিঙা আমার চলে।

আটিবাঁধা ধানের রাশি এপার-ওপার করি,
পালাবাঁধা পাটের গাদা বোঝাই করে' মরি;
দিনে রাতে কত লোকের কত কথা শুনি—
আমি বসে' আপন মনে খেয়ার কড়ি গুণি।

জলের গায়ে সিঁদুর ঢেলে সূর্য্যি উঠে পূবে,
দিনের খেয়া সেরে' আবার পশ্চিমেতে ডুবে;
বারমাসে একটি দিনও ছুটি-কামাই নাই,
তারি সাথে আমি আমার ঘাটের ডিঙা বাই।

কর্ম্ম

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

শক্তি-মায়ের ভৃত্য মোরা—নিত্য খাটি, নিত্য খাই,
শক্ত বাহু, শক্ত চরণ, চিত্তে সাহস সর্ব্বদাই ;
ক্ষুদ্র হউক—তুচ্ছ হউক, সর্ব্ব-সরম-শঙ্কা-হীন—
কর্ম্ম মোদের ধর্ম্ম বলি', কর্ম্ম করি রাত্রিদিন।

চৌদ্দপুরুষ নিঃস্ব মোদের—বিন্দু তাহে লজ্জা নাই,
কর্ম্ম মোদের রক্ষা করে, অর্ঘ্য সঁপি কর্ম্মে তাই ;
সাধ্য যেমন—শক্তি যেমন—তেম্‌নি অটল চেষ্টাতে—
দুঃখে-সুখে হাস্যমুখে কর্ম্ম করি নিষ্ঠাতে।

কর্ম্মে ক্ষুধায় অন্ন জোগায়, কর্ম্মে দেহে স্বাস্থ্য পাই ;
দুর্ভাবনায় শান্তি আনে—নির্ভাবনায় নিদ্রা যাই ;
তুচ্ছ পরচর্চ্চাগ্লানি—মন্দ ভালো—কোন্‌টা কে—
নিন্দা হ'তে মুক্তি দিয়ে হাল্কা রাখে মনটাকে।

পৃথ্বী-মাতার পুত্র মোরা, মৃত্তিকা তাঁ'র শয্যা তাই,
শষ্পে-তৃণে বাসটি ছাওয়া, দীপ্তি-হাওয়া ভগ্নী-ভাই ;
তৃপ্ত তাঁ'রি শস্যে-জলে ক্ষুৎপিপাসা দুঃসহ,
মুক্ত মাঠে যুক্তকরে বন্দি তাঁ'রেই প্রত্যহ।

পক্ষী প্রাণী, নিত্য জানি, শ্রম বিনা কা'র খাদ্য হয়!
শুদ্ধ মানুষ ভিন্ন—সে কি বিশ্ববিধির বাধ্য নয়?
চেষ্টা ছাড়া অন্ন যে খায়—অন্যে তা'রে বল্‌বে কি
অক্ষমেরও ঘৃণ্য তা'রে গণ্য করা চল্‌বে কি?

ক্ষুদ্র নহি—তুচ্ছ নহি—ব্যর্থ মোরা নই কভু—
অর্থ মোদের দাস্ত করে, অর্থ মোদের নয় প্রভু ;
স্বর্ণ বল’, রৌপ্য বল’—বিত্তে করি জন্মদান,
চিত্ত তবু রিক্ত মোদের নিত্য রহে শক্তিমান্।

কীর্ত্তি মোদের মৃত্তিকাতে প্রত্যহ রয় মুদ্রিত,
শূন্য ’পরে নিত্য হের’ স্তোত্র মোদের উদ্গীত।
সিন্ধুবারি পণ্য বহি’ ধন্য করে তৃপ্তিতে,
বহ্নি মোদের রুদ্রপ্রতাপ ব্যক্ত করে দীপ্তিতে।

বিশ্ব যুড়ি’ সৃষ্টি মোদের, হস্ত মোদের বিশ্বময়,
কাণ্ড মোদের সর্ব্ব ঘটে কোন্‌খানে তা’ দৃশ্য নয় ?
বিশ্বনাথের যজ্ঞশালে কর্ম্মযোগের অন্ত নাই,
কর্ম্ম, সে যে ধর্ম্ম মোদের !—কর্ম্ম চাহি—কর্ম্ম চাই

ঠাট্টা করুক—ব্যঙ্গ করুক লক্ষ্মী-পেঁচার বাচ্ছারা,
পারবেনাক’ করতে মোদের কর্ম্মদেবীর কাছ-ছাড়া ;
শান্তি-ভরা দৃষ্টি যে তাঁ’র জ্বলছে মোদের অন্তরে,
শঙ্কা-সরম ডঙ্কা মেরে’ তুচ্ছ করি মন্তরে !

মাতৃভূমি ! পিতৃপুরুষ ! কর্ম্মে যেন দীক্ষা হয়,
রুদ্রস্বরে গর্জ্জি’ বল’—ভিক্ষা নহে, ভিক্ষা নয় !
হস্ত যখন অঙ্গে আছে, সঙ্গে আছেন শক্তিময়,
কর্ম্ম-ছাড়া অন্য কা’রে করব মোরা ভক্তি ভয় ?

হিমালয়াষ্টক

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

[রবীন্দ্রনাথের পরে কবিতা রচনা করিয়া যাঁহারা যশস্বী হইয়াছেন, ইনি তাঁহাদের অন্যতম। অভিনব বিবিধ ছন্দে রচিত ইঁহার কবিতাবলী রসিকচিত্তকে মুগ্ধ করিয়াছে। ইনি বিখ্যাত সাহিত্যিক অক্ষয়কুমার দত্তের পৌত্র। 'বেণু ও বীণা,' 'কুহু ও কেকা,' 'অভ্র-আবীর,' 'বেলাশেষের গান,' 'হসন্তিকা,' 'তীর্থ-সলিল,' 'তীর্থ-রেণু' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া ইনি বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে প্রভূত যশ অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।]

নম নম হিমালয়!
গিরিরাজ তুমি,—মানচিত্রের মসীর চিহ্ন নয়!
বর্ষা-মেঘের মত গম্ভীর!
দিগ্‌বারণের বিপুল শরীর!
অবাধ বাতাস বাধ্য তোমার, তোমারে সে করে ভয়।
নম নম হিমালয়!

নম নম গিরিরাজ!
অযুত ঝোরার মুক্তা-ঝুরিতে উজ্জ্বল তব সাজ;
সূত্রবিহীন কুসুমের হার
উল্লাসে শোভে উরসে তোমার;
মৃদু-পর্ণিকা করিছে অঙ্গে পত্র-রচনা কাজ!
নম নম গিরিরাজ!

নম মহামহীয়ান্ !
নতশিরে যত গিরি-সামন্ত সম্মান করে দান।
গুহার গূঢ়তা, ভৃগুর ভ্রূকুটি
তোমাতে রয়েছে পাশাপাশি ফুটি' ;
ভীম অর্ব্বুদ ভীষণ তুষার গাহিছে প্রলয় গান !
নম মহামহীয়ান্ !

নম নম গিরিবর !
স্থির-তরঙ্গ-ভঙ্গিমাময় দ্বিতীয় রত্নাকর।
শিখরে শিখরে শিলায় শিলায়,—
চপল-চমরী-পুচ্ছ-লীলায়,—
সাগর-ফেনের মত সাদা মেঘ নাচিছে নিরন্তর।
নম নম গিরিবর !

নম নম হিমবান্ !
মৌনে শুনিছ বিশ্ব-জনের দুঃখ-সুখের গান ;
নিখিল জীবের মঙ্গল-ভার
নিজ মস্তকে বহ অনিবার,
চির-অক্ষয় তুষার তোমার শত চূড়ে শোভমান।
নম নম হিমবান্ !

নম নম ধরাধর !
নাগবেণী আর সরল শালেতে মণ্ডিত কলেবর ;
মেঘ উত্তরী, তুষার কিরীট,
ছত্র আকাশ, ধরা পাদপীঠ ;
তুমি লভিয়াছ মৃত্যু-ভুবনে চির-অমরতা বর !
নম নম ধরাধর !

নম নম হিমাচল !
কত তপস্বী তব আশ্রয়ে পেয়েছে কাব্যফল ;
মোরে দেছ তুমি নব আনন্দ,—
মহামহিমার বিশাল ছন্দ
তোমারে হেরিয়া পরাণ ভরিয়া উছলিছে অবিরল !
নম নম হিমাচল !

অতীত-সাক্ষী নম !
ক্ষুদ্র কবির ক্ষীণ কল্পনা অক্ষম ভাষা ক্ষম ;
বাল্মীকি যা'র বন্দনা গা'ন,
কালিদাস যা'র অন্ত না পান,—
সেই মহিমার ছবি আঁকিবার দুরাশা ক্ষম হে মম ;
বিশ্ব-পূজিত নম !

আমরা

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

মুক্তবেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে,
আমরা বাঙ্গালী—বাস করি সেই তীর্থে—বরদ বঙ্গে ;
বাম হাতে যা'র কমলার ফুল, ডাহিনে মধুক-মালা,
ভালে কাঞ্চন-শৃঙ্গ-মুকুট, কিরণে ভুবন আলা,
কোল-ভরা যা'র কনক-ধান্ত, বুক-ভরা যা'র স্নেহ,
চরণে পদ্ম, অতসী অপরাজিতায় ভূষিত দেহ,
সাগর যাহার বন্দনা রচে শত তরঙ্গ-ভঙ্গে,—
আমরা বাঙ্গালী, বাস করি সেই বাঞ্ছিত-ভূমি বঙ্গে।

বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি,
আমরা হেলায় নাগেরে খেলাই, নাগেরি মাথায় নাচি।
আমাদের সেনা যুদ্ধ ক'রেছে সজ্জিত চতুরঙ্গে,
দশাননজয়ী রামচন্দ্রের প্রপিতামহের সঙ্গে।
আমাদের ছেলে বিজয়সিংহ লঙ্কা করিয়া জয়,
সিংহল নামে রেখে গেছে নিজ শৌর্য্যের পরিচয়।
এক হাতে মোরা মগেরে রুখেছি, মোগলেরে আর হাতে,
চাঁদ-প্রতাপের হুকুমে হঠিতে হয়েছে দিল্লীনাথে।

জ্ঞানের নিধান আদি বিদ্বান্ কপিল সাঙ্খ্যকার—
এই বাঙ্লার মাটিতে গাঁথিল সূত্রে হীরক-হার।

বাঙালী অতীশ লঙ্ঘিল গিরি তুষারে ভয়ঙ্কর,
জালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙালী দীপঙ্কর।
কিশোর বয়সে পক্ষধরের পক্ষ-শাতন করি'
বাঙালীর ছেলে ফিরে এল দেশে যশের মুকুট পরি'
বাঙ্‌লার রবি জয়দেব কবি কান্ত-কোমল পদে
করেছে সুরভি সংস্কৃতের কাঞ্চন-কোকনদে।

স্থপতি মোদের স্থাপনা করেছে 'বরভূধরে'র ভিত্তি,
শ্যাম-কাম্বোজে 'ওঙ্কার-ধাম',—মোদের প্রাচীন কীর্ত্তি।
ধেয়ানের ধনে মূর্ত্তি দিয়েছে আমাদের ভাস্কর—
বিট্‌পাল আর ধীমান,—যাঁদের নাম অবিনশ্বর।
আমাদেরি কোন সুপটু পটুয়া লীলায়িত তূলিকায়
আমাদের পট অক্ষয় ক'রে রেখেছে অজন্তায়।
কীর্ত্তনে আর বাউলের গানে আমরা দিয়েছি খুলি'
মনের গোপনে নিভৃত ভুবনে দ্বার ছিল যতগুলি।

মন্বন্তরে মরিনি আমরা, মারী নিয়ে ঘর করি,
বাঁচিয়া গিয়েছি বিধির আশিষে অমৃতের টীকা পরি'।
দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি, আকাশে প্রদীপ জ্বালি,
আমাদেরি এই কুটিরে দেখেছি মানুষের ঠাকুরালি;
ঘরের ছেলের চক্ষে দেখেছি বিশ্বভূপের ছায়া,
বাঙালীর হিয়া-অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।
বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগৎময়,—
বাঙালীর ছেলে ব্যাঘ্রে বৃষভে ঘটাবে সমন্বয়!

সুখী

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

[কুমুদরঞ্জন মল্লিক আধুনিক সুকবিদের অন্যতম। বর্দ্ধমান জেলায় নূতনহাট পোষ্ট অফিসের অধীন কোগ্রাম ইঁহার জন্মস্থান। 'উজানী,' 'বনতুলসী' প্রভৃতি কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া ইনি যশ অর্জ্জন করিয়াছেন।]

ভাগ্যবন্ত মণ্ডলেরা—লক্ষ্মী বাঁধা ঘরটীতে,
তা'দের কাছে নাইক প্রভেদ আপন এবং পরটীতে।
গোলাতে আর ধান ধরে না, নেয় না ফসল বন্যাতে,
ভবন-ভরা ফুল্ল কমল পুত্র এবং কন্যাতে।
পুষ্ট তা'দের গোধনগুলি, তুষ্ট তা'দের দাসদাসী,
বাগ্দেবী নন বিমুখ, তবু অধিক প্রিয় চাষ-বাস-ই।
শোকের ছায়া কচিৎ পড়ে, পলায় যে রোগ সম্বরে,
শান্তি এবং সুখটা যেন তা'দের নিয়েই ব্যস্ত রে।
গ্রামের গরিব দুঃখীরা সব তাঁহার পরম আত্মীয়,
কেউ বা খুড়া, কেউ বা দাদা, সবাই সুহৃদ, সব প্রিয়।
তীর্থ ভাবেন বাস্ত-ভিটায়, বলেন ক'রে জোর ভারি,
"লক্ষ দ্বিজের চরণ-ধূলা প'ড়েছিল মোর বাড়ী।
যখন দেখি এই মাদুলী সেই রজেতে পূর্ণিত
গর্ব্ব এবং গৌরবে হয় সব দীনতা চূর্ণিত।"

গ্রামে অনেক আত্মীয় তাঁ'র কপট এবং হিংসুটে
অন্তরে তাঁ'র শত্রু চির, পরোক্ষেতে রয় ফুটে'।
নিত্য ভাবে রাত্রি ধ'রে, "চঞ্চলা কয় লক্ষ্মীরে,
ওই বাড়ীতে অচল যেন, ত্যজে' পেচক পক্ষীরে!
সুখের উপর সুখ দিতে যান দুখীর কেহ নন হরি,
পুষ্প-ভরা ওদের তরু, আমার শুকায় মঞ্জরী।
বিধিরে হায় দেখতে পেলে বারেক তাঁ'রে জিজ্ঞাসি,
কেমনতর বিধান তাঁহার, বিচার তাঁহার কোন্-দেশী।"

রাতের আঁধার যায় নি তখন—একটী দিবস প্রত্যুষে,
রক্তবরণ সন্ন্যাসী এক স্বপ্নে তাঁ'রে কন রুষে',—
"বুঝ্‌বি কি তুই এই ভবনের গৃহস্বামীর পুণ্য রে,
হিংসা ক'রে, হায় পাতকী, হস বা কেন ক্ষুন্ন রে।
শৈশবে সে ক্ষুদ্র কীটও চরণ দিয়ে দ'ল্‌তো না,
কার'ও প্রতি কঠোর কঠিন ভীতির বাণী ব'ল্‌তো না।
কর্দ্দমেতে মগ্নপদ ভ্রমরটীরে প্রাণ দিত,
বৎসে এনে গাভীর কাছে ক'র্‌তো তা'রে নন্দিত।
লতার ছোট পত্রটীও তুল্‌ত না সে হস্তেতে,
শীতার্ত্ত হায় কুকুর বিড়াল আচ্ছাদিত বস্ত্রেতে।
কৌতুকেও ক'র্‌ত না সে বালককেও শঙ্কিত,
চিহ্নটীও তরুর গায়ে ক'র্‌ত নাক' অঙ্কিত।
ক্ষুদ্র তাহার গোপন দানের জান্‌তো খবর ঈশ্বর-ই,
মত্ত হ'ত হরির নামে সকল বেদন বিস্মরি'।

নিজের দুখও ভুল্‌তো সে যে দুখীর দুখ-চিন্তাতে,
বিমুখ ছিল যাবৎ-জীবন হিংসা পরনিন্দাতে।
দুঃখ সে যে দেয়নি কারে, দুঃখ পাবে কা'র লাগি',
বৃথায় তাহার হিংসা ক'রে হস্‌নি ভীষণ পাপভাগী।
দুর্ব্বলেরি বন্ধু যে জন, জীবকে যাহার যত্ন রে,
আন্‌বে কুবের মাথায় ব'বে তাহার লাগি রত্ন রে।
রক্ষী তাহার মধুসূদন, লক্ষ্মী তাহার ভাণ্ডারী,
লগ্ন ঘাটে মুক্তি-তরী, স্বয়ং হরি কাণ্ডারী।"

মানুষ

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

[১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়া জেলার হরিপুর গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। 'মরীচিকা,' 'মরুশিখা,' 'মরুমায়া,' 'কাব্য-পরিমিতি' প্রভৃতি পুস্তক রচনা করিয়া ইনি খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।]

১

পাঁচনি লইয়া গরুর পালের পিছনে যা'রা
চলেছে দূরের মাঠে,
ছিন্ন বসন, নিবারিতে ঘন শ্রাবণধারা
মাথায় নাহিক আঁটে;

গাভীর পুচ্ছ ধরি' যা'রা তরে বর্ষানদী,
জুটে না পারের কড়ি,
হারা-বাছুরের সন্ধানে ফেরে সন্ধ্যাবধি,
কাদায় কাঁটায় পড়ি';

ক্ষুধার অন্ন, পরনের বাস, বাসের গেহ,
তা'দের যদি না মেলে,
ঘৃণা কি করুণা কোরো না তা'দের, কর গো স্নেহ,
তা'রা মানুষেরই ছেলে!

২

জ্যৈষ্ঠ দুপুরে গলদ্‌ঘর্ম্ম, বলদ লয়ে
চষে যাঁ'রা রাঙা মাটি,
কত না ঝঞ্ঝা মুষলের ধারা মাথায় ব'য়ে
ক্ষেত করে পরিপাটি ;

আশা যার ভাসে আকাশে আকাশে মেঘের বুকে
ধরণী-গর্ভে ধন ;
বোকামি পড়ে না শঠতায় ঢাকা যা'দের মুখে,
ধূলা-কাদা আভরণ ;

অট্টালিকার উপায় থাকিতে নানান্তর,
যা'র চালা ঘুচে নাই,
ঘৃণা কি করুণা কোরো না তা'দের, শ্রদ্ধা কর,
তা'রা মানুষেরই ভাই।

৩

শোভন করিয়া ঢাকিবে আপন লজ্জাটুক্‌,
জুটে নাই হেন বাস ;
তা'রি খুঁটে যা'রা পিছে ছেলে বেঁধে' রক্তমুখ,
তুলিছে মাটির রাশ ;

যা'র নিরুপায় রূপের শিলায় নিয়ত ঝরে
ঘর্ম্মের নির্ঝর,
সহ্য-অদ্রি সমান যে সহে বক্ষ 'পরে
লক্ষ দুঃখ ঝড় ;

মাঝপথে যা'র শিরে নিজ বোঝা দিতেছে পতি,
থাক্ বা না থাক্ শ্রী,
লাঞ্ছনা ঘৃণা কোরো না তা'দের, কর গো নতি,
তা'রা মানুষেরই স্ত্রী!

৪

নির্ব্বোধ যা'রা, দুর্ব্বোধ যা'রা পল্লীপারে
অক্ষম যা'র ভাষা ;
আশী শতাব্দী ধরিয়া যা'দের দৈন্য বাড়ে,
চির-নাবালক চাষা ;

হলের ফলকে লক্ষ্মী উঠিলে, করিয়া দান
লক্ষ্মীমানের ঘরে,
দুর্ভিক্ষের ভিক্ষার ঝুলি ভরিয়া, প্রাণ
দেয় যা'রা নিজ করে ;

বেতসের মত সভ্য শিক্ষা শেখেনি যা'রা,
হাওয়ার নেশায় মাতি' ;
বটের মত খোলা মাঠে আজও রয়েছে খাড়া,
তা'রা মানুষেরই জাতি!

ছাত্রধারা

কালিদাস রায়

[ইনি ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলার প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-তীর্থ শ্রীখণ্ডের নিকটবর্ত্তী বড়ুই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 'পর্ণপুট,' 'ব্রজবেণু', 'বৈকালী,' 'হৈমন্তী,' 'ঋতু-মঙ্গল' প্রভৃতি কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ লিখিয়া ইনি যশস্বী হইয়াছেন। ইনি বর্ত্তমান কালের শক্তিশালী কবিগনের অন্যতম।]

বর্ষে বর্ষে দলে দলে আসে বিদ্যামঠ-তলে
চ'লে যায় তা'রা কলরবে,
কৈশোরের কিশলয় পর্ণে পরিণত হয়
যৌবনের শ্যামল গৌরবে।

ভালবাসি, কাছে ডাকি, নামও সব জেনে রাখি,
দেখাশোনা হয় নিতি নিতি,
শাসন-তর্জ্জন করি, শিখাই প্রহর ধরি',
থাকেনাক', হায়, কোন স্মৃতি।

ক' দিনের এই দেখা? সাগর-সৈকতে রেখা
নূতন তরঙ্গে মুছে যায়।
ছোট ছোট দাগ গা'র ঘুচে' হয় একাকার,
নব নব পদ-তাড়নায়।

জানে না কে কোথা যাবে, জোটে হেথা, নাহি ভাবে;
পাঠশালা,—যেন পান্থশালা,
দু' দিন একত্রে মাতে মেলে মেশে, ব'সে গাঁথে
নীতি-হার আর কথামালা।

রাজপথে দেখা হ'লে বেহ যদি গুরু ব'লে
হাত তুলে' করে নমস্কার,
বলি তবে হাসি-মুখে,— "বেঁচে থাক, রও সুখে,
কি করিছ কাজ-কারবার ?"

ভাবিতে ভাবিতে যাই— কি নাম ? মনে ত নাই,
ছাত্র ছিল কতদিন আগে ;
দেখি স্মৃতি ধরি' টানি', কৈশোরের মুখখানি
মনে মোর জাগে কি না জাগে।

ঘন ঘন আনাগোনা কতদিন দেখা-শোনা
তবু কেন মনে নাহি থাকে ?
'ব্যক্তি' ডুবে যায় 'দলে', মালিকা পরিলে গলে
প্রতি ফুলে কে বা মনে রাখে ?

এ জীবনে ভেঙে গ'ড়ে শ্যামল সরস ক'রে
ছাত্রধারা ব'হে চ'লে যায়,
ফেনিলতা উচ্ছলতা হ'য়ে যায় তুচ্ছ কথা,
কলরব সকলি মিলায়।

স্বচ্ছতায় শুধু হেরি আমার জীবন ঘেরি'
জাগে শুধু ম্লান মুখগুলি ;
কলহাস্য মহোৎসব আর ভুলে' যাই সব,
ম্লান মুখ কখনো না ভুলি।

কেহ বা ক্ষুধায় ম্লান, কেহ রোগে' ম্রিয়মাণ,
শ্রমে কা'রো চাহনি করুণ,
কেহ বা বেত্রের ডরে বন্দী হ'য়ে রয় ঘরে,
নেত্র কা'রো তন্দ্রায় অরুণ।

কেহ বা জানালা-পাশে চে'য়ে রয় নীলাকাশে
যেন বদ্ধ পিঞ্জরের পাখী,
আকাশে হেরিয়া ঘুড়ি মন তা'র যায় উড়ি',
বিষাদের ছায়াখানি রাখি'।

স্মরিয়া খেলার মাঠ কেউ ভুলে যায় পাঠ,
বুদ্ধিতে বা কা'রো না কুলায়,
কেহ স্মরে গেহ-কোণ, স্নেহ-ভরা ভাই বোন,—
ঘড়ি পানে ঘন ঘন চায়।

ডাকিছে উদার বায়ু, ল'য়ে স্বাস্থ্য ল'য়ে আয়ু,
ডাক শোনে ব'সে রুদ্ধ ঘরে,
হাতে মসী মুখে মসী, মেঘে ঢাকা শিশু-শশী—
প্রতিবিম্বে মোর স্মৃতি ভরে।

আর সবি গেছি ভুলি' ভুলিনি এ মুখগুলি;
একবার মুদিলে নয়ন,
আঁখিপাতা ভারি-ভারি, ম্লান মুখ সারি সারি
আকুল করিয়া তোলে মন।

গৌতমের গৃহত্যাগ

প্যারীমোহন সেনগুপ্ত

[১৩০০ সালে (১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে) হুগলী জেলায় গোপীনাথপুর গ্রামে প্যারীমোহনের জন্ম হয়। ইনি প্রথমে এক সরকারী আফিসে কর্ম্মজীবন আরম্ভ করেন, এবং পরে "প্রবাসী" পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের কার্য্য গ্রহণ করেন। বর্ত্তমানে ইনি বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক। 'অগ্রাণমা,' 'বেদবাণী,' 'মেঘদূত,' 'কোজাগরী' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ ইঁহার রচিত।]

"এই তো রাত্তি, এই অবসর",—তারায় চাঁদে বল্‌ছে মোরে—
"বেরিয়ে পড়, বেরিয়ে পড়, আর কি সুযোগ পাবি ওরে ?
হয় মিশে থাক্ মিথ্যা মায়ায়, ঘরের প্রেমে থাক্ রে মিশি' ;
নয় চ'লে আয় জগৎ-বুকে, এই তো সুযোগ, নীরব নিশি !
হেথায় মুকুট, স্বর্ণ-আসন—হোথায় ধূলি কাঁকর-ভরা ;
হেথায় বিলাস, নর্ত্তকী-গান—হোথায় রোদে পুড়্‌ছে ধরা ;
হেথায় স্নেহ-শীতল গেহ—হোথায় মানুষ জল্‌ছে তাপে ;
হেথায় সেবা ব্যগ্র অশেষ—হোথায় দুখে দল্‌ছে দাপে ;—
কোন্‌টা নিবি, কোন্‌টা নিবি ?"—তারায় তারায় যে জিজ্ঞাসে—
"হবি রাজা, না ভিখারী ?"—দাঁড়াব, ভাই, সবার পাশে !
দুর্ব্বলেরে বল দেব রে, দুখীর হব সুখের কামী ;
মুছিয়ে শোণিত দান্‌ব অভয় আমি, আমি, এই এ আমি।
রাজ-আভরণ নয়ক' আমার, ছেঁড়া কাপড় অঙ্গভূষণ ;
শয্যা কোমল বিধ্‌ছে গায়ে, ধরার ধূলি আমার শ[illegible]।'

রাজপ্রাসাদের শীতল ছায়ায় আমার নিবাস নয় রে নহে ;
পথের পাশে, রোদের তাপে, গাছের তলায় নিবাস রহে।
রাজার শাসন, বিধির শাসন, পুরোহিতের শাসন যত—
মুছ্‌ব আমি সকল শাসন, মুছ্‌ব আমি সকল ক্ষত।
ঐ আসে রে, ঐ আসে রে, ঐ যে শুনি কাতর ধ্বনি,—
পুত্রহারা কাঁদছে শোকে হারিয়ে তাহার বুকের মণি।
যাই চ'লে যাই, যাই চ'লে যাই, যাচ্ছি আমি, শোন শোন,—
দুঃখী ওগো, ব্যথিত ওগো, আর ভাবনা নাইকো কোন।
পাওনি প্রীতি ? পাওনি দয়া ? আমি সবায় প্রেম বিলাব,
প্রেমের আলোয় প্রেমের সুধায় দুখ মুছাব, শোক তাড়াব।
ব্যথায় দেব দরদ-মধু, বিপদ হ'তে আন্‌ব পথে,
মুক্তিবাণী শুনিয়ে দেব,—বাঁচ্‌বে মানুষ শঙ্কা হ'তে।

ঘর হ'তে সে বেরিয়ে এল, চাইল আবার আকাশ পানে ;
জগৎ তারে ডাক দিয়েছে ব্যথার টানে, প্রেমের টানে।

রাখী-ভাই

গোলাম মোস্তফা

[১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে যশোহর জেলার অন্তর্গত মনোহরপুর গ্রামে গোলাম মুস্তাফা জন্মগ্রহণ করেন। ইনি আধুনিক যুগের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি। ইঁহার 'রক্তরাগ,' 'খোশ্‌রোজ,' 'হাস্নাহেনা,' 'সাহারা,' 'কাব্য-কাহিনী' প্রভৃতি গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত। ইনি শিক্ষা-বিভাগের কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন।]

বাহাদুর শাহ্ আস্‌ছে ধেয়ে ক'র্‌তে চিতোর জয়
সঙ্গে নিয়ে বিপুল সেনাদল,
চিতোর-রাণী কর্ণবতীর তাই জেগেছে ভয়—
রাজপুতানা আতঙ্কে টল্‌মল্।

কে আছে বীর এই ভারতে এমন মহৎপ্রাণ
চিতোরের এই দুর্দ্দিন-সন্ধ্যায়
পার্শ্বে এসে দাঁড়ায় তাহার, রাখ্‌তে তাহার মান—
ব্যাকুল রাণী সেই সে ভাবনায়।

হঠাৎ তাহার পড়্‌ল মনে—বাদ্‌শা হুমায়ুন
উদার-হৃদয় অদ্বিতীয় বীর,
বাহাদুরের চেয়ে তাহার শক্তি শতগুণ,
রাখ্‌তে জানে মান সে রমণীর।

অনেক ভেবে অবশেষে হুমায়ুনের ঠাঁই
লিখ্‌ল রাণী লিপি সে একখান—
"আজ হ'তে বীর হ'লে তুমি আমার 'রাখী-ভাই',
শীঘ্র এসে বাঁচাও বোনের প্রাণ!"

দূতের হাতে দিল লিপি, আর সে রাখী তার—
যাত্রাপথে বাহির হ'ল দূত,
উৎসাহ্ ও কৌতূহলের অন্ত নাহি আর—
অবাক সবাই, ব্যাপার যে অদ্ভুত!

বাদ্‌শা তখন বাংলাদেশে ছিলেন অনেক দূর
শেরের সাথে চল্‌ছে লড়াই তাঁ'র,
পাঠান-বীরের দর্প এবার না যদি হয় চুর
রাজ্য রাখাই হবে তাঁহার ভার!

এম্‌নি কঠিন দুঃসময়ে কর্ণবতীর দূত
হাজির হ'ল হুমায়ুনের পাশ,
লিপি দিল, আর দিল সেই রাঙা রাখীর সূত,
মুখে তাহার আনন্দ উচ্ছ্বাস!

লিপি পেয়ে আত্মহারা হুমায়ুনের প্রাণ,
কী করিবে, ভেবেই নাহি পায়:—
শত্রুরে আজ ছেড়ে গেলেও চরম অকল্যাণ—
কিরূপে বা রাখীই ফিরান যায়!

একটী নারী দুর্দ্দিনে আজ মাগ্‌ছে শরণ তা'র—
'ভাই' ব'লে সে করেছে আহ্বান,
সে আহ্বানে খুল্‌বে নাকি তাহার হৃদয়-দ্বার—
সাড়া কি আজ দিবে না তা'র প্রাণ!

থাকুক শত বিঘ্ন-বাধা—বাদশাহী তা'র যাক,
তবু তাহার 'বোন'কে বাঁচান চাই;
হোক বাহাদুর স্বজাতি তা'র—হিন্দু 'বোনে'র ডাক
শুন্‌বে আজি মুস্‌লিম তা'র 'ভাই'।

ক্ষান্ত করি' এক নিমেষেই যুদ্ধ-অভিযান
চিতোর পানে ছুটল হুমায়ুন;—
কোন্ অসীমের ডাক শুনে আজ চঞ্চল তা'র প্রাণ!
একটী রাঙা রাখীর এত গুণ!

লোক-লস্কর সঙ্গে নিয়ে লড়্‌ল এসে বীর—
কামান-গোলা ছুট্‌ল সে প্রচুর,
পড়্‌ল লুটে হাজার হাজার মুসলমানের শির,
বাহাদুরের দর্প হ'ল চুর!

চিতোর-ভূমি মুক্ত হ'ল, অম্‌নি হুমায়ুন
চল্‌ল ছুটে বোনের খোঁজে তা'র,
রাজপুরীতে উঠ্‌ল বেজে সুর সে অকরুণ—
কর্ণবতী নাইক' বেঁচে আর!

ব্যাকুল আশায় চেয়ে চেয়ে হুমায়ুনের পথ
কর্ণবতী গণ্‌ছিল দিনরাত,
অবশেষে ভাব্‌ল যখন বিফল মনোরথ—
জহর-ব্রতে ক'র্‌ল জীবন-পাত!

গভীর ব্যথায় হুমায়ুনের প্রাণ সহে না আর—
বোনের তরে ভাই কেঁদে আজ খুন,
এই জীবনে হ'ল নাক' দেখা দু'জনার—
সেই বেদনায় ক্ষুব্ধ হুমায়ুন!

পিতা স্বর্গ

কিরণধন চট্টোপাধ্যায়

[ইনি উত্তরপাড়া কলেজে অধ্যাপক ছিলেন। নূতন খাতা' নামক একখানি মাত্র কবিতাপুস্তক লিখিয়াই ইনি যশস্বী হইয়াছেন।]

নীল আকাশের কোন্‌খানে, ঐ নীল আকাশের কোন্‌কোণে,
পরীরা সব ক'রছে খেলা পারিজাতের ফুলবনে ?
মিথ্যা অলীক কল্পনা—
কামধেনু আর কল্পলতার গল্পেতে আর টল্‌ব না।
তুমিই আমার স্বর্গ, পিতা,—তুমিই আমার দেব্‌তা গো !
দাও চরণের পুণ্য-ধূলি—আশিস্‌ তোমার—মহার্ঘ।

হোম আরতি, ঘিয়ের বাতি, তপ্‌-তপস্যার আড়ম্বর,
জপ্‌ব না নাম, ন্যাস প্রাণায়াম করবনাক' অতঃপর।
কাজ কি মিছা জঞ্জালে,
কি হবে মোর চক্ষু বুজে' আসন পেতে বাঘছালে ?
তুমিই আমার তপ্‌-তপস্যা, তুমিই আমার দেব্‌তা গো !
দাও চরণের পুণ্য-ধূলি—আশিস্‌ তোমার—মহার্ঘ।

তোমার অতল স্নেহশীতল পরশখানি মোর প্রাণে
বুলিয়ে দেয় শান্তি-সুখের কোন্‌ অমৃত কে জানে !
মনে ভাবি সর্ব্বদা—
তোমার স্নেহের অনন্ত ঋণ—কি ক'রে শোধ ক'র্‌ব তা !
তুমিই আমার ধর্ম্ম, পিতা—তুমিই স্বর্গ—দেব্‌তা গো !
দাও চরণের পুণ্য-ধূলি—মহৎ সে দান—মহার্ঘ।

মায়া-মুকুর

কাজি নজরুল ইসলাম

[১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বর্দ্ধমানের চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বিগত (১৯১৪-১৮) মহাসমরের সময়ে ইনি বাঙ্গালী পল্টনে যোগদান করিয়াছিলেন। ইনি 'অগ্নিবীণা,' 'দোলন-চাঁপা,' 'সঞ্চিতা,' 'ছায়ানট,' 'ভাঙ্গার গান,' 'বিষের বাঁশী,' 'চিত্ত-নামা,' 'সিন্ধু-হিন্দোল,' 'সর্ব্বহারা,' 'নজরুল-গীতিকা,' 'দেওয়ান-ই-হাফিজ' প্রভৃতি কাব্য রচনা করিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। সঙ্গীত-রচনাতেও ইঁহার বিশেষ খ্যাতি আছে।]

তোমার মনের মায়া-মুকুরে কি দেখেছ নিজের মুখ,
যে মায়া-মুকুরে নিজেরে দেখিতে এ বিশ্ব উৎসুক।
জ্ঞানী বিজ্ঞানী যোগী মুনি ঋষি তাপস দার্শনিক
চেয়ে আছে ঐ মায়া-মুকুরের পানে ধ্যান-অনিমিখ্।
আপনার মুখ দেখিতে চাহিয়া কাহারে তাহারে দেখে'
সৃষ্টির আদি প্রভাত হইতে সেই কথা তা'রা লেখে
তোমরা ভাবিছ,—আমরা বালক অথবা বালিকা কেহ,
আমি বলি—কেহ দেখনি আজিও তোমরা নিজের দেহ।
তোমাদের মন-মায়া-দর্পণে দেখ যদি নিজ কায়া,
দেখিবে তোমারই ঐ দেহে আছে সারা বিশ্বের ছায়া।
তুমি ছোট নহ, ঐ সে ক্ষুদ্র দেহখানি তুমি নও,
নিজেরে দেখিলে—দেখিবে, তুমিই বিপুল বিরাট্ হও।
তুমি হ'তে পার কৃষ্ণ, বুদ্ধ, রামানুজ, শঙ্কর,
প্রতাপাদিত্য, শিবাজি, সিরাজ, রাণা-প্রতাপ, আকবর।

ভগবানের যে অসীম শক্তি তোমাতে তাহা বিরাজে,
বুঝিবে, তোমার স্বরূপ দেখিলে মায়া-মুকুরের মাঝে।
আপনারে কভু ভেবোনা ক্ষুদ্র, ভাবিও না দীন তুমি,
তুমি নিতে পারো জয় করিয়া এ বিপুল বিশ্বভূমি।
তুমিই সর্ব্ব-শক্তি লভিয়া পূর্ণ হইতে পারো,
"আমি ছোট" এই ভাবো নিশিদিন, তাই সব কাজে হারো।
দারোগা কেরাণী হবার ক্ষুদ্র সাধনা তোমার নহে,
তুমি অমৃতের পুত্র অজেয়, নিজে ভগবান্ কহে।
বল ভগবানে, তুমি হ'তে চাও সর্ব্ব-শক্তিমান্,
তুমি অনন্ত যশঃ খ্যাতি চাহ, চাহ অনন্ত প্রাণ।

আমার মনের মায়া-দর্পণে তোমাদেরে দেখিয়াছি,
দেখেছি সেখানে কত যে পার্থ-সারথি সব্যসাচী!
অনাগত মহা-ভারতের কুরু-ক্ষেত্রে তোমরা সবে
ধর্ম্মরাজ্য আনিতে আবার যেতেছ মহা-আহবে।
শোনো, শোনো! মোর সত্য এ বাণী, স্বপন দেখিনি আমি—
সূর্য্য যেমন সত্য, তেমনি দেখি আমি দিবা-যামী—
তোমাদেরই মাঝে আসিছে কল্কি, কত সে যুগাবতার,
তোমরা ভাঙিয়া সব জাতি-ভেদ করিতেছ একাকার!
অন্ন-বস্ত্র দিতেছ তোমরা ক্ষুধাতুর জনগণে,
হনন করিছ হিংস্র পশু আছে যা মানব-মনে!
কেহ মহর্ষি হইতেছ জ্ঞানে, কেহ গলাতেছ প্রেমে,
কেহ বা বিপুল কর্ম্ম-শক্তি লইয়া আসিছ নেমে।

চাকরী করিতে লভনি জনম ; তোমরা দেবতা সবে,
দিব্যশক্তি ভগবদ্-জ্যোতিঃ এই মানুষেই লভে।
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, যাহা সাধ—তুমি তাই হ'তে পারো,
ক্ষুদ্রের মাঝে থাকো তুমি, তাই বৃহতের সাথে হারো !
ভাঙো ভাঙো এই ক্ষুদ্র গণ্ডী, এই অজ্ঞান ভোলো,
তোমাতে জাগেন যে মহামানব, তাহারে জাগায়ে তোলো !
তুমি নহ শিশু দুর্ব্বল, তুমি মহতো মহীয়ান্ !
জাগো দুর্ব্বার, বিপুল, বিরাট্, অমৃতের সন্তান !

পল্লী-জননী

জসীম উদ্‌দীন

[গ্রাম্য কৃষক-জীবনের কথা কবিতায় লিখিয়া ইনি সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। ইঁহার বাড়ী ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত গোবিন্দপুর গ্রামে। ইঁহার রচিত 'নক্‌সী কাঁথার মাঠ,' 'রাখালী,' 'বালুচর,' 'সোজন বাদীয়ার ঘাট,' 'ধানক্ষেত,' 'রঙীলা নায়ের মাঝি' প্রভৃতি পুস্তক পাঠক-সমাজে বিশেষ আদৃত হইয়াছে।]

রাত থম্‌থম্ স্তব্ধ নিঝুম, ঘোর-ঘোর আন্ধার,
নিঃশ্বাস ফেলি, তাও শোনা যায়—নাই কোথা সাড়া কা'র।
রুগ্‌ণ ছেলের শিয়রে বসিয়া একেলা জাগিছে মাতা,
করুণ চাহনি ঘুম্-ঘুম্ যেন ঢুলিছে চোখের পাতা।
শিয়রের কাছে নিবু-নিবু দীপ ঘুরিয়া ঘুরিয়া জ্বলে,
তা'রি সাথে সাথে বিরহী মায়ের একলা পরাণ দোলে।

ভন্ ভন্ ভন্ জমাট বেঁধেছে বুনো মশকের গান,
এঁদো ডোবা হ'তে বহিছে কঠোর পচান' পাতার ঘ্রাণ।
ছোট কুঁড়ে ঘর, বেড়ার ফাঁকেতে আসিছে শীতের বায়ু,
শিয়রে বসিয়া মনে মনে মাতা গণিছে ছেলের আয়ু।

ছেলে কয়, "মা রে! কত রাত আছে, কখন সকাল হবে,
ভাল যে লাগে না, এমনি করিয়া কেবা শুয়ে থাকে কবে?"

মা কয়, "বাছা রে ! চুপটি করিয়া ঘুমো ত একটি বার" ;
ছেলে রেগে কয়, "ঘুম যে আসে না, কি করিব আমি তা'র ?"
পাণ্ডুর গালে চুমো খায় মাতা, সারা গায়ে দেয় হাত,
পারে যদি বুকে যত স্নেহ আছে ঢেলে দেয় তা'রি সাথ।
নামাজের ঘরে মোমবাতী মানে, দরগায় মানে দান,—
ছেলেরে তাহার ভাল ক'রে দাও—কাঁদে জননীর প্রাণ।
ভাল ক'রে দাও আল্লা রসুল, ভাল ক'রে দাও পীর,—
কহিতে কহিতে মুখখানি ভাসে বহিয়া নয়ন নীর !

বাঁশ বনে বসি' ডাকে কানা কুয়ো, রাতের আঁধার ঠেলি',
বাদুড় পাখার বাতাসেতে পড়ে সুপারীর বন হেলি'।
চলে বুনো পথে জোনাকী মেয়েরা কুয়াসা কাফন ধরি',
দুঃ ছাই ! কিবা শঙ্কায় মা'র পরাণ উঠিছে ভরি' !
যে কথা ভাবিতে পরাণ শিহরে তাই ভাসে হিয়া কোণে,
বালাই বালাই, ভাল হবে যাদু মনে মনে জাল বোনে।
ছেলে কয়, "মা গো ! পায়ে পড়ি বল, ভাল যদি হই কাল,
করিমের সাথে খেলিবার গেলে দিবে না ত তুমি গাল।
আচ্ছা মা বল, এমন হয় না, রহিম চাচার ঝাড়া
এখনি আমারে এত রোগ হ'তে করিতে পারে ত খাড়া ?"
মা কেবল বসি' রুগ্ণ ছেলের মুখপানে আঁখি মেলে',
ভাসা ভাসা তার যত কথা যেন সারা প্রাণ দিয়ে গেলে।
"শোন মা, আমার লাটাই কিন্তু রাখিও যতন ক'রে,
রাখিও ঢ্যাপের মোয়া বেঁধে তুমি সাত-নরী সিকা ভ'রে।

খেজুরে গুড়ের নয়া পাটালিতে হুড়ুমের কোলা ভ'রে,
ফুলঝুরি সিকা সাজাইয়া রেখ' আমার সমুখ 'পরে।"
ছেলে চুপ করে মা-ও ধীরে ধীরে মাথায় বুলায় হাত,
বাহিরেতে নাচে জোনাকী আলোয় থম্-থম্ কাল রাত।
রুগ্ণ ছেলের শিয়রে বসিয়া কত কথা পড়ে মনে,
কোন্ দিন সে যে মায়েরে না ব'লে গিয়াছিল দূর বনে।
সাঁঝ হোয়ে গেল তবু আসে নাক ',আইচাই মা'র প্রাণ,
হঠাৎ শুনিল আসিতেছে ছেলে হর্ষে করিয়া গান।
এক কোঁচ ভরা বেথুল তাহার ঝামুর ঝুমুর বাজে,
"ওরে মুখপোড়া, কোথা গিয়াছিলি এমনি এ কালি সাঁঝে ?"

কত কথা আজ মনে পড়ে মা'র—গরীবের ঘর তা'র,
ছোট খাট কত বায়না ছেলের পারে নাই মিটাবার।
আড়ঙের দিনে পুতুল কিনিতে পয়সা জোটেনি, তাই
বলেছে, আমরা মোসলমানের আড়ঙ দেখিতে নাই।
করিম সে গেল ? আজিজ চলিল ? এমনি প্রশ্ন-মালা ;
উত্তর দিতে দুখিনী মায়ের দ্বিগুণ বাড়িত জ্বালা।
আজও রোগে তার পথ্য জোটেনি, ওষুধ হয়নি আনা,
ঝড়ে কাঁপে যেন নীড়ের পাখীটি জড়ায়ে মায়ের ডানা।
ঘরের চালেতে ধুতুম ডাকিছে, অকল্যাণ এ সুর,
মরণের দূত এল বুঝি হায়! হাঁকে মায়,—দূর-দূর।
পচা ডোবা হ'তে বিরহিনী ডাক ডাকিতেছে ঝুরি ঝুরি,
কৃষাণ ছেলেরা কাল্কে তাহার বাচ্চা করেছে চুরি

ফেরে ভন্‌ভন্‌ মশা দলে দলে, বুড়ো পাতা ঝরে বনে,
ফোঁটায় ফোঁটায় পাতা-চোয়া জল ঝরিছে তাহার সনে।
রুগ্‌ণ ছেলের শিয়রে বসিয়া একেলা জাগিছে মাতা,
সম্মুখে তা'র ঘোর কুজ্ঝটি মহাকাল রাত পাতা।
পার্শ্বে জ্বলিয়া মাটির প্রদীপ বাতাসে জমায় খেল;
আঁধারের সাথে যুঝিয়া তাহার ফুরায়ে এসেছে তেল!

ভিখারিণী

অপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

[অপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ২৪-পরগনা গৈপুর গ্রামে ১৩১১ সালে (১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে) জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার রচিত বহু কবিতা বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত হইয়াছে, এবং 'মধুচ্ছন্দা,' 'নীরাজন,' 'সারস্বতী' প্রভৃতি কবিতাগ্রন্থ সাহিত্য-সমাজে সমাদর লাভ করিয়াছে।]

অস্ত-রবির ছায়াপথ বাহি' নেমেছে তখন সন্ধ্যা,
সেজেছে নগরী নটিনীর মত, ফুটেছে রজনীগন্ধা,
গন্ধ-মদির দখিনা পবনে
দিগ্‌বধূদল হাসিছে স্বপনে,
জ্বলিতেছে দীপ পৌর-ভবনে,
অভিসারে নিশি মত্তা।
নদীর লহরে চাঁদের কিরণ
হারায়েছে তার সত্তা।

বিপাশার কূল মুখর করিয়া নূপুরের মধু-ছন্দে।
মন্দির হ'তে ফিরিছে 'চন্দ্রা' রাজবালা মহানন্দে।
অদূরের পথ-তরু-শাখা পরে'
গাহিছে কোকিল পঞ্চম-স্বরে,
অজানা ফুলের গন্ধ বিহরে
বিরহের স্মৃতি পাসরি।
দূর-মন্দিরে রহিয়া রহিয়া
বাজে উৎসব-বাঁশরী।

রূপ-গরবিনী রাজার দুলালী রতন পরেছে অঙ্গে,
নানা আভরণ মণিমুকুতায় ঝলমল করে রঙ্গে।
সেই পথ দিয়া চলিয়াছে 'সোনা,'
পঞ্জর তার যায় সব গোণা,
জীর্ণ-বসনা, মলিন-আননা
বহিছে বেদনা গোপনে,
অন্তরে তার হয় ত' বাসনা
জাগিয়া ঘুমায় স্বপনে।

চলিয়াছে সে যে মন্দির পানে মাটীর থালাটি ধরিয়া,
পূজার অর্ঘ্য লইয়াছে করে শুষ্ক কুসুম ভরিয়া,
আষাঢ়-মেঘের সম মন্থর
দেবালয়ে যেতে চাহে সত্বর,
অন্তরে তার জপ-মন্তর
হয় ত মূর্ত্ত সহসা!
ক্ষণিক পুলকে হয় ত' থেমেছে
তাহারি দুখের বরষা।

"ধূলিমাখা এই ঝরা ফুলগুলি সাজায়ে মাটীর থালাতে,
দিতে যাও পূজা দেবালয়ে কেন এমনি সাঁঝের বেলাতে?
সোনার পাত্রে ফুল রাখ নাই,
দেবতা-চরণে নাহি তার ঠাঁই,
এ সব হেরিয়া বড় লাজ পাই—
পূজাটি হবে গো বিফলে!
শুদ্ধ নহেক মাটীর থালাও—
শোন নাই বলে সকলে?

80—1840 B.T.

মৌন-নীরব 'সোনা' পথ চলে সর্ব্বহারা সে ললনা,
রাজনন্দিনী কহিছে—"গরবী কথাটি আমার নিল না!"
একটি করুণ সজল নয়ন
প্রাঙ্গণ-পথে বেদনা-মগন
একটি জীবন-কুসুম কখন
ব্যর্থ হয়েছে হতাশে,
প্রথম তারার করুণ-গীতিকা
উঠিছে দখিনা-বাতাসে।

পরদিন প্রাতে রাজনন্দিনী অদ্ভুত হেরে চক্ষে,
ভিখারী 'সোনা'র পূজাসম্ভার রয়েছে প্রভুর বক্ষে!
তার ফুল রহে ধূলি 'পরে হায়!
পূজারী তাহারে কেবলি বুঝায়—
"আমি ত কুসুম দিয়েছি পূজায়···!"
শোনে না রাজার দুলালী,—
অবশেষে কহে—"ভিখারিণী, হায়!
কেমনে প্রভুরে ভুলালি?"

আকবর

হুমায়ুন কবীর

[১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি এখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক। 'পদ্মা' নামক কাব্য রচনা করিয়া ইনি খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় ইঁহার কবিতা ও প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়। ইঁহার রচিত 'সাথী' ও 'স্বপ্ন-সাধ' নামক দুইখানি পদ্য-গ্রন্থ সাহিত্য-সমাজে আদৃত হইয়াছে।]

১

হে সম্রাট্, ব'সে আছি আজি তব সমাধির পাশে
একান্ত বিজন,
দূর হ'তে অরণ্যের অন্ধকার হ'তে ভেসে আসে
বিহগ কূজন
নীরব মধ্যাহ্ন বেলা, শব্দহীন নিঃসাড় ভুবন,
কেহ কোথা নাই ;
অকস্মাৎ মর্ম্মরিলে তরুশাখে মন্থর পবন,
চমকিয়া চাই।

২

সমাধির 'পরে তব আজি বৃষ্টিধৌত নীলাকাশ
হাসে স্মিত হাসি,
প্রভাতের মুক্ত আলো তা'রে ঘেরি' করিছে উল্লাস
ঢালি' সুধারাশি।

শরতের পূর্ণা রাতে তোমার আকাশ চন্দ্রাতপ
কিরণ-উজ্জ্বল,
উন্মুক্ত অম্বরতলে উঠিতেছে সুগম্ভীর রব—
মানব-মঙ্গল!

৩

তোমার হৃদয় ভরি' জেগেছিল যে মহাস্বপন,—
এ ভারত-ভূমি
এক ধর্ম্ম, এক রাজ্য, এক জাতি, একনিষ্ঠ মন
বেঁধে দিবে তুমি।
সমাজ-আচারভেদ ধর্ম্মভেদ ভুলে যাবে সবে,
রহিবে স্মরণ—
এক মহাদেশে বাস, চিরদিন একসাথে হবে
জীবন মরণ।

৪

বিজিত-বিজেতাভেদ ভুলেছিলে, হে মহৎ-প্রাণ,
হিংসা ভুলেছিলে,
তোমার মহৎ প্রেমে দূর করি' সর্ব্ব অসম্মান
কোলে টেনে নিলে।
হিন্দু-মোস্লেমের দ্বেষ, রাজপুত-পাঠান-মোগল-
সংঘাত জিনিয়া,
মহাভারতের স্বপ্ন মেলি' স্থির আঁখি অচপল
দেখেছিল হিয়া।

৫

হে সম্রাট্, জানে নাই ভয় কভু তোমার হৃদয়,
নিয়ত সম্মুখে
সন্দেহ-সংশয়-চিন্তা জয় করি' চলেছে নির্ভয়
সব সুখে দুখে।
বিপদের দিনে বন্ধু দাঁড়াইল সরি' পার্শ্ব হ'তে—
একান্ত একাকী
আপন জীবনব্রত সাধিবারে চলিয়াছ পথে
লক্ষ্য স্থির রাখি'!

৬

কে এল তোমার সাথে, কে তোমারে ছেড়ে গেল চ'লে,
চাহ নাই ফিরে',
আপন প্রাণের স্বপ্নে সকল জীবন তব জ্বলে
বিদারি' তিমিরে।
হৃদয়ের রক্ত দিয়া পলে পলে আঁকিয়াছ ছবি
যে মহাভারত,
আজিও সম্ভ্রমভরে দেখে শুধু, হে সম্রাট্-কবি,
বিস্মিত জগৎ।

৭

তোমার মহৎ হিয়া পুনর্ব্বার আসুক ফিরিয়া
আমাদের মাঝে,
আত্মদ্বন্দ্ব-সর্ব্বনাশ আমাদেরে রেখেছে ঘিরিয়া
অপমানে লাজে!

কল্যাণের পথ মোরা হারাইয়া আঁধারের মাঝে
ঘুরি দিশাহারা,
আমাদের দেশ তাই হতাদরে অপমানে লাজে
আমাদের কারা !

৮

হে মহৎ, তব বাণী নিখিল ভারত ভরি' আজি
জাগুক আবার,
উঠুক মিলনমন্ত্র সাম্যবাদে কম্বুকণ্ঠে বাজি'
টুটিয়া আঁধার।
হিংসা দ্বেষ মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মত শঙ্কাভরে
হোক শান্ত হোক,
আঁধারের প্রাণী যত ফিরে যাক আঁধার বিবরে,
নামুক আলোক !